বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

অষ্টাদশ অধিবেশন

মাজু-হাওড়া

কার্য্য-বিবরণী

বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ সাল

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ

সূচী

স্যার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
কে-টি, সি-আই ই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

অষ্টাদশ অধিবেশন

মাজু—হাওড়া

সূচনা।

"সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সৃষ্টি হইতে প্রায় প্রতি বর্ষেই নানা স্থানে অনুষ্ঠিত সম্মিলনে যোগদান করিবার সৌভাগ্য আমাদিগের হইয়াছে। বঙ্গের নানা প্রদেশ হইতে সমবেত সাহিত্যিক-বৃন্দের এই পুণ্য সমাগমে আমাদের মত অসাহিত্যিকের হৃদয়েও যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইত, ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করা বিড়ম্বনা মাত্র। নিজের ক্ষুদ্র গ্রামকে সাহিত্যিক-বৃন্দের এই রূপ পবিত্র সমাগমে অলঙ্কৃত ও পূত করিবার এবং সাহিত্যিক-সমাগমের এই নির্ম্মল আনন্দের অংশ নিজের গ্রামবাসী যাহাতে উপভোগ করিয়া ধন্য হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের নিভৃত কোণে মাঝে মাঝে উঁকি দিত, নিজের নিকটও আত্মপ্রকাশ করিতে তাহার সাহস হইত না।

রাধানগরে অনুষ্ঠিত সম্মিলনের ১৫শ অধিবেশনের পর হইতেই এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল ভাবে দেখা দিল। এই সময়েই বুঝিলাম, ক্ষুদ্র গ্রামও সাহিত্যিকদিগের সম্মিলনের অনুপযুক্ত নহে—পল্লীর প্রাকৃত শোভা সাহিত্যিকদিগের অনাদরের সামগ্রী নহে। কিন্তু বঙ্গগৌরব ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি হইলেও আমাদের গ্রামে তেমন

সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি কোথায়, যাঁহাদের সাহায্যে সমাগত সাহিত্যিক-বৃন্দের যথোপযুক্ত সংবর্দ্ধনা সম্ভবপর হইতে পারে? "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।" আমাদের এ আকাঙ্ক্ষাও তাই হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে উদিত হইয়া হৃদয়মধ্যেই বিলীন হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি ইহার কল্যাণারুণ শোভা কিছুতেই এই হৃদয়ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে পারিল না।

হৃদয়ের এই অদম্য আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া ভবিষ্যতের দিকে না চাহিয়া ১৩৩৫ সালের আশ্বিন মাসে মাজু গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে সম্মিলনের ১৮শ অধিবেশন আহ্বান করিয়া বসিলাম। আনন্দের আতিশয্য তখনও আমাদিগকে ভবিষ্যতের ভাবনা সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের জন্মভূমিতে বর্ত্তমান সাহিত্য-রথীদিগের সহিত মিলিত হইব—মাজু পাব্লিক লাইব্রেরীতে আমাদের সযত্নসংগৃহীত সাহিত্যিকদিগের কীর্ত্তিরাশি সমবেত সাহিত্যিকদিগকে দেখাইব—এই কল্পনায় তখন আমাদের সমস্ত চিত্ত ভরপুর।

তখনও জানি না, কিরূপে সম্মিলনে সমাগত সাহিত্যিকদিগের সম্মান রক্ষিত হইবে। তবে ভরসা ছিল—ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি পেঁড়োর সংলগ্ন মাজু সাহিত্যিকমাত্রেরই তীর্থক্ষেত্র। তীর্থক্ষেত্রে সমাগত যাত্রীদিগের অভ্যর্থনার প্রয়োজন নাই—পাণ্ডা আমরা, তীর্থক্ষেত্র দেখাইয়া দিয়াই খালাস হইব। অন্য অভ্যর্থনা কিছু না করিলেও আমাদের কোনও নিন্দা হইবে না—সাহিত্যিকগণও অসন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না।

এইরূপে মনকে চোক ঠারিলাম সত্য, কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবার ভরসা মানুষের না থাকিলেও ভগবান্ নিজগুণে তাহার ক্ষীণ চেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে কখনও ত্রুটি করেন না। ভগবানেরই অনুগ্রহে অপ্রত্যাশিত ভাবে নানা স্থান হইতে আমরা সাহায্য ও

সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম এবং দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের নাম এ স্থলে আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গজননীর সুসন্তান, মেসার্স বার্ণ ও মার্টিন কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সি-আই-ই, মহাশয় ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা সাহায্য করেন। হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু বাহাদুর ও সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় এম্-এ, পি-আর-এস্, মহাশয়দ্বয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় সম্মিলনের সময় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে ইঁহাদিগকে আমরা আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রসঙ্গে হাওড়া-আমতা রেলের ম্যানেজিং এজেণ্ট মিঃ এণ্ডারসন্ মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতিনিধিগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

উল্লিখিত মহাশয়দিগের সাহায্যে সাহিত্যিক-বৃন্দের অভ্যর্থনা ও গমনাগমনের ব্যবস্থা হইয়াছিল সত্য। তবে সম্মিলনের সমস্ত কার্য্যের বিধি-ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ও শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল মহাশয়দ্বয়।

সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা ঠিক হইয়া যাইবার পরও আমাদের চিরপোষিত আশা ফলবতী হইবার পথে নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে হতাশ করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিঘ্ন হইতে যাঁহারা আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন করিবার উপযুক্ত ভাষা আমাদের নাই। আমাদের নির্ব্বাচিত মূল সভাপতি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন এম্-এ, ডি-এস্-সি অপরিহার্য্য কারণে সম্মিলনে যোগদান করিতে অসমর্থ হন। এই সময় অতি অল্প কাল পূর্ব্বে অনুরুদ্ধ হইয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন ও ডক্টর শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়েরা যথাক্রমে মূল সভাপতি, সাহিত্য-শাখার ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কলিকাতা রেডিও কোম্পানী যন্ত্র সাহায্যে বক্তৃতাদি সাধারণে প্রচার করিবার সহায়তা করিয়া সমগ্র সাহিত্যানুরাগী সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সাহায্য ব্যতীত সম্মিলনের মত বড় কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। তাঁহা-দিগকে ধন্যবাদ দিবার এ স্থান নহে। তাঁহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন—ধন্যবাদের অপেক্ষায় তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন, এ কল্পনা করিলে তাঁহাদের কৃত কার্য্যের অবমাননা করা হইবে। তবে স্কুলগৃহ সম্পূর্ণরূপে সম্মিলনের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়ায় মাজু উচ্চ ইংরাজী স্কুলের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান না করিলে আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক যুবকবৃন্দ আহার নিদ্রা উপেক্ষা করিয়া সম্মিলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করি-বার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল, তাহাদের কার্য্যের প্রশংসা না করিলে আমাদের অন্যায় হইবে। এই সঙ্গে সমাগত সাহিত্যিক-বৃন্দকে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে তৃপ্তিদান করার জন্য আমরা কুমারী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী ও শ্রীমতী লীলা সরকার মহাশয়াকে এবং জুজারসাহা

কন্‌সার্ট-পার্টির সম্পাদক ও সভ্যবৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পরিশেষে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীতে সমবেত সাহিত্যিক-বৃন্দের নিকট আমাদের সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের সমাগমে আমরা তৃপ্ত হইয়াছি সত্য—তবে এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহাতে তাঁহা-দিগকে অশেষ ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে। আশা করি, নিজগুণে তাঁহারা ইহা উপেক্ষা করিবেন।

শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক।

শ্রীহরলাল মজুমদার
সহযোগী সম্পাদক।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ,

দক্তোর এস লেত্তর (প্যারি) বেদান্ততীর্থ, শাস্ত্রী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

অষ্টাদশ অধিবেশন।

মাজু—হাওড়া

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

শ্রীযুক্ত ডাঃ সুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ,
দক্তোর এস্-লেতর্ (পারি), বেদান্ততীর্থ, শাস্ত্রী
মহাশয়ের অভিভাষণ।

সমাগত সুধীবৃন্দ !

স্বাগতম্, আমার গ্রামবাসীদিগের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি। আপনাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইবার ভার আমার অযোগ্য স্কন্ধে অর্পণ করিয়া আমার গ্রামবাসীগণ আমার প্রতি তাঁহাদিগের যে প্রীতি দেখাইয়াছেন তাহাতে যেমন আমি গৌরব অনুভব করিতেছি, তাঁহাদিগের এই অবিবেচনায় তেমনই দুঃখিত হইয়াছি। আমার কোন অনুনয়েই তাঁহারা কর্ণপাত করেন নাই ও আমার অক্ষমতা প্রকট করিয়া তুলিতে আজ আমায় প্রায় ছয় শত মাইল দূর হইতে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। আমি সাহিত্যব্যবসায়ী নহি ও আপনা-দিগের ন্যায় সাহিত্যরথীগণকে অভ্যর্থনা করিতে যাওয়া আমার

পক্ষে কিরূপ দুঃসাহসের কায তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। আমি প্রায় সারাজীবনই লোকচক্ষুর অন্তরালে কাটাইয়াছি ও সভা সমিতিতে যোগ দেওয়া অপেক্ষা আমার গ্রন্থাগারের নিভৃত কোণ ও কর্ম্মকক্ষই আমার প্রিয়তর। আজ এই বিদ্বন্মণ্ডলীর সমক্ষে আসিতে আমার রুচি ও স্বভাবের উপর কতটা অত্যাচার করিতে হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে যাওয়া বৃথা। আমার অদ্যকার দুরবস্থার জন্য বোধ হয় আমার এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের উপর প্রীতিই বিশেষভাবে দায়ী। কার্য্যগতিকে আমায় অধিকাংশ সময়ই নগরের কোলাহলের মধ্যে কাটাইতে হয়। সেই জন্য অবসর পাইলেই কয়েকখানি গ্রন্থ লইয়া আমি এই পল্লীগ্রামে ছুটিয়া আসি। এইখানের মাঠ, ঘাট, বন, নদী সকলের সঙ্গে আমার কৈশোর-যৌবনের এত স্মৃতি জড়িত যে আমার কাছে এই আবেষ্টনের মধ্যে সাহিত্যরসের আস্বাদ অতি নিবিড় হইয়া উঠে বলিয়া বোধ করি।

আমার এই দরিদ্র ক্ষুদ্র গ্রামটিকে এত ভালবাসি বলিয়াই বোধ হয় যখন এই ১৮শ অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে এখানে আমন্ত্রণ করিবার কথা হয় তখন প্রথম ভাবিয়াছিলাম বুঝিবা এই গুরুভার দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়া দুঃসাহসের কায করা হইয়াছে। কিন্তু মনে হইল যদি বৃথা বাহুল্যে আমাদের আয়োজনের দৈন্য ঢাকিতে চেষ্টা না করি, যদি সরলভাবে স্নেহহস্তে ঘরের ক্ষুদকুঁড়া ভাইবোনদের নিকট উপস্থিত করি তাহা হইলে লজ্জার কারণ কিছু থাকিতে পারে না। তাই আজ আমাদের দরিদ্র পল্লীবাসীদের সামান্য আয়োজনের মধ্যে বাণীর বিচক্ষণ পুরোধা আপনাদিগকে বঙ্গভারতীর বিশাল যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি। আপনাদিগের মঙ্গল হস্তের স্পর্শে আয়োজনের ত্রুটি যেন লুপ্ত হয়, আপনাদিগের

উদাত্ত মধুর মন্ত্রে যেন সে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয় ও আমরা প্রাকৃত জন যেন সেই হবিঃশেষ পাইয়া ধন্য হই।

পল্লীমাতার পর্ণকুটীরেই বঙ্গভারতীর জন্ম ও তাঁহার স্নিগ্ধ অঙ্গনেই তাঁহার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে পল্লীজীবনের মৃদু ছায়া-লোকের চিত্রটি যেন অঙ্কিত রহিয়াছে,—তার জলেভরা দিঘীর সজল দৃষ্টি, তার মেঘমেদুর বর্ষার নিবিড় ছায়া, তার আলোকস্নাত শারদ দিবসের হিরণ্য অঞ্চলের কম্পন, তার পিকমুখর চ্যুত-প্রসব-মদির জ্যোৎস্নাময়ী বাসন্তী মত্ততা। পল্লীজীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ, অনুদ্ধত আশা-আকাঙ্ক্ষা, শ্রদ্ধানত ধর্ম্মপ্রাণতাই সেই সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। আধুনিক যুগেও, যদিও কার্য্যব্যপদেশে বহু সাহিত্যিককে নগরে বাস করিতে হয়, তথাপি পল্লীজীবনের আশা ও বেদনা এখনও বঙ্গ-সাহিত্যের বাণী। তাই আজ আর একদিক দিয়া মনে হইতেছে যেন বঙ্গবাণীকে পল্লীর স্নিগ্ধ অঙ্গনে আহ্বান করিয়া তাঁহার শৈশবের স্মৃতিপূত মাতৃকুটীরেই আহ্বান করিতেছি।

আপনাদিগের ন্যায় মহামান্য সাহিত্যরথীগণের চরণ-ধূলিতে পবিত্র হইয়া আমাদিগের ক্ষুদ্র গ্রাম যে কিরূপ ধন্য মনে করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। এ গ্রামের ইতিহাসে এই দিবসের কাহিনী চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। এই গ্রামের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় আড়াইশত বৎসরের পূর্ব্বে আর্য্য সভ্যতার চিহ্ন মেলা দুষ্কর। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে এই অঞ্চল বিদ্যানুশীলন বা সাহিত্য চর্চ্চায় কখনও শিথিলযত্ন হয় নাই। অবশ্য সর্ব্ব প্রথমেই হাওড়া জেলার গৌরবরবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের নাম মনে আসে। এই মণ্ডপের পশ্চিমের বিশাল প্রান্তর দূর দিগন্তে যেখানে অস্পষ্ট নারিকেল তালাবনের নীল রেখায় মিলাইয়া গিয়াছে ঐখানে পেঁড়ো

গ্রামে ভারতচন্দ্র রায়ের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রাসাদ ও গড় ছিল। কবির শৈশবকাল ঐ খানেই কাটিয়াছিল। বর্দ্ধমানের রাজমাতার কোপে পতিত হইয়া রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ কিরূপে হৃতসর্ব্বস্ব হয়েন ও নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া ও নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ভারতচন্দ্র কিরূপে কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবিরূপে তাঁহার অমর গ্রন্থাবলী রচনা করেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। নানাদিগ্দেশাগত বহু বিচিত্র প্রভাবের মধ্যে বিচক্ষণ পাঠক আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে এখনও ভারতচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পান। সাহিত্যিক নানাদোষ সত্ত্বেও যতদিন ভারত চন্দ্রের প্রভাব বঙ্গ-সাহিত্যে থাকিবে ততদিন হাওড়া জেলার এই অঞ্চল আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবে। আর এই প্রভাব বোধ হয় শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার নহে। কারণ, পাঠক কেবল তাঁহার বুদ্ধি সাহায্যে কবিতা বোঝেন না, বা কেবল হৃদয় দিয়া তাহা অনুভব করেন না; শব্দের ঝঙ্কারে, ছন্দের তালে তালে নিতান্ত অবুঝের মত সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আনন্দ উপভোগ করেন ও এই আনন্দদানে কুহকী ভারতচন্দ্র সিদ্ধ হস্ত। ভারতচন্দ্রের শব্দ কৌশল শুধু শব্দ-শাস্ত্রজ্ঞের পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ নহে, তাহা অর্থহীন ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রকৃতির সহজাত জ্ঞান ও কৌশল। মনে হয় যেন অর্থ দ্যোতক শব্দের সাহায্যে বহিঃপ্রকাশের পূর্ব্বে মানুষের মনে যে ভাষা অজ্ঞাতে সঞ্চারিত হয়, ভারতচন্দ্র রায় সেই ভাষা-ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন শুনিতে পাইয়াছিলেন ও তাহাই অভ্রান্ত কৌশলে অসীম দক্ষতার সহিত অক্ষরের শাসনে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার ধ্বন্যাত্মক কবিতায় ভূত প্রেতের উন্মত্ত নৃত্য, তরঙ্গভঙ্গের সলীল বেগ, লোলজিহ্ব অগ্নির সর্ব্বগ্রাসী নিনাদ ও প্রলয়ের অট্টরোলের মধ্যে পিনাকির বিষাণ সমান কৌশলে পরিপূর্ণ তানে বাজিয়া উঠে। প্রচ্ছন্ন জ্ঞানের অতল তলে এই অস্পষ্ট শব্দ-

রাজ্যের রেখাচিত্রের সন্ধান অতি আধুনিক ফরাসী ভাষাবিজ্ঞান-সেবীরা অত্যল্পকাল মাত্র পাইয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের সুদূর প্রান্তে ভারতচন্দ্র কর্ত্তৃক এই জ্ঞানের এরূপ ব্যবহার আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ "রামেশ্বরী পাঁচালী" যদুপুর গ্রামে রচিত হয়, ও "প্রকৃতিবাদ অভিধান" রচয়িতা রামকমল বিদ্যালঙ্কার নিকটবর্ত্তী পানিয়াড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মাজু স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ৺রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুর তাঁহার "তীর্থ-দর্শন" গ্রন্থে বাঙ্গালায় ভ্রমণ-কাহিনীর এক নূতন পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার ভ্রাতা ৺হরিচরণ বসু মহাশয়ের প্রযত্নে "শব্দকল্পদ্রুমের" ও "দেবী ভাগবতের" একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৺দীনবন্ধু কাব্য-তীর্থ বেদান্ত রত্ন মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের একটি উপাদেয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। যে সকল মহাত্মা এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যানুশীলন ও বিভিন্নাভিমুখী প্রতিভা বলে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (প্রতাপ পুর) ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার (পাইকপাড়া), পণ্ডিত কমল কণ্ঠাভরণ (রামেশ্বরপুর), শ্যামাচরণ কবিরত্ন (শিবপুর) কালাচাঁদ তর্কালঙ্কার (আঁটপুর) পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও প্রথম ভারতীয় Accountant General তৎপুত্র মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য্য, (নারিট), ডাঃ সুরেশ প্রসাদ ও সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (ব্রাহ্মণপাড়া), সুলেখিকা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী (ভাণ্ডারগাছা) ও আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের উজ্জ্বলরত্ন শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বর ও ম্যাজিশিয়ান আত্মারাম সরকার প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

এ অঞ্চলে বিদ্যানুশীলনের ধারা প্রাচীন সংস্কৃতানুশীলন অব-

লম্বনেই প্রথমে প্রবাহিত হইয়াছিল। যদিও মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, আমাদিগের গ্রামের মুখোজ্জ্বলকারী বহুতীর্থোপাধিক পণ্ডিত রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এখনও সেই ধারা অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছেন, তথাপি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। এই সম্মিলনের অধিবেশনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের এক অধিবেশন ১৩৩১ সালে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার ন্যায় নিয়ত-বর্দ্ধনশীল সাহিত্য স্বল্পকালের মধ্যে কিন্তু আয়তনে ও বৈচিত্র্যে এরূপ দ্রুত বাড়িয়া উঠে যে তাহার একটা ধারণা করিতে গেলে কোন এক সময়ে তাহার অন্তরে প্রবাহিত বিভিন্ন প্রবণতার স্রোতগুলি অনুসরণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের অনুশীলন করিতে গেলেও এই পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আজ এই সম্মিলনেও আপনারা এই সকল প্রবণতার স্রোতগুলির দিঙ্‌নির্ণয় ও বেগ নিরূপণ করিয়া মাদৃশ সাহিত্য পিপাসু অসাহিত্যিক-গণকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন ইহাই প্রার্থনা।

আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের গোচরবস্তুগুলি (phenomena) কিরূপ প্রতীয়মান হইতেছে ও জটিল সমস্যাগুলি কিরূপ আকারে উপস্থিত হইয়াছে তাহা স্থিরভাবে বিচার করিলে তাহাদিগের সমাধান বোধ হয় সহজ হইবে। আমি সাহিত্য সেবী নই বলিয়া বোধ হয় ব্যাপারটি আমার চক্ষে একটু অন্যপ্রকার ঠেকিতেছে ও এ বিষয়ে মহামান্য সাহিত্যিকগণ যে কেন ভিন্ন ভাবে দেখিয়া বৃথা তর্কজাল বিস্তার করিতেছেন তাহাও স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে না।

মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যে জীবনীশক্তি উদ্বৃত্ত থাকে তাহার প্রেরণাবশে সে চারুশিল্পের

সৃষ্টি করে। তখন আর কেবল মাত্র গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা হইতে আত্মরক্ষার্থ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সে সন্তুষ্ট থাকে না, তাহাকে সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করে ও মনোরম করিয়া সাজায়; কেবল ঋতু পর্য্যায়ের তীক্ষ্ণতা ও লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে না, তাহা সৌন্দর্য্যে নয়নমুগ্ধকর ও সৌষ্ঠবে বিভ্রমকর হইয়া উঠে। প্রকৃত সাহিত্যও তেমনই জাতির প্রচুর মানসিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য পিপাসার ফল। এই সুপ্রচুর মানসিক স্বাস্থ্য ও অতৃপ্ত সৌন্দর্য্যপিপাসা ব্যতীত অন্য কারণ হইতে উদ্ভূত কোন লিখিত বস্তু (তাহা যত মনোরমরূপে মুদ্রিত ও বিক্রীত হউক না কেন) সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে না।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কিন্তু বাঙালায় মাসিকপত্র ও গ্রন্থালয়ের সংখ্যা অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ বাঙ্গালার মানসিক শক্তির ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের আকস্মিক উৎকর্ষ নহে (যদিও এদিকে কিছু উৎকর্ষ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই),—ইহার কারণ অর্থ নৈতিক। এই সকল গ্রন্থালয় চালাইতে গেলে ও মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে গেলে কেবল মাত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের লেখার উপর নির্ভর করিলে চলে না; অতএব নূতন লেখক তৈয়ার করিতে হইতেছে। নূতন লেখক কিছু কিছু তৈয়ার হইতেছে সত্য, কিন্তু এমন কতকগুলি লেখকের লেখা মুদ্রিত হইতেছে যাহারা, হয় অন্যথা আরও কিছুদিন অভ্যাস করিবার পর নিজের লেখা মুদ্রিত দেখিতে পাইতেন, কিম্বা যাহাদের লেখা কখনও কোন সাহিত্যিক পত্র মুদ্রিত করিত না। অতএব লেখকের যোগান অপেক্ষা চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং অনেক খারাপ মাল ভাল মালের সঙ্গে ভেজাল হইয়া বাজারে আসিয়া পড়িতেছে। পত্রিকাধ্যক্ষগণ অবশ্য পাকা ব্যবসাদারের ন্যায়

বিজ্ঞভাবে উচ্চকণ্ঠে তাঁহাদিগের মাল "একেবারে খাঁটি" সাহিত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এদিকে এই সকল গ্রন্থ বা পত্রিকার খরিদদার বা গ্রাহকদিগের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে পূর্ব্বে যাঁহারা সাহিত্যানুরাগবশতঃ গ্রন্থ বা পত্রিকা ক্রয় করিতেন তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিলে এতগুলি গ্রন্থালয় বা পত্রিকা চলে না। অতএব এমন এক শ্রেণীর লোককে খরিদদার হিসাবে পাইতে হইয়াছে যাহারা কখনও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন না বা শিক্ষাসংসর্গবশে হইতেও পারে না। ইহাদিগকে দিয়া গ্রন্থ বা পত্রিকা ক্রয় করাইতে হইলে সেই গ্রন্থে বা পত্রিকায় এমন বস্তু থাকা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে যাহা হইতে তাহারা আনন্দ আহরণ করিতে পারে। অতএব ক্রেতার দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে মালের চাহিদা অপেক্ষা যোগান অধিক হওয়ায় খরিদদারের শক্তি অনুসারে মালের উৎকর্ষ নিরূপিত হইতেছে। দুই দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে সাহিত্যের বাজারে মহাজনের ভিড় হওয়ায় জিনিষের উৎকর্ষ অনেক নামিয়া গিয়াছে। ইহা কাহারও ব্যক্তিগত দোষে ঘটে নাই. অর্থ নীতির নির্ম্মম নিয়মানুসারে ঘটিয়াছে। অবশ্য গ্রন্থালয়ের বা পত্রিকার অধ্যক্ষগণ সর্ব্বদাই বলেন (ও হয়ত সত্যই মনে করেন) যে তাঁহারা সাহিত্য সেবাই করিতেছেন ও অর্থোপার্জ্জন যোগমার্গাবলম্বীর বিভূতি লাভের ন্যায় আপনা আপনিই ঘটিতেছে। কিন্তু বিভূতি লাভ না ঘটিলে যোগী আত্মোন্নতির পরিমাণ বুঝিতে পারেন না, গ্রন্থালয়গুলি বা পত্রিকা গুলি ব্যবসায় হিসাবে সফল না হইলে তাঁহাদের সাহিত্যসেবার উৎসাহ কতদিন থাকিত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

অবস্থা যখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে তখন তাহার প্রতীকারের উপায় কি তাহা আপনাদিগের বিবেচ্য। যদি এমন কোন গ্রন্থালয় বা

পত্রিকা থাকিত যাহার পাণ্ডুলিপিপরীক্ষকসভা শ্যেনদৃষ্টিতে প্রত্যেক পাণ্ডুলিপি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কেবল মাত্র যাহা একটি সুনির্দ্দিষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিত তাহা ব্যতীত সমস্ত পাণ্ডুলিপি পরিত্যাগ করিতেন তাহা হইলে উপায় সহজ হইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগা দেশে এরূপ গ্রন্থালয় বা পত্রিকা বাঁচিত কি? আর ক্রুদ্ধ লেখক বৃন্দের গর্জ্জনে-উৎপীড়নে ও প্রত্যাখ্যাতা সুন্দরী লেখিকাগণের কোপ কটাক্ষ বহ্নির ভয়ে এরূপ পাণ্ডুলিপি পরীক্ষকগণের জীবনবীমা কি কোন সাবধান বীমা কোম্পানি গ্রহণ করিত?

দেখা যাইতেছে যে সাহিত্যের বাজারে খাঁটি সাহিত্যের স্থানে একটা "বাজার চলন" মিশ্রিত বস্তু বস্তায় বস্তায় আসিতেছে। সকলেই জানেন যে ইহার মধ্যে প্রকৃত বস্তুটি আছে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সকল দ্রব্যই সমান। একই রকম ছাপা, একই রকম কাগজ, একই পত্রিকা বা একই প্রকাশক! আমাদের ন্যায় অসাহিত্যিক পাঠক উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে প্রশ্ন করে,—কোন্‌টি খাঁটি, কোন্‌টি মেকি চিনিব কি প্রকারে, সবারই যে এক মার্কা, এক নম্বর। আবার এরূপ রটনাও শোনা যায় যে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফার্ম্মও নাকি খাঁটি জিনিষে কিঞ্চিৎ ভেজাল দিয়া সাধারণের মুখরোচক দ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে সাহিত্য কাহাকে বলিব, আর আমেরিকানদের ভাষায় কাহাকেই বা কেবল printed matter (মুদ্রিত বস্তু) বলিব?

কোন্ রচনা সাহিত্য নামের যোগ্য এ প্রশ্ন বোধ হয় আদিম মানব যখন প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন হইতেই জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে। যুগে যুগে এই প্রশ্নের বিভিন্ন সমাধান প্রদত্ত হইয়াছে ও এই সকল আলোচনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ও এই সকল সাহিত্যিক আদর্শের কঙ্কালরাশি মানব-

জাতির অলঙ্কার শাস্ত্র (Poetics) বুকে করিয়া কালস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে। আমরা যাহাকে সুকুমার সাহিত্য (Belles Letters) বা সংক্ষেপে সাহিত্য বলি, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাহাকে "কাব্য" বলিতেন। এই কাব্য কাহাকে বলে সে আলোচনার আমাদের ন্যায় দেশে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ এ অদ্ভুত রাজ্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থও সুললিত কবিতায় রচিত হয়, আর কাদম্বরী বা বাসবদত্তার ন্যায় জটিল অলঙ্কারবহুল কাব্য-গ্রন্থও গদ্যে রচিত হয়। এখানে কাব্যের মানদণ্ড ঠিক না থাকিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যিক আদর্শ কি এই বিরাট প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান দিবার মত স্পর্দ্ধা আমি, অসাহিত্যসেবী, পোষণ করি না। প্রশ্নটি বিভিন্ন দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে: কাব্যালোচনা করিতে গেলে প্রথমই কাব্যের দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে—কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় (contents) ও কাব্যের আকার (form), কবি কি বলিতে চাহিতেছেন ও কেমন করিয়া বলিতেছেন। কাব্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে গেলে এমন সাহিত্যও বোধ হয় চোখে পড়িবে যাহার বলিবার বস্তু তাহার বলিবার ভঙ্গিটি মাত্র। কিন্তু মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে এই দুইটি বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবশ্য ধরিয়া লইতেছি যে প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই বলিবার কিছু আছে ও তিনি কেবলমাত্র অর্থাগমের আশায় বা সহজলভ্য যশের লালসায় লেখনী ধারণ করেন নাই। সৃষ্টির অসীম আনন্দ ব্যতীত ক্ষুধার তাড়না বা লোভের অঙ্কুশ কোন সুকুমার শিল্পের প্রেরণা হইতে পারে না। সকল যথার্থ শিল্পীই আপনার ভিতর এমন কিছুর একটা তাগিদ অনুভব করেন যাহা বাহিরে রূপ গ্রহণ করিতে চায় ও যাহাকে বহির্জ্জগতে মূর্ত্ত

করিয়া তুলিতে না পারিলে শিল্পী স্বস্তি পান না, যেমন বসন্তের কোকিল না গাহিয়া থাকিতে পারে না। এই অন্তরের বস্তু কেবলমাত্র হইতে পারে এমন কোন সত্য যাহা শিল্পী আপনার চিত্তে বা জীবনে গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। লোকের বহির্জীবন অনেকটা পারিপার্শ্বিকের দ্বারা ঘটিত ও সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাহার মানসিক জীবন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বন্ধনমুক্ত। সেইজন্য বলিতেছি যে সত্য শিল্পী তাহার চিত্তে বা জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সত্যোপলব্ধিই শিল্পের প্রাণ, যেমন চিত্রকর বা ভাস্কর মার্ব্বেলে, ভিত্তিগাত্রে বা পট ভূমিকায় যে চিত্র অঙ্কিত করেন তাহার মূল তাঁহার মানস পটে উজ্জ্বল অদৃশ্য সৌন্দর্য্যের আদর্শ। বাহিরে দৃশ্যমান চিত্র তাঁহার অন্তঃস্থ চিত্রের অপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ মাত্র ও কোন্ ভূমি অবলম্বন করিয়া শিল্পীর মানসসুন্দরী সজীব সার্থক হইয়া উঠিবে, পাষাণময়ী প্রতিমারূপে, উপলোৎকীর্ণ মূর্ত্তিরূপে (bas-relief)' ভিত্তিবিলম্বা রেখাময়ীরূপে বা পটোল্লিখিত বর্ণোজ্জ্বল প্রস্ফুটভাবময়ীরূপে,—তাহা শিল্পীর সুযোগ, সুবিধা, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। চারুশিল্পের ইতিহাসে তাই আমরা পর্য্যায়ক্রমে উপলগাত্রে অৰ্দ্ধোৎকীর্ণ মূর্ত্তি (bas-relief), ভাস্কর্য্য, বিভিন্ন বর্ণের কাচ বা শিলাখণ্ড সমাবেশে নির্ম্মিত চিত্র (mosaics), ভিত্তিচিত্র ও অন্তচ্ছাদন চিত্র (frescoes and ceiling paintings) ও সর্ব্বশেষে চিত্রপট দেখিতে পাই। অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পী ও তাহার সময়কার অসংস্কৃত উপাদানের সাহায্যে তাহার হৃদয়নিহিত অনবদ্য সৌন্দর্য্য-স্বপ্নকে ফুটাইবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছেন—যেমন ইতালীর ভিত্তিচিত্রকর জ্যোত্তো (Giotto)। সাহিত্য শিল্পীকেও সেইরূপ তাঁহার অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশের জন্য অনেক পরিমাণে বাহিরের অতর্কিতোপনত অবস্থানিচয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। এ বিষয়ে

সাহিত্যশিল্পী চিত্রশিল্পী অপেক্ষাও দৈবাধীন। চিত্রশিল্পী অন্ততঃ কোন্ ভূমি অবলম্বন করিলে তাঁহার সৌন্দর্য্যস্বপ্ন উত্তমরূপে ফুটিবে সে বিচারে কতকটা স্বাধীন ও অন্যনিরপেক্ষ, কিন্তু কবি জীবনে কাহার সংস্পর্শে আসিয়া বা কোন্ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সত্যের সন্ধান পাইবেন তাহা আপনিই জানেন না বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না। মানবাত্মার অন্তঃপুরচারিণীর অবরোধের সোনার কবাট হয়ত কাহারও খুলিয়া গেল—পারি (Paris) বা ভিয়েনার (Vienna) অভিজাত সমাজের পরিমার্জ্জিত মজলিশে (salons) কোন অপরূপ সুন্দরীর কোমল করের স্পর্শে, আবার হয়ত কাহারও খুলিল লণ্ডনের আবর্জ্জনাক্লিষ্ট পূর্ব্বপাড়া বা নিউইয়র্কের দরিদ্র ইহুদীপাড়ার (ghetto) সুরাঘূর্ণিতনয়না শ্লথবসনা নৃত্যচঞ্চলা বারাঙ্গনার লালসাময় স্পর্শে। তাই বিশ্বসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়া সকল সাহিত্যরসপিপাসুই অনুভব করিয়াছেন যে অনেক সময় সামাজিক অবস্থায় বিভিন্ন, ভাষায় বিভিন্ন, আচার ব্যবহারে বিভিন্ন, এরূপ বিরুদ্ধ চরিত্রের ভিতর দিয়া দুইজন সাহিত্যিকের যে বাণী ধ্বনিত হইয়াছে তাহা মূলতঃ এক। দুজনের বক্তব্য এক, কিন্তু বলিবার ভঙ্গি ও যে পটভূমির উপর তাহাদের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে এত বিরোধ বোধ হয়। কোন সাহিত্যিকের বর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ বা ভাষা পাঠকবিশেষের ভাল লাগে কিনা তাহা পাঠকের আপনার শিক্ষা রুচি মানসিক উদারতা ও রসানুভূতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু যেখানে গভীর সত্যোপলব্ধি ও তাহার অকুণ্ঠিত প্রকাশ আছে সেখানে প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে—সেখানে বারবণিতার বিলাস ও শৌণ্ডিকালয়ের বীভৎসতাই থাকুক, আর দেবারতির উদাত্ত মন্ত্রধ্বনি ও প্রণত পূজারিণীর নীরব ভক্তিনিবেদনই থাকুক। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস

বলিতেন,—রাজার সঙ্গে দেখা করা নিয়ে কথা, তা কেউ দেউড়ি দিয়া দ্বারবানের কৃপায় করে, বা কেউ পাঁচিল টপ্‌কে করে, আর কেউ বা আঁস্তাকুড় দিয়া ঢুকে করে ; যে রাজার সাক্ষাৎ পেয়েছে সেই তার কথা বল্‌তে পারে। যে অবস্থার ভিতর দিয়াই হউক যে কেহ জীবনে সেই সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যাহার সন্ধানে মানব জীবন সার্থক হইল মনে হয় যদি প্রকাশ করিতে পারেন ত তিনিই সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার বর্ণনা মনোরম না হইতে পারে, তাঁহার চরিত্রগুলি নিষ্পাপ শুচিশুভ্র না হইতে পারে,—সেজন্য তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা দায়ী। সমাজের শোভন দিকের অভিজ্ঞতা পান নাই, মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির সাক্ষাৎ পান নাই, ললিতমধুর পেলবাঙ্গী-সমাজে না দিয়া নিষ্ঠুর দৈব রুক্ষ কর্কশ অশুচিতার মধ্যে তাঁহাকে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পাঠাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর করুণার উদ্রেক হইতে পারে, তাঁহাকে তিরস্কার করা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয়।

কিন্তু যে লেখক কোন গভীর সত্য প্রকাশ করিতে চাহেন না, যাহার জীবনের অভিজ্ঞতা কিছুই নাই ও যাহার সাহিত্যচর্চ্চা বালকের সাবানের বুদ্বুদ উড়ানরই মত অর্থহীন ও প্রয়োজনহীন সেরূপ লেখক যদি নিজের সমাজ ছাড়িয়া বস্তিতে বস্তিতে নায়িকা খুঁজিয়া বেড়ান ও বারবনিতাবিলাসের অবাস্তব অতিরঞ্জিত বর্ণনা করেন, তাহা হইলে সহজাত জঘন্য রুচি বশতঃই করিতেছেন বুঝিতে হইবে। সাহিত্য সমালোচকগণের কিন্তু এই পূতিগন্ধময় রচনার জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই। সকল দেশেই এ জাতীয় ঝুঁটা সাহিত্য সৃষ্টি হয় ও রন্ধনশালার দাসী, দোকানদারের বালিকা-বিক্রেত্রী ও দ্বাররক্ষয়িত্রীর দল তাহার রস উপভোগ করে। কেহ

এ সকলকে সাহিত্য বলিয়া ভ্রম করে না ও মহাকাল তাহার অমোঘ দণ্ড সঞ্চালনে এই সকল সাহিত্যিক আবর্জ্জনাকে বিস্মৃতির অতল-তলে নিক্ষেপ করে। কে এখন আর দ্বিতীয় চার্লসের যুগের নাট্যকারগণের রচনা পড়ে বলুন, অথচ এখনও সাহিত্য-রসপিপাসু-গণ Chaucerএর প্রাচীন ইংরজী ও রাবেলের (Rabelais) দুর্ব্বোধ্য প্রাচীন ফরাসী সযত্নে পড়িয়া থাকে। এই সকল আধুনিক সাহিত্যোদ্গারকে সাহিত্য বলিয়া ভ্রম আমাদের দেশেই সম্ভব,—হায়, আমরা ভাবি যাহা ছাপার অক্ষরে সুদৃশ্য বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই সাহিত্য, আর যে কেহ লিখিতে ও পড়িতে জানে সেই শিক্ষিত। কবে এ বিষম ভ্রম ভাঙিবে কে জানে।

সমাজের নিম্নতম স্তরে সাহিত্যের পটভূমি নির্ব্বাচন করার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সাহিত্যিক ব্যাধি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। তাহা বিদেশী সমাজের সমস্যা ও অবস্থানের আবির্ভাব-exotism। সাধারণতঃ এটি প্রায় সকল সবল সুস্থ সাহিত্যে প্রকাশ পায়, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে ইহা প্রবল ব্যাধি-রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। কোন স্বাভাবিক সুস্থ সাহিত্যে এই বৈদেশিকতা আসে, যখন সেই দেশের বিদ্বন্মণ্ডলী প্রীতিবশতঃ কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে থাকে, সেই ভাষার সাহিত্যের চর্চ্চা করে ও সেই জাতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে থাকে। তখন ধীরে ধীরে এই বিদেশী প্রভাব জাতীয় জীবনে তথা সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়। আমাদের দেশে ইংরাজী প্রভাব কতকটা এই ভাবে আসিয়াছে, যদিও স্থানে স্থানে ইহা বেশ একটু উগ্রভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। ফরাসী সাহিত্যে এইরূপ ইতালীয় সাহিত্যের, স্কান্দিনাভিয় সাহিত্যের ও কিছুদিন যাবৎ রুষ সাহিত্যের প্রভাবের যুগ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইউরোপে কিন্তু এই প্রভাবটা অনেক

পরিমাণে সহজভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অধিবাসীদিগের জন্মগত পার্থক্য বশতঃ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিলেও সমস্ত ইউরোপীয় সভ্যতার উৎস সেই গ্রীক-রোম্যান-ইহুদী সভ্যতা ত্রিতয়। ভারতীয় সভ্যতার মূল সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও তাহা এই ইউরোপের অনুকরণের যুগেও ভারতীয় মনে এরূপভাবে দৃঢ়নিবিষ্ট যে তাহার সহিত ইউরোপীয় সভ্যতার সমীকরণ চেষ্টা অত্যধিক আয়াসসাধ্য ও শক্তিসাপেক্ষ। অধিকন্তু আমরা যদি এই সকল ইউরোপীয় ভাষা স্বয়ং শিক্ষা করিয়া ও তাহাদের মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া এই বৈদেশিকতার আমদানি করিতাম তাহা হইলে ইহার আকার বোধ হয় একটু বিভিন্নই হইত। আমাদের আধুনিক লেখকগণ কিন্তু অধিকাংশ ইউরোপীয় সাহিত্য পড়েন ইংরাজী অনুবাদে। অনুবাদ সাহিত্যের যাঁহারা কিছু সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন যে ইহার অধিকাংশই নবীন ভাষা শিক্ষার্থীর শিক্ষানবিশির ব্যাপার,—ইহাতে মূলের রস ত থাকেই না, বহু স্থলে মূলের অর্থও রক্ষিত হয় না। প্রকৃত সাহিত্যরসিক কর্ত্তৃক বিশ্বাস-যোগ্য অনুবাদ অতি বিরল। ফলে সাহিত্যের যে অংশ শুধু বলিবার ভঙ্গি, সংস্কৃত অলঙ্কারে যাহাকে "রীতি" সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার কোন মাধুর্য্যই এই সকল অনুবাদে পাওয়া যায় না, বিদেশী শিল্পীগণের সুচারু সৌষ্ঠবজ্ঞান ও মানসিক সমতার চিহ্নও অনেক সময় থাকে না,—থাকে মোটামুটি ভাবটি ও নজরে পড়ে তাহাদের অতিশয়োক্তি, কেন্দ্রভ্রষ্টতা, ভাবের অসমতা ও মনের বন্ধুরতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে রুষ সাহিত্যিক অপস্মাররোগী দস্তোইএভস্কির (Dostoievsky) আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে প্রবল প্রভাব। সুকুমারভাবসম্পদে ও সুললিত ভাষার ঝঙ্কারে অতুলনীয় মহাকবি পুস্কিণের (Pushkin) প্রভাব বঙ্গ সাহিত্যে একেবারেই নাই। হয়ত অনেকে তাহার নাম পর্য্যন্ত ও

শুনেন নাই। অনুবাদেই হউক বা মূলেই হউক বিদেশী সাহিত্যজ্ঞান মানসিক সম্পদ বৃদ্ধি করেই, কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে বিদেশী সাহিত্যের জ্ঞান ও বৈদেশিকতা ভিন্ন পদার্থ। রন্ধন শালায় যে সমস্ত দ্রব্য পাক হয় তাহা খাইয়া আমাদের পুষ্টি হয় কিন্তু রান্নাঘরের বিচিত্র সুবাস-বাসিত বস্ত্রে বৈঠকখানায় প্রবেশ করা যায় না বা উচিত নয়। এ বিষয়ে আর একটি কথা মনে রাখা উচিত। কোন জাতির সাহিত্য বা শিল্প তাহার মানস তরুর বাহিরের মুকুলোদ্গম মাত্র। তাহার মূলে বহুযুগসঞ্চিত তাহার ইতিহাস, ধর্ম্ম, পৌরাণিক উপাখ্যান, লোককথা, ঐতিহ্য এমন কি জলবায়ুর প্রভাব রহিয়াছে—এক কথায় বলিতে গেলে শিল্পসাহিত্য জাতির লোকলোচনান্তরালবর্ত্তী বিশাল মানসিক জগতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এইগুলি গভীরভাবে আলোচনা না করিলে তাহার সাহিত্যের রস পাওয়া বা সাহিত্যিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া অসম্ভব। একথা শ্লাভজাতির মত ভাবপ্রবণ, ধর্ম্মভীরু প্রেমপিপাসু ও স্থানবিশেষে নির্ম্মম জাতির সাহিত্যালোচনায় কতদূর মনে রাখা উচিত তাহা সহজেই অনুমেয়। আশা করা যায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবীগণের মধ্যে ইউরোপের উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের সহিত যতই প্রত্যক্ষ পরিচয় হইবে ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃত অনুশীলন বাড়িবে সাহিত্যক্ষেত্রে ততই উৎকৃষ্ট বৈদেশিকতার হাস্যকর আতিশয্য লোপ পাইতে থাকিবে।

চিত্রকর যেমন প্রধানতঃ রেখাচিত্রের (Drawing) দ্বারা তাঁহার হৃদয়নিহিত সৌন্দর্য্যের আদর্শটিকে বাহিরে নেত্রবিষয়াগত করিয়া তোলেন, সাহিত্যশিল্পীও তেমনই চরিত্রাঙ্কনের দ্বারা তাঁহার মনোগত বক্তব্য পরিস্ফুট করেন ও শিল্পব্রতের কোন অংশেই বোধ হয় এত অধিক সাবধানতা, শ্রম ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না।

জার্ম্মান শিল্পী ড্যুরারের (Durer) রেখাঙ্কন দেখিলে মনে হয় শিল্পীকে বুঝি কখনও পেনসিল তুলিতে বা কোন রেখা মুছিতে হয় নাই,—অকম্পিত হস্তে প্রথম চিত্রণেই চিত্রটির রেখাঙ্কন তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন; সেক্সপিয়রের চরিত্রাঙ্কনেও তেমনই সহজাত অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শিল্পেতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন এই সামান্য সরল রেখাগুলির পশ্চাতে কি একাগ্র সাধনা কত অস্থিতত্ত্বের, স্নায়ুতত্ত্বের ও মনস্তত্ত্বের ভাব-ব্যঞ্জনার (Psychology of emotions) গভীর জ্ঞান নিহিত আছে, আর সেক্সপিয়রের ওই অনায়াস স্বভাবসুন্দর চরিত্রাঙ্কনের পশ্চাতে মানব-স্বভাবের ও সংসারের কত গভীর জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। এই চরিত্রাঙ্কনেই বোধ হয় শিল্পীর মানসিক উৎকর্ষের প্রকৃত পরিমাণ পাওয়া যায়। যাঁহার অঙ্কিত চরিত্রের পরিণাহ-রেখাগুলির যত অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত, দেহগ্রন্থিগুলি ও কোণগুলি নয়নপীড়াকরভাবে প্রত্যক্ষ সেই শিল্পীর মানসিক দৈন্য ততই প্রকট বোধ হয়। এই চরিত্রাঙ্কন বিষয়ে অবশ্য আলঙ্কারিকগণ নানা প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়াছেন ও ক্রমোন্নতিশীল মনস্তত্ত্ব হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল গ্রন্থাগত বিদ্যার অন্ধ অনুসরণে সংস্কৃত সাহিত্যের "প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ" বা "বেণীসংহারের" মত সাহিত্যিক বিভীষিকারই জন্ম হয়। শিল্পেতিহাসে কেবলমাত্র পেশীতত্ত্বের অনুশীলনে আসিরীয় শিল্পের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্রই প্রকৃত উচ্চাঙ্গের প্রতিভা এই সকল বাহ্য সাহায্য অতিক্রম করিয়া আপন মহিমায় আপনিই অভিব্যক্ত হয়।

কেবলমাত্র রেখাঙ্কন করিলেই চিত্রশিল্পীর কার্য্য শেষ হইল না, তাহাতে বর্ণক্ষেপের দ্বারা স্বভাবানুরূপ করিয়া তুলিতে হয়।

সাহিত্যশিল্পীকেও চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা দান করিতে হয়। চিত্রশিল্পীর কতক পরিমাণে বর্ণরসায়নবিদ্যা ও আলোকতত্ত্বের জ্ঞান না থাকিলে চলে না, সাহিত্যশিল্পীর পক্ষে ও তাঁহার ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। এই জ্ঞান যত সূক্ষ্ম হইবে, তাঁহার ভাষাপ্রয়োগ ও তত বিশুদ্ধ ও যথোপযুক্ত হইবে। এ বিষয়ে একটু যত্নের অভাবে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের মহারথীগণের রচনাতেও মাঝে মাঝে শব্দের অপপ্রয়োগ, শ্রুতিকর্কশতা ও অলঙ্কারচ্যুতি দৃষ্ট হয়। ইংরাজীতে বলে "হোমরও মাঝে মাঝে ঢুলেন," কার্য্যটা কিন্তু হোমরের পক্ষে গৌরবের নহে সকলেই স্বীকার করিবেন। বর্ণজ্ঞানের সহিত শিল্পীকে আর একটি সুকুমার বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয়। সেটি স্নিগ্ধীকরণ (toning) ছায়ালোকের ও বর্ণ-প্রক্ষেপের স্বল্পাধিক গভীরতা দ্বারা ভাবের নিবিড়তা বা লঘুত্ব জ্ঞাপন করা এবং ইহা যে কত কঠিন কার্য্য তাহা শিল্পীমাত্রেই বুঝেন। সাহিত্যশিল্পীকেও বর্ণনীয় বিষয়ে সুর লাগাইতে হয়— অলঙ্কার সাহায্যে, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের যাদৃচ্ছিক সৃষ্টি করিয়া বর্ণনার স্বল্পাধিক দীর্ঘতা, ভাষার পেলবতা বা বন্ধুরতা দ্বারা ও সর্ব্বোপরি লেখনীর সংযমদ্বারা। এ বিষয়ে কৃতকার্য্যতা শিল্পীর মনের সুকুমারতা ও সূক্ষ্মভাবগ্রাহিতার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। বাহিরের সাহায্যের মধ্যে আলঙ্কারিকগণের উপদেশ ও বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনার পুনঃপুনঃ অনুশীলন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কবিযশঃপ্রার্থীকে বারবার এই সকল মহাগ্রন্থ পাঠ করিয়া এমনই অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, যাহাতে তাহার মনের অসমতা ও জড়তা কাটিয়া যায় ও শ্রবণের সূক্ষ্মতা সাধিত হয়। শিল্পানুরাগীর পক্ষে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এইরূপ বায়ু পরিবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন। কথা উঠিতে পারে যে এইরূপ মহাকবিগণের গ্রন্থানুশীলন বহু সময়সাপেক্ষ ও মৌলিকতার বিরোধী। এ আপত্তি কিন্তু উদ্যমহীনতা

ও আলস্যের অজুহাত বলিয়াই বোধ হয়। বিশ্বসাহিত্যের মহাকবিগণের গ্রন্থাবলী মনোযোগের সহিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় কেবলমাত্র সাহিত্য নহে কত বিভিন্ন জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের মন সমৃদ্ধ হইয়াছিল। দান্তের মহাকাব্যে মধ্যযুগের খৃষ্টীয় অধ্যাত্ম বিদ্যার (Christian theology) জ্ঞান কিরূপ ওতপ্রোত তাহা দান্তেপ্রেমিক মাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, গ্যয়েটের (Goethe) কবিতায় রসায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের অদ্ভুত পারদর্শিতা পর্য্যন্ত সকল বিদ্যাই সুন্দর সমন্বয়ে গ্রথিত। এখনও ফ্রাঙ্কফোর্টে (Frankfort) জার্ম্মান সরকার কর্ত্তৃক জাতীয়নিধিরূপে সংরক্ষিত Goethehausএ কবির বাল্য কৈশোরের নানা বিদ্যানুশীলনের যে সকল স্মৃতি রহিয়াছে তাহা দেখিলে কত বিভিন্ন জ্ঞানধারা সেই মহতী প্রতিভাকে পুস্ট করিয়াছিল তাহা কতকটা বুঝা যায়। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই আমাদেরই ঘরের কবি বিশ্ববরণ্যে তথাকথিত মূর্খ কালিদাস বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অলঙ্কার, দর্শন, জ্যোতিষ এমন কি কামসূত্র পর্য্যন্ত তৎকালীন প্রায় সকল বিদ্যায়ই পারদর্শী ছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ তাঁহার গন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। অতএব অধ্যয়নের পরিমাণ অধিক হইলেই মৌলিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে ইহা অসার কথা। যাহাদের মৌলিকতা কখনও নাই তাহাদের কখনও হইবেও না, তাহারা পণ্ডিতই হউক, আর মৌলিকতা লাভের আশায় মুর্খই থাকিয়া যাউক। অবশ্য ইহারা পণ্ডিত হইয়া উঠিলে অনেক সময় পাণ্ডিত্যের ভার একা বহন করা কস্টকর হইয়া উঠে, তখন তাহারা বাচাল হয় ও সেই পাণ্ডিত্যগন্ধী বাচালতা সাহিত্য বলিয়া অনেকের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু সহিষ্ণু বঙ্গভারতী এখন সাহিত্যের নামে যে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিতেছেন পণ্ডিতমূর্খতা তাহা অপেক্ষা বেশী কষ্টকর হইবে না। অবশ্য এইভাবে বিশ্বসাহিত্যের মহাকাব্যরাজি অনুশীলন

ও স্বাঙ্গীকরণ সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা বাণী সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিমাণ ও বড় কম নয়। তাঁহারা সাময়িক সফলতা রঙ্গালয়ের চপল করতালির জন্য ত লালায়িত নহেন; তাঁহারা তাঁহাদের রচনা, তাঁহাদের শিল্পসৃষ্টি লইয়া মহাকালের সভায় উপস্থিত হইতে চাহেন ও অনাগত ভবিষ্যৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়-তন্ত্রীতে তাঁহাদের মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি তুলিতে চাহেন। এমন সিদ্ধি যাঁহারা চাহেন তাঁহাদের সাধনা যে একটু কঠোর হইবে তাহাতে সন্দেহ কি। স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বলিতেন, "ফাঁকি দিয়া কখনও কোন বড় কাজ করা যায় না"। কথাটা সাহিত্যক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। যে সকল অস্থিরমতি তরুণ সাহিত্যিক বিদেশের ভাষা ও বিদেশের সাহিত্যানুশীলন দূরের কথা নিজের ভাষা ও নিজের দেশের মহাকবিগণের গ্রন্থাবলী অনুশীলনের ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না তাঁহারা যে কিরূপ ভাষা ও কিরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

অথচ ইঁহাদিগের মধ্যেই কোন ভাষা সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত, লিখিত ভাষা না "কথ্য" ভাষা; কোন জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করা উচিত, সংস্কৃতজাত না ফরাসী ইংরেজী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষা জাত, ইত্যাদি প্রশ্ন লইয়া বাদ বিতণ্ডার অবধি নাই। এ বিষয়ে কোন নিয়ম করিতে গেলে ও যদি সে নিয়ম বাস্তবিকই সর্ব্বদা চালান যায় তাহা হইলে ভাষাকে অযথা পঙ্গু করিয়া ফেলা হয়। সচল জীবন্ত ভাষা মাত্রেই জাতির মার্জ্জিত সমাজে কথিত ভাষার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলে। কিন্তু সাহিত্য ত জাতির অকিঞ্চিৎকর দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটী লইয়াই থাকে না, তাহা জাতির উচ্চতম চিন্তা ও পবিত্রতম আদর্শকে ভাষার বেষ্টনে মূর্ত্ত

করিয়া তোলে, সেজন্য সাহিত্য দৈনন্দিন জীবনের কারখানায় বা কুস্তীর আখড়ায়, কথিত ভাষা অতিক্রম করিয়া আপনার উপযোগী একটি ভাষার সৃষ্টি করে। ইহাই সাহিত্যের ভাষা তথাকথিত "কথ্য" ভাষার সহিত যেমন একদিকে ইহার যোগ আছে, আর একদিকে সে ভাষা হইতে তাহার ব্যবধানও তেমনই সুস্পস্ট। সাহিত্য-শিল্পীর কাণ যদি ঠিক হইয়া গিয়া থাকে ত তাহাকে কোথায় কোন ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে সেজন্য গ্রন্থে গ্রন্থে সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। ভাষা জাতির মনোভাবের ব্যঞ্জক মাত্র। জাতির মন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় যত যুগে যুগে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, তাহার মনোভাবের সেই সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আভাষ প্রকাশ করিবার জন্য ততই নূতন শব্দের প্রয়োজন হয়। ভাষার শব্দসম্ভার কেবলমাত্র অভিধান লিখিত অর্থ লইয়াই ব্যবহৃত হয় যে তাহা নহে, শব্দ মানুষের মগ্নচৈতন্যের গুপ্তপুরীর নিভৃততম প্রান্ত পর্যান্ত সংগোপনে তাহার অর্থ মূলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা প্রসার করিয়া নিঃশব্দে আমাদের মনোরাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে। এক একটি সুচিন্তিত শব্দের প্রয়োগে আমাদের মনোরাজ্যের কতদূর পর্যান্ত কি ভাবে আলোড়িত হয় তাহার সঙ্কেত নিপুণ কবি জানেন আর সেইখানেই তাঁহার চাতুরী, সেই খানেই তাঁহার প্রতিভা। নূতন শব্দ সৃষ্টি বা আত্মসাৎ করিবার সময় আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব কিরূপ হইবে, বর্ত্তমান শব্দ-সম্ভারের সহিত তাহা কতদূর মিলিবে ইহা বিবেচনা করিয়াই নূতন শব্দ গ্রহণ করিতে হয়। এ বিষয়ে প্রতিভাবান কবিগণের প্রয়োগ পর্য্যালোচনা করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। দান্তের মহাকাব্যের ভাষা বোধ হয় এ বিষয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তাঁহার সময় ইতালীয় ভাষা কতকটা গ্রাম্য অশিক্ষিতদিগের ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত, শিক্ষিত সমাজ লাতিন ভাষাতেই সাহিত্য

রচনা করিতেন। কবি যখন এই অমার্জ্জিত ভাষাকেই আপনার মহাকাব্যের বাহন বলিয়া গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার পথপ্রদর্শক ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু এই অদ্ভুত প্রতিভাবান জগদ্বরেণ্য মহাকবি তাঁহার সহজাত সংস্কারবশে যে সকল শব্দ নির্ব্বাচন করিলেন তাহা প্রায় সমস্তই ভাষার চিরকালের সম্পদ রহিয়া গেল। দান্তেপাঠক মাত্রেই জানেন কবির শব্দসম্ভারের মধ্যে কত অল্পাংশই আধুনিক ইতালীয় ভাষায় অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন শব্দ আহরণ করিতে গিয়া বঙ্গের প্রতি সাহিত্যিকই দান্তের প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় একটি বিশেষ সুবিধা আছে যাহা ইতালীয়ে ছিল না।—বাঙ্গালা মার্জ্জিত ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে সমৃদ্ধ তিনটি ভাষা হইতে শব্দ আহরণ করিতে পারে— সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী (অবশ্য ইংরাজী, মালয়, চীন প্রভৃতি ক্ষুদ্র মহাজনগণের খুচরা ঋণের কথা ছাড়িয়া দিতেছি)। বাঙ্গালা ভাষার কিন্তু একটু নিজের রস আছে, তাহাতে পাক হইয়া এই দুই ভিন্ন দিক হইতে আগত শব্দরাজি বেশ একটু অর্থ-বৈচিত্র গ্রহণ করে ও ইহা বাঙ্গালার শব্দ সমৃদ্ধির একটি বিশিষ্ট কারণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "মশগুল" শব্দটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা আরবী "শগল" কার্য্য হইতে "মফ্‌উল" এই সূত্রানুযায়ী নিষ্পন্ন বিশেষণপদ। ইহার অর্থ 'কার্য্যে ব্যস্ত' ও এই অর্থেই ইহা আরবী ও ফারসীতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই স্বচ্ছ শৌর্গতিক শব্দটি বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া "অতি আনন্দদায়ক কার্য্যে আত্মহারা" বর্ণরসে মনোহর এই উপাদেয় অর্থমণ্ডিত হইয়া বাঙ্গালার জয় ঘোষণা করিতেছে। সংস্কৃত হইতে আহৃত শব্দরাজির এইরূপ অর্থ-বৈচিত্র্য যে কত হইয়াছে তাহা সকলেরই সুবিদিত। একদিকে এইরূপ বিত্তশালী মহাজন থাকা যেমন সুখের বিষয় তেমনই তাহাদের সহিত আদান প্রদানে বেশ একটু সাবধানতার আবশ্যক। প্রতি

ভাষার একটি নিজস্ব সঙ্গীত আছে কিছুদিন এক ভাষা আলোচনা করিলে সেটি বেশ কাণে লাগিয়া যায়। এই সঙ্গীত আরবী, ফারসী ও সংস্কৃতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও এই দুই যোনিস্থান হইতে অপহৃত একার্থ-বোধক শব্দগুলিকে পাশাপাশি উচ্চারণ করিলে তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সেইজন্য এই ঋণ-গ্রহণকালে বেশ একটু সাবধান না থাকিলে পরিণাম অনেক সময় হাস্যকর হইয়া পড়ে। হয়ত বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থের প্রণেতা ও ভূপর্য্যটক আধুনিক বাঙ্গালার একজন বিশিষ্ট লেখকের নাম অনেকেরই মনে পড়িবে।

এতক্ষণ আমরা সাহিত্যের বাহ্যায়তন লইয়াই বিশ্লেষণ করিতেছিলাম। কিন্তু ইহাও অসম্ভব নয় যে একজন সাহিত্যিকের বিশুদ্ধ ও উচ্চভাব আছে ও তিনি তাহাকে ওজোগুণসম্পন্ন নির্দোষ ভাষায় সংক্ষেপে ও উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যরসিক পাঠক তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া একটা অনির্দ্দেশ্য অপূর্ণতা অনুভব করেন,—যদি তাঁহার রচনার ভিতর সেই বর্ণনাতীত সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য বস্তুটি না থাকে যাহাকে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন "কাব্যস্য আত্মা"। সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশে মানুষের অলঙ্কার শাস্ত্রে এ বিষয়ে আলোচনার অন্ত নাই,—এই অনির্ব্বচনীয় অনুভব-সিদ্ধ বস্তুটি কি যাহার অভাবে সাহিত্য-শিল্পীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টি ভাস্করের খোদিত পাষাণপ্রতিমার মত প্রাণহীন থাকিয়া যায়। ভ্রাতঃ শিল্পী পিগমালিয়ন্, হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া সর্ব্বশক্তিমান জিউসের (Zeus) নিকট অকপট কাতরতার সহিত প্রার্থনা কর, তোমার কাণের কাছে দৈববাণী শুনিতে পাইবে "তোমার সৃষ্টিকে প্রাণ দিয়া ভালবাস", আর দেখিবে ঐ মৃত্যুপাণ্ডু-ওষ্ঠাধরে জীবনের লালিমা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইবে

ঐ দৃষ্টিহীন নয়নকোটরে লাবণ্যময়ী তরুণীর বীড়াচঞ্চল প্রেমময় কটাক্ষ ভাসিয়া উঠিবে। সাহিত্যশিল্পী যদি তাঁহার সৃষ্টিকে ভাল-বাসিতে পারেন, তাহার সহিত আপনাকে একীভূত করিতে পারেন তাহা হইলেই তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যুগে যুগে এই প্রাণ স্ফুলিঙ্গের সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন ও কখনও অলঙ্কারে, কখনও রীতিতে, কখনও রসে আর কখনও ধ্বনিতে ইহার সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। অবশেষে ধন্যা-লোককার ও আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য রসধ্বনি নামক বিশেষ ধ্বনিতেই এই প্রাণ-স্ফুলিঙ্গ আছে ও কবি তাঁহার কাব্যাস্বাদনের পর শ্রোতৃ-মণ্ডলির মনে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনাবাসিত সংস্কারের উদ্বোধক অনুরণন তুলিতে পারেন বলিয়াই তাঁহার রচনা কাব্য নামের যোগ্য ইহা স্থির করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। যিনিই সাহিত্যশিল্পী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন তাঁহারই এই সুপ্ত কুণ্ডলিনীকে, এই প্রাণের প্রেরণাকে প্রবুদ্ধ করিতে জানা চাই, নচেৎ তাহার সমস্ত শ্রম, সমস্ত পাণ্ডিত্য বিফল।

অন্তঃকরণের পূর্ণতা ও নিটোল সৌন্দর্য্যের আদর্শটিকে বাহিরে ব্যক্ত করিতে গিয়া চিত্রশিল্পীকে যেমন কোন দৃশ্য,—সাধারণ জীবনেরই হউক বা পুরাণেতিহাসেরই হউক,—অবলম্বন করিতে হয়, সাহিত্যশিল্পীকে তেমনই কোন না কোন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিতে হয়। সকলেই চেষ্টা করেন যাহাতে অখ্যায়িকাটি পাঠকের চিত্তাকর্ষক হয় ও তাহার মনে সহজে মুদ্রিত হইয়া যায়। সাময়িক যে সকল ঘটনা সকল লোকের মনে নিগূঢ় ব্যথায় ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে, রাজকীয় অবিচার বা সামাজিক আচার,—এইরূপ কোন ঘটনা অবলম্বন করিলে পাঠকের মনে সহজেই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বলিয়া তাহা অবলম্বন করিবার প্রলোভন

সহজেই অনুভূত হয়। এইরূপ সাময়িক উত্তেজক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত গ্রন্থের সমাদর অকস্মাৎ এতই অধিক হইয়া উঠে যে সাধারণের মনে হয় বুঝি সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ গ্রন্থ আর কখনও রচিত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যিক শুধু তাঁহার যুগের একটি সীমাবদ্ধ সমাজের প্রশংসার জন্য বা সহজে কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য ত রচনা করেন না, তিনি চিরকালের জন্য মানব মনের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য অমৃত ভাণ্ড হস্তে অবতীর্ণ, তাঁহার রচনা বিধাতার বহু হইবার বাসনার মত অদম্য সৃষ্টি প্রেরণার ফল। এই সাময়িক প্রলোভনের আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাঁহাকে মানবহৃদয়ে গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইবে ও যে সকল বেদনা, যে সকল সমস্যা মানুষ মানুষ বলিয়াই তাহাকে অনাদিকাল ব্যথা বা আনন্দ দিয়া আসিতেছে সেই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব তাহার প্রতিভার কুহকদণ্ড স্পর্শে রূপরসগন্ধে মনোরম করিয়া লোকলোচন-বর্ত্তী করিতে হইবে। দুদশ বৎসরে না হউক দু চার শত বৎসরে সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবেই, কিম্বা সমস্যাগুলির আকার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইবেই, তখন সে সকল অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহা অসংখ্য বিস্মৃত লঘু পত্রিকার (pamphlet) মত বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া যাইবে। আজ কাল ইংরাজী সাহিত্যের কোন ছাত্র No popery দাঙ্গার যুগের বা Darien Scheme যুগের লঘু-পত্রিকা সকলের সংবাদ রাখে কি? কেহ কি কখনও কল্পনা করিতে পারেন যে "La Belle Jardiniere" নামে রাফায়েল্লোর (Raphaello) উদ্যান মধ্যস্থ মাদোন্নার অপূর্ব্ব চিত্র মাণিকতলার কোন নার্শারির বিজ্ঞাপন পত্রের জন্য চিত্রিত হইয়াছিল বা তিৎসিয়া-নোর (Tiziano) La Noce in Cano নামে বিবাহ সভার ভোজের বিরাট চিত্র College Square এর কোন ভোজনাগারের

দ্বারলাঞ্ছন (Sign Board) ছলে চিত্রিত হইয়াছিল? সাময়িক উত্তেজক ঘটনা অবলম্বনে শিল্পসৃষ্টি কিরূপ অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক হয় তাহা উল্লেখ মাত্রে ঐ প্রতীয়মান হইবে। আর একদিকে মহা-কবিগণের সৃষ্ট ইফিজেনিয়া, আন্তিগোনি, দেশ্‌দেমোনা, সীতা, সাবিত্রী চরিত্র লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ইহারা সেই সুদূর অতীত হইতে এই সভ্যতাপ্লাবিত বিংশ শতক পর্য্যন্ত মানবমনে কি অনন্ত সুষমা, কি অপরিমেয় মাধুর্য্য সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। উচ্চাঙ্গেব শিল্পের ইহাই রহস্য। তাহা মৃগমদের মত অনন্ত সুরভি বিতরণ করে, রেডিয়াম কণার মত অনন্ত আলোক বিতরণ করে কিন্তু নিজে নিঃশেষ হয় না।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তাই প্রাচীনও নয়, নবীনও নয়, তাহা চির-কালের, তাহার সুনীতি দুর্নীতি স্মৃতিশাস্ত্রশাসিত সুনীতি দুর্নীতি নয়, বিশ্বস্রষ্টার যে অমোঘ নীতি মানবসৃষ্ট সকল কৃত্রিম নীতি চূর্ণ করিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চালাইতেছে ইহা তাহারই অংশ। ইহা সবল, সুস্থ, সহজ। ইহার লীলা আছে কিন্তু অলীক ভাববিলাস (ন্যাকামি) নাই। ইহা শান্ত, স্থির আপনার গাম্ভীর্য্য সমাহিত। এরূপ সাহিত্য আপনার মনের কথা আপনি বোঝে, তাই পরের কথার উচ্চ প্রতিধ্বনি করিয়া করতালি চায় না এবং কতটুকু বলিলে বক্তব্যটি বলা সম্পূর্ণ হইল জানে, তাই বৃথা বাগাড়ম্বর বিস্তার করে না।

প্রকৃত সাহিত্যের এই আদর্শ যদি আপনারা গ্রহণ করেন তাহা হইলে যে বাদ প্রতিবাদে কিছুদিন যাবৎ আধুনিক সাহিত্য মুখর হইয়া উঠিয়াছে ও যাহাতে আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছি যে বঙ্গ সাহিত্যের বিশ্ববরেণ্য ঋষি-কল্প মহাকবিও বিচলিত হইয়াছেন তাহা

অনর্থক বাগ্‌জাল বিস্তার বলিয়া বোধ হইবে। আর যে, সমস্ত পূতিগন্ধময় কৃমীকীট কিছুদিন হইতে বঙ্গ-সাহিত্য শরীরে বিচরণ করিতেছে সাহিত্যের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিলে তাহারা আপনা আপনিই খসিয়া পড়িবে ও লুপ্ত হইয়া যাইবে। সাহিত্যসাধকের অচঞ্চল আদর্শ ও কঠিন সাধনার যে চিত্র আমার মনে হইয়াছে তাহা সমাগত সুধীমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিলাম, বিচারভার আপনাদিগের।

আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের সমস্যাটি সকল দিক দিয়া ও অপক্ষপাতভাবে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এই সমস্যার সমাধান ভবাদৃশ সাহিত্যরথীগণের পক্ষেই সম্ভব,—সমস্যাটি আপনাদের গোচরে উত্থাপিত করিয়া দিয়াই আমার ন্যায় অসাহিত্যসেবীর অবসর। কোনও নামোল্লেখ না করিয়া, অকুণ্ঠিত সারল্যের সহিত ও কৃত্রিম মিষ্টভাষণ বা অনাবশ্যক রূঢ়তা বর্জ্জন করিয়া এই কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যদি অজ্ঞাতে কোন অপরাধ করিয়া থাকি ত তাহা আমার ভাষা-জ্ঞানের দৈন্য ও অসামাজিকের অকুশলতাবশতঃ হইয়াছে জানিয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবেন ইহাই বিনীত নিবেদন।

আর একবার সমাগত সুধীমণ্ডলীকে আমাদের গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। স্বাগতম্‌, মিত্রগণ; গুরুগণ, স্বাগতম্‌। দরিদ্রের অনাড়ম্বর অঙ্গনে অপ্রচুর আয়োজনে, আন্তরিক প্রীতিশ্রদ্ধার অঞ্জলী লইয়া আপনাদিগকে বরণ করিতেছি। বঙ্গবাণীর পাদপীঠতলে আজ আমাদের স্নিগ্ধচ্ছায় পল্লীপ্রান্তে আপনাদিগকে আহ্বান করিতে পাইয়া আমরা কিরূপ ধন্য মনে করিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেই সঙ্গে আয়োজনদৈন্যের লজ্জায়

আমাদিগকে অসীম ব্যথায় ব্যথিত করিতেছে। আপনারা আপনাদিগের স্বাভাবিক স্নেহদক্ষিণকরস্পর্শে আমাদিগের সকল ত্রুটি সকল অপূর্ণতা মুছিয়া দিন ইহাই প্রার্থনা। আর যখন এই কয়দিনের মিলনের পর আমরা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িব আশা করি তখন হয়ত এমনই কোন চ্যুত-মুকুলমদির চৈত্রপ্রাতে, হয়ত আজিকার মত কোন জ্যোৎস্নাবিবশ বিবিক্ত নিশীথে আজিকার স্মৃতিটি আপনাদিগের মনে পড়িবে ও দেশ কালের ব্যবধান তুচ্ছ করিয়া আজিকার মিলনমাল্যটি কোন অদৃশ্যশিল্পীর স্পর্শে পুনগ্রর্থিত হইবে। স্বাগতম্, সুধীবৃন্দ, স্বাগতম্।

অষ্টাদশ অধিবেশনের সভাপতি

ডক্টর শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ,

বাহাদুর. ডি লিট্, কবিশেখর

সভাপতি

শ্রীযুক্ত রায় দীনেশ চন্দ্র সেন, বি, এ, বাহাদুর, ডি, লিট, কবিশেখর মহাশয়ের অভিভাষণ।

সমবেত ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ!

আপনারা আমাকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া যে অতুল সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তার জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মাজু হইতে বঙ্গের কবি-সম্রাট ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মভূমি বেশী দূরবর্ত্তী নহে। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বতঃই তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত হইতেছে। বঙ্গীয় কবিতাক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র ছিলেন এক জন যথার্থ শিল্পী। এ দেশের তন্তুবায়গণ মস্‌লিন তৈয়ারী করিয়া অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন; এ দেশে নব্য-ন্যায়ের যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই নৈয়ায়িকগণ যেরূপ ক্ষুরধার বুদ্ধি ও যুক্তির সূক্ষ্মতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাহাকে ন্যায়শাস্ত্রের 'শিল্প' বলিয়া অভিহিত করা চলে। মাগধ ভাস্করেরা বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া ভাস্কর্য্যের যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিয়াছেন, সেই শিল্প পাথরের গায়ে চিরস্থায়ী দাগ রাখিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা মেয়েরা রান্নাঘরে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে শিল্পীর ন্যায় যে পটুতা দেখাইয়াছেন, তাহা অসামান্য; তাঁহাদের হাতের মিষ্টান্নে, কন্থাসীবনে ও আলিপনার শ্রীতে কোমল চারু শিল্প লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের ব্যাখ্যাকল্পে রূপ গোস্বামী

৩ শত ৬৫ প্রকার নায়িকা-ভেদ দেখাইয়া যে "উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় আধ্যাত্মিক শিল্প ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ দেশের নানাদিক্ দিয়া আমরা যে সূক্ষ্ম কারু ও শিল্পের পরিচয় পাই, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের কবিতাও সেই চারুশিল্পের নিদর্শন দিয়াছে। এ জন্য কোন সমালোচক বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র এ দেশে তাজমহল রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহা পাথরে নহে, ভাষায়।

জয়দেব দেব-ভাষাকে যে ললিত কলায় শোভিত করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালায় সেই কোমলতার শ্রী আরও অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে তিনি যে সাতনরি দোলাইয়া দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিতে দামী পাথর ও মনিমাণিক্যের প্রভা স্পষ্ট। আজ তাঁহার কাব্য-সমালোচনার অবকাশ নাই, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের একখানি চালচিত্র আঁকিয়া কবি-সম্রাটের স্থান প্রদর্শন করার প্রয়োজন হইয়াছে। আপনাদের মধ্যে যে সকল তরুণ মনস্বী যুবক আছেন, তাঁহাদের কেহ এই ভার লইতে পারেন। অন্ততঃ ৫।৭ বৎসর সেই লেখকের ভারতচন্দ্রকে লইয়া তপস্যা করিতে হইবে, তবেই চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। আমরা চাহি না যে, ভারতচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আজ শুধু বাক্যব্যয়ে নিঃশেষ হইয়া যায়। এই ভক্তি যদি খড়ের আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া ক্ষণেকের জন্য কতকটা ধোঁয়া রাখিয়া নির্ব্বাপিত হয়, তবে আমাদের কাজ কিছু হইল বলিয়া মনে করিব না। আজ কতকগুলি ধোয়ার মত কথায় যাহা আরম্ভ করা হইল, তপস্যার অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাকে সার্থক করিতে হইবে। আপনাদের মধ্যে আহিতাগ্নিক কে আছেন, যিনি জ্বালাইয়া নিবাইতে দেন না,—তেমন পূজক চাই, এই যজ্ঞ—এই হোমের জন্য।

এমন দিন গিয়াছে—যখন ভারতচন্দ্রের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া শিক্ষিত যুবক দশ হাত দূরে সরিয়া যাইতেন। এখন আমাদের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়াছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের মত কবি দুর্লভ, তাঁহার জোড়া মিলা সহজ নহে। সে দিন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীও প্রকাশ্য সভায় ভারতচন্দ্রকে এইরূপ উচ্চ প্রশংসা দিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের জীবন বিচিত্র ঘটনা-সঙ্কুল। এই বিচিত্র জীবনের ধাপে ধাপে তাঁহার প্রতিভা শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্র রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপতির কোপে পড়িয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কতক দিনের জন্য কারাবাস পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছিলেন। কেশরকুনি কুলে বিবাহ করার অপরাধে তিনি পেঁড়ো গ্রামের বাড়ী হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। রামদেব নাগ নামক জনৈক ভূস্বামী কবির ব্রহ্মোত্তর জমীর উপর দৌরাত্ম্য করাতে তিনি বিষম ক্ষোভে নাগাষ্টক লিখিয়া মনের জ্বালা অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। খেজুর গাছে খোঁচা মারিলে যেরূপ রস পাওয়া যায়, নাগ মহাশয়ের দৌরাত্ম্যের জন্য আমরা সেইরূপ এই অম্লমধুর কবিতাটি পাইয়াছি। চাষীদের গান হইতে তিনি অন্নদামঙ্গলের মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চাষীরা শিব-ঠাকুরের কাঠামো তৈয়ারী করিয়া তাঁহাকে একমেটে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। ভারতচন্দ্র শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয়, গোরক্ষের পালা গান, রামেশ্বরের শিবায়ন—পূর্ব্ববর্ত্তী এই বিচিত্র উপকরণের উপর তাঁহার অসামান্য নির্ম্মাণ-কৌশল দেখাইয়া রং ফলাইয়া জীবন্ত শিবঠাকুর গড়িয়াছেন। কোন স্থানে এই দেবতাটি বেদের বেশে কেঁদো বাঘের ছাল পরিয়া ষাঁড়ের উপর চলিয়াছেন,—কোথাও তিনি কোপন-স্বভাব বৃদ্ধ গৃহস্থ, তাঁহার চোখ হইতে ধ্বক্

ধ্বক্ করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে—সেই দৃষ্টির অগ্নি-বৃষ্টিতে অনশনক্লিষ্ট হতভাগ্য ব্যাস ঋষি বাতগ্রস্ত হইয়া ভয়ে থরহরি কাঁপিতেছেন,—কখনও তিনি তরুণী ভার্য্যার বৃদ্ধ স্বামী—দাম্পত্য সুখে আকণ্ঠ ডুবিয়া মাতুয়ারা হইয়া ললিত ছন্দের তালে তালে নৃত্য করিতেছেন; কখনও তিনি রুদ্রমূর্ত্তি, ভুজঙ্গপ্রয়াতের ছন্দোবদ্ধ গাম্ভীর্য্যে তাণ্ডব-নৃত্যের দ্বারা জগৎ প্রকম্পিত করিতেছেন। গোরক্ষবিজয়ের ভিক্ষুক শিব, রামেশ্বরের চাষা শিব, বঙ্গপল্লী কবি অঙ্কিত লাম্পট্য-দোষদুষ্ট বৃদ্ধ শিব—এইভাবে নব চিত্রপটে—নব বর্ণে—নব ঔজ্জ্বল্যে, ছন্দের অপরূপ পারিপাট্যে জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভারতের অপূর্ব্ব শিল্পকলায় চাষার রূপ ফিরিয়া গিয়াছে; চাষার বেশের মধ্যে শিবের দেবত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুমারের হাতের সদ্য তৈয়ারী বিগ্রহের মত তাঁহার রং, সাজসজ্জা যেন ঝলমল্ করিতেছে। ভারতচন্দ্র তোটক, মন্দাক্রান্তা ও ভুজঙ্গ-প্রয়াত প্রভৃতি ছন্দকে নূতন গড়ন দিয়াছেন। প্রাচীনেরা অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইয়া হিমসিম খাইয়াছেন, সেখানে ভারত মিত্রাক্ষরের মঞ্জীর পরাইয়া স্বচ্ছন্দগতি ভাষায় যে চমৎকার কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন তাহা আপনারা সকলেই জানেন, বাঙ্গালা ভাষায় যে ঐ সকল ছন্দে লিখিত কবিতা হইতে পারে, তাহা সে যুগে বিশ্বাসের বস্তু ছিল না, এই ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণের অভাব, তার উপর আবার তিনি স্বেচ্ছাকৃত উপসর্গ—মিত্রাক্ষর জুড়িয়া দিয়া অসামান্য সাফল্যকে আরও অসামান্য করিয়া সংস্কৃতের কবিগণের উপর টেক্কা দিয়াছেন এবং আমাদের ভাষার ঐশ্বর্য্য অবিসংবাদিতভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আপনারা কি জানেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বিরচিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় চিঁড়সাহীর নীলমণি কণ্ঠাভরণ গায়েন কর্ত্তৃক তাহা সর্ব্বপ্রথম গীত

হয় ? সেই নীলমণি কণ্ঠাভরণের কোন বংশধর বিদ্যমান আছেন কি ?

পেঁড়ো বসন্তপুর হইতে বসন্তকালের ফুলের হাওয়া আসিতেছে। আপনারা যদি কবিবরের জীবন-কাহিনী লিখিবার ভার গ্রহণ করেন, তবে প্রেরণার অভাব হইবে না। এখানকার আকাশে, বাতাসে, ফুলের নিশ্বাসে কবির স্মৃতি ভাসিয়া বেড়াইতেছে—এই দেশের হাওয়ায় তাঁহার কথা আছে, আপনারা প্রচুর পরিমাণে সে প্রেরণা পাইবেন। আজ রুচির কথা উত্থাপন করা অনাবশ্যক। এক যুগ আসিয়াছিল, যাহা সমস্ত সভ্য দেশেই আসিয়া থাকে—তখন লোক শীলতার আইনকানুন মানিয়া চলিত না। সে যুগ গিয়াছে, তখন স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার বেশী ছিল না। যে সাহিত্য শুধু পুরুষরা পড়িতেন, তাহাতে সাবধানতার বেশী প্রয়োজন ছিল না। তার পর এক যুগ আসিল, যখন স্ত্রীলোকরা বই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সাহিত্য উভয় শ্রেণীর মধ্যে নির্ব্বিচারে ছড়াইয়া পড়িল। মেয়ে-পুরুষরা একত্র হইয়া যাহা পড়িবেন—তাহাতে শীলতার অভাব অসহ্য। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই একটা লজ্জার ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় রুচিবাদী হইয়া পড়িলেন। যে ভাব নূতন আসে, কিছু দিন তাহার একটা বন্যা বহিয়া যায়—ভারতচন্দ্রের কথা দূরে থাকুক, সেই যুগের 'তত্ত্ববোধিনীর' ফাইল পড়িলে বুঝিবেন, নব্যবঙ্গ বৈষ্ণব কবিদের প্রতিও কিরূপ খড়গহস্ত ছিলেন।

রুচিভেদ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে মানুষের মতিগতির যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমরা এখন পদ্মার ভাঙ্গুনি পারে অবস্থিত। অতি দৃঢ় অট্টালিকার পুরাতন ভিত ধ্বসিয়া পড়িতেছে। যেখানে পুরাতন ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া যাইতেছে, সেখানে নূতন চর পড়িতেছে

ও তাহাতে পলি পড়িয়া অভিনব স্বর্ণ-ফসলের স্বপ্ন দেখাইতেছে আমাদের সাহিত্য ও সমাজের এখন এই অবস্থা।

আমাদের সমাজ ও সাহিত্য এখন নূতন চোখে দেখিতে হইবে। যে সকল পুরাতন পুঁথি-পত্র আবর্জ্জনা বলিয়া আমরা পূর্ব্ব-যুগে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলাম এবং বঙ্গভারতী যাহা বটতলার শতচ্ছিন্ন শাড়ীর আঁচলে কাঁদিতে কাঁদিতে কতক কতক কুড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার আবার আদর হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব-যুগের লোকরা সেগুলি যে চোখে দেখিতেন, এখন আর তাহা সেভাবে দেখা সম্ভবপর হইবে না। এখন ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাবিৎ, সাহিত্যিক, কবি, ভক্ত প্রভৃতি কত শ্রেণীর লোক সেগুলি নানা দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে দাঁড়াইয়াছেন। যাহা পূর্ব্বে পূজা-মণ্ডপের নৈবেদ্য ছিল, এখন তাহা মিউজিয়াম ও পাবলিক লাইব্রেরীতে সাধারণের সেব্য হইয়াছে।

এই রুচি-পরিবর্ত্তন যুগে যুগে নানা কারণে ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে মুসলমান আগমনে একবার আমাদের রুচি ও চিন্তার ধারার উপর একটা ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল। প্রাক্-মুসলমান-সাহিত্য মূলতঃ শৈব ও বৌদ্ধধর্ম্ম লইয়া। এই দুই ধর্ম্মের মিশ্রণে যে ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছিল, পণ্ডিতরা তাহার নাম দিয়াছেন, নাথধর্ম্ম। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ময়নামতী, হাড়িপা, চৌরঙ্গী, কালুপা প্রভৃতি ব্যক্তি ছিলেন এই ধর্ম্মের নেতা। তখন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান এ দেশে খুব প্রবলবেগে চলিতেছিল। সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পুরুষ ও রমণীরা 'মহাজ্ঞান' লাভ করিতেন। 'মহাজ্ঞান' পাওয়ার পর তাঁহাদের আসন দেবতাদের অপেক্ষা উচ্চে হইত। তাহাতে নাকি অসাধ্য-সাধন করা—এমন কি, অমর হইতে পারা যাইত। হাড়িপা ও

ময়নামতী সিদ্ধিলাভ করিয়া যাবতীয় দেবতাকে পরাস্ত করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জীবই শিব, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদটা অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। এই ভেদ অতিক্রম করার পর যে অবস্থা হয়, তাহাই স্মরণ করিয়া চণ্ডিদাস লিখিয়াছিলেন, "শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই।" চৈতন্য-সম্প্রদায় যখন "হরি" "হরি" রবে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিতেছিলেন, তখন নবদ্বীপের অদ্বৈতবাদীরা বিষম রাগিয়া গিয়া বলিয়াছিলেন "জীবই শিব—মানুষ স্বয়ং ভগবান্‌, তবে এ ডাকাডাকি কাহাকে ?" একথা চৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে।

শিব অতি নিশ্চেষ্ট দেবতা, তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে স্বয়ং চেষ্টা করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, সুতরাং তিনি তাঁহাদের কি সহায়তা করিবেন ? চাঁদসদাগরের কষ্টে তাঁহার মন টলে নাই; চন্দ্রকেতু রাজা তাঁহার আশ্রয়-বঞ্চিত; ধনপতি তাঁহার এত গোঁড়া, তাঁহার বিপদে শিব একটা আশ্বাসের বাক্য বলেন নাই। শিবভক্ত সে আশ্রয় বা আশ্বাসের প্রত্যাশা করে না। কারণ, সে জানে, স্বয়ং চেষ্টা করিয়া তাহাকে উঠিতে হইবে। সূর্য্যের সঙ্গে রৌদ্রের, অগ্নির সঙ্গে তাপের যে সম্বন্ধ, জীবের সঙ্গে শিবের তাহাই। কিন্তু জনসাধারণ দুঃখে বিপদে পড়িয়া সহায়তা চাহে, "আমিই শিব" এই কথা তাঁহাদিগকে শান্তি দিতে পারে নাই। তাঁহাদের মনে একটা অভাব রহিয়া যাইত।

মুসলমান আসিয়া দ্বৈতভাবের প্রচণ্ড মহিমা অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারা বুঝাইলেন, তাঁহাদের ঈশ্বর সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকটে। তাঁহারা দিনে পাঁচবার নমাজ পড়েন ও "আল্লাহু আক্‌বর" শব্দে গগন বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার মহিমা ঘোষণা

করেন। এই দ্বৈতবাদীদের জ্বলন্ত বিশ্বাসের নিকট শৈবধর্ম্মের নিশ্চেষ্ট তরণীটি বানচাল হইয়া ভাসিয়া যাইতে উদ্যত। সুতরাং হিন্দুরা মোস্‌লিমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাইবার জন্য শাক্তধর্ম্মের উপর জোর দিলেন। চণ্ডী, মনসাদেবী, শীতলাদেবী প্রভৃতি মাতৃমূর্ত্তি যে আকারেই দেখা দিয়াছেন, সেই আকারেই তাঁহারা আশ্রিতদের রক্ষা করিতে প্রাণপণ করিয়াছেন। এ কথা সত্য যে তাঁহাদের প্রচেষ্টা অনেক সময়েই শোভন হয় নাই। তাঁহারা কোনও সময়ে হনুমানকে ডাকিয়া আকাশে ঝড় উঠাইতেছেন,—অবিশ্বাসীকে দলন করিবার জন্য। কখনও বা অবিশ্বাসীর ভিক্ষা-লব্ধ তণ্ডুলকণা ধ্বংস করিবার জন্য গণদেবের ইন্দুরটিকে চাহিয়া লইয়াছেন। এই সকল অশোভন ক্রিয়া সত্ত্বেও শাক্তধর্ম্মে মাতৃ-মূর্ত্তি অতি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে সন্তান বিপদে পড়িয়া 'মা' বলিয়া কাঁদিয়াছে, সেইখানেই মূর্ত্তিমতী করুণার মত তিনি মধুর হাসিতে মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া সন্তানকে ক্রোড়ে লইতে বাহু প্রসারণ করিতেছেন। মুসলমানদের দ্বৈতভাবটি বঙ্গের জন-সাধারণ তাঁহাদের ধর্ম্মের এইভাবে অঙ্গীয় করিয়া লইল। "আল্লাহু আকবরের" উত্তর হইল "জয়কালী", কিন্তু এই দ্বৈতভাবের পূর্ণতা বৈষ্ণবেরা দেখাইলেন, তাঁহারা খড়গ, অসি, চর্ম্ম ও ভল্লের পরিবর্ত্তে বিশ্বাসের অপর দিকটা দেখাইলেন—তাহা পরিপূর্ণ দয়া, পরিপূর্ণ ত্যাগ দ্বারা।

এক দিকে শাক্তধর্ম্মের অনিবার্য্য, দুর্জ্জয় তেজ, অপর দিকে বৈষ্ণবদের প্রবল ভাবের বন্যা—এই দুই উপাদান দিয়া হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বৈতভাবের উত্তর গাহিল।

দ্বৈতভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য বঙ্গদেশে আঁধারে পড়িয়া গেল।

শৈলসম উচ্চ বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম্মের প্রাচীর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে আঁধার করিয়া দাঁড়াইল। চৈতন্য-পূর্ব্ব যে এক বিরাট সাহিত্য ছিল, এক যুগের জন্য বাঙ্গালী তাহা বিসর্জ্জন দিয়া বসিল। শুধু বিদ্যা-পতি ও চণ্ডিদাস—এই দুই কবির পদাবলী চৈতন্য দিবা-রাত্রি গান করিতেন, এ জন্য ইঁহারা সাদরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু এক বিশাল সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইল,—চৈতন্য-ভাগবতকার তাহার উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া সেই সাহিত্যের অস্তিত্বেরই প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। যোগিপাল, ভোগিপাল ও মহীপালের গীত, যাহাদের কথা লিখিতে যাইয়া বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ প্রমত্ত হইয়া এই সকল গান শুনিত—যে গান না হইলে সমস্ত উৎসব মাটী হইয়া যাইত, সেই সকল গান কোথায় গেল ?

আমরা অষ্টম শতাব্দীতে কালিমপুরের অনুশাসনে উৎকীর্ণ লিপিতে পাইতেছি, রাজা ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে যে পল্লীগীতিকা রচিত হইয়াছিল—তাহা বনচারী রাখালরা, গ্রামোপকণ্ঠে ক্রীড়াশীল বালকরা, দিবাবসানে কর্ম্মক্লান্ত বিপণি-স্বামীরা এবং আমোদপ্রিয় ব্যক্তিরা সর্ব্বদা গান করিত, এমন কি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গদিগকেও সেই গান শিখান হইত, তাহারা ললিত কাকলী দ্বারা মহারাজ ধর্ম্মপালের কীর্ত্তিকথা উচ্চারণ করিত। দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বাণগড়ের মহীপালের তাম্রশাসনে মহারাজা রাজ্যপাল সম্বন্ধেও সেইরূপ পল্লীগীতিকার উল্লেখ আছে। যোগিপাল, ভোগিপাল ও মহীপাল সম্বন্ধে ঐ ভাবের গীতিকার কথা চৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গীয় "রাজমালায়" আমরা "লক্ষ্মণমালিকা"র উল্লেখ পাই, এই "লক্ষ্মণমালিকা"ও লক্ষ্মণসেনের সম্বন্ধে কোন গীতিকা বলিয়াই মনে হয়। সেক শুভোদয়া পুস্তকে

আমরা রামপালদের সম্বন্ধে পালাগানের উল্লেখ পাইয়াছি। রাম-পাল একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং ইনিই পরদার-অপহারক একমাত্র পুত্রকে শূলে প্রাণদণ্ড দেওয়ার আদেশ দিয়া ন্যায়ের অবতার বলিয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থে ধন্যমাণিক্য ও তৎপত্নী কমলা দেবী এবং পরবর্ত্তী রাজা অমরমাণিক্য সম্বন্ধে পালাগানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহারাজ ধন্যমাণিক্য ত্রিহুত হইতে নর্ত্তক ও গায়ক আনাইয়া এই সকল গান কি ভাবে গাহিতে হইবে, তাহা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে বিখ্যাত দস্যুপতি সমসের গাজি ত্রিপুরেশ্বরকে পরাস্ত করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েক বৎসরের জন্য ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার হত্যার অব্যবহিত পরে রচিত তৎসম্বন্ধীয় পালাগান আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। ঈসা খাঁ মসনদ আলি যিনি আকবরের সেনাপতি মানসিংহকে কয়েকবার পরাভূত করিয়া বারভূঞার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও অনেক পালাগানের প্রধান নায়ক,—তাঁহার বংশধর মন্সুর খাঁ দেওয়ান ও ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সম্বন্ধে বহু পালাগান প্রচলিত আছে। তাহার কতক কতক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন। আরঙ্গজীবের ভ্রাতা শাহ সূজা সম্বন্ধে অনেক পল্লী-গীতি চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ত্রিপুরা জেলার পরাক্রান্ত ভূস্বামী পৈলান খাঁর সহিত শাহ সূজার বান্ধবতা হইয়াছিল, কিন্তু পরে উক্ত খাঁ সাহেব শাহ সূজার ঘোর শত্রু হইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধীয় পালাগানের কতক কতক সংগৃহীত হইয়াছে। শাহ সূজা-পত্নী পরীবানু সম্বন্ধে একটি গীতিকা শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাকে জানাইয়াছেন। শাহ সূজার কন্যা আরাকানে মগ-রাজার হাতে পড়িয়া ব্রহ্মদেশের

প্রচলিত খাদ্য নাপ্‌তি খাইতে যাইয়া যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, পল্লী-কবি সাশ্রুচোখে অথচ একটু পরিহাস-রসের অবতারণা করিয়া তাহা বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সেই ছোট পালাগানটি প্রকাশিত করিয়াছি। মৈমনসিংহ সুষঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাণী কমলা দেবীর অপূর্ব্ব ত্যাগ ও তৎপুত্র রঘুরাজার বৃত্তান্ত করুণার উৎসস্বরূপ—আমরা তাহার একটি ইতিপূর্ব্বেই ছাপাইয়াছি, চতুর্থ খণ্ডে শীঘ্রই অপরটি প্রকাশিত হইবে। রাজা রঘু জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। এই সকল পালাগান একটা বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা ছাড়া বাঙ্গালার রূপ-কথা ও গীতি-কথা অসামান্য ভাব-প্রবণতা, আদর্শ প্রেম এবং অতি সূক্ষ্ম সাহিত্যিক শিল্পের পরিচয় দিতেছে। নিরক্ষর চাষাদের মধ্যে এই সাহিত্যের ধারা এখনও বহিয়া যাইতেছে। এখনও মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ মুসলমানরা সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া হৃদয়গ্রাহী পালাগান রচনা করিয়া থাকে।

কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্ব্বে এই শ্রেণীর একটা বিরাট সাহিত্য বিদ্যমান ছিল—আমরা বিস্ময়ের সহিত এখন তাহার পরিচয় পাইতেছি। এই পালাগানগুলি পর্য্যালোচনা করিলে একটা কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে আমাদের দেশের রাজরাজড়াদের রীতিমত ইতিহাস ছিল। তাঁহাদের সভাসদ্ পণ্ডিতরা শুধু তাম্রশাসনে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক রাজগণ ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, তাঁহারা দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতেন। বৌদ্ধযুগের "নীল পীত" নামক ইতিহাসের আমরা সামান্য উল্লেখ মাত্র পাইয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ত্রিপুরার রাজমালা দৃষ্টে এইরূপ পদ্ধতি প্রচলিত থাকার ধ্রুব ও নিশ্চিত প্রমাণ পাইতেছি। ইতিহাস-লক্ষ্মার লীলা শুধু রাজসভায় অবসান হইত না, সেই ইতিহাসের

ধারা পল্লীর কুটীরে কুটীরে প্রবাহিত হইয়া আদর্শ ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও দিগ্বিজয়ী সম্রাটদের কীর্ত্তি গাথা অমর করিয়া রাখিত। আমার বিশ্বাস, বঙ্গদেশের পল্লী-সাহিত্যে যে প্রভূত ঐতিহাসিক উপকরণাদি পাইতেছি, নিকটবর্ত্তী আর কোন প্রদেশে সেরূপ নাই। আমরা পল্লী-সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিয়া এই মূল্যবান উপকরণ হারাইয়া ফেলিতেছি। সত্য বটে, এই উপকরণগুলির মধ্যে কতক কতক আবর্জ্জনা আছে, কিন্তু কোন্ দেশের পল্লী-সাহিত্যেই বা তাহা নাই? আর্থারের লিজেণ্ড, হলেন সিয়াডের ক্রনিকল, রবিন হুডের ছড়া—এ সমস্তের মধ্যেই অনেক সত্য কথা আছে, পণ্ডিতরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন। আমাদের বাঙ্গালা পালাগানগুলির মধ্যে যে ইতিহাসের প্রচুর উপাদান আছে, তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। প্রথম দুই এক অধ্যায় বাদ দিলে রাজমালায় যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বথা গ্রাহ্য। কহ্লনের রাজ-তরঙ্গিনী হইতেও এই বাঙ্গালা পুস্তকখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। "সম্‌সের গাজীর গান" ও একটি নিখুঁত ঐতিহাসক চিত্রপট। চাষারা রাজরাজড়াদের সম্বন্ধে যে সকল গান রচনা করিয়াছে, তাহাতে স্থানে স্থানে উদ্ভট কল্পনা ও অতিরঞ্জনের বিকৃতি সহজেই প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেগুলি অন্ধকার যুগের ঐতিহাসিক রহস্যের অনেকটা সমাধান করিবার উপকরণ বহন করিতেছে।

আমাদের উত্তরে হিমাচল দাঁড়াইয়া আছেন,—উত্তর মেরুর প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ সামলাইয়া লইয়া মহাগিরি ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, শিবের জটাজুটের মত জটিল দুর্গম জঙ্গল কন্দর বাহিয়া গিরিরাজের মহাদান গঙ্গা আমাদের দেশকে শ্যামল শস্য ও সুবর্ণ-ফসলমণ্ডিত করিতেছে। হিমালয় স্বর্ণসৌধ-কিরীটিনী ভারতভূমির শ্রেষ্ঠ গৌরব, কে তাহা অস্বীকার করিবে? অপর দিকে এই

গিরিরাজ চীন, মহাচীন, উত্তর-তুরস্ক প্রভৃতি রাজ্যকে আমাদিগের দেশ হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মঙ্গল জাতি, টিবেটোবর্ম্মন ও অহোমাদি কত পাহাড়িয়া জাতি আমাদিগের পর হইয়া গিয়াছে।

সেইরূপ মহাপুরুষদের অভ্যুদয়ে একদিকে অমৃতের সন্ধান পাইয়া লোকেরা নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হয়, অপর দিকে তাঁহারা আসেন—পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইতে। তাঁহারা ইতিহাসের একটা দিক্ আড়াল করিয়া দাঁড়ান। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বঙ্গীয় পল্লী-গীতিকার সমৃদ্ধ সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইল। একতারা, ডুগড়ুগী ও খঞ্জনীর স্থান বেহালা, মৃদঙ্গ ও মন্দিরা দখল করিয়া লইল। পালাগান শিক্ষিত সমাজ হইতে অপসৃত হইয়া বঙ্গের সুদূর জঙ্গলাকীর্ণ পল্লার চাষীদের কুটীরে আশ্রয় লইল। পাল-রাজাদের গান, গোরক্ষ-বিজয়, মালঞ্চমালা ও কাঞ্চনমালা প্রভৃতি অপূর্ব্ব গীতি-কথার আসর ভাঙ্গিয়া গেল। কীর্ত্তনে দেশ ছাইয়া পড়িল। মহীপাল, রাজ্যপাল, ধর্ম্মপাল ও রামপালের সম্বন্ধীয় গানগুলির স্থানে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান, মাথুর—শুনিবার জন্য জনসাধারণ ব্যগ্র হইল। মানুষের কথা অবজ্ঞাত—উপেক্ষিত হইল, যত কীর্ত্তিমানই হউক না কেন—মানুষের লীলা আর কেহ শুনিতে চাহিল না। দিগ্বিজয়ী সম্রাটের উজ্জ্বল সামরিক অভিযানের কথা আর ভাল লাগিল না। সতীদের অসামান্য প্রেম ও ত্যাগের কথা লোক বিস্মৃত হইল। ইঁহাদের স্থানে হরি-ভক্তগণ জুড়িয়া বসিল। প্রহ্লাদ-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র অম্বরীষের উপাখ্যান এবং শত শত পৌরাণিক গানে আসর জমকিয়া উঠিল। একদিকে গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়া কীর্ত্তনীয়াগণ অপূর্ব্ব মাদকতার সৃষ্টি করিল—অপর দিকে কথক ঠাকুর গদ্য-পদ্য-

মিশ্র কথা ও গানে পৌরাণিক তত্ত্বের বিবৃতি করিয়া পল্লী-গীতিকা-গুলিকে একবারে রঙ্গালয়, নগর ও প্রধান প্রধান কেন্দ্র হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তাহারা মুসলমানপাড়া আশ্রয় করিয়া কোন ক্রমে টিকিয়া রহিল; এখন আবার মোল্লারা সেই নিভৃত স্থান হইতে তাহাদিগকে তাড়া করিতেছেন।

সোনার মানুষ চৈতন্য যে দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন, সে দিকে সোনা ফলিয়া উঠিল। তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডিদাস ও বিদ্যা-পতির গান গাহিতেন, তাই তাহা শত কণ্ঠে গীত হইতে লাগিল। মনুষ্যলীলা-সম্বলিত পালাগানের দিকে তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এ জন্য সে আসর ভাঙ্গিয়া গেল। কেবল হরি-লীলা, কেবলই হরিকথা! পরম বৈষ্ণব কাশীদাস লিখিয়াছেন, একবার হরিনাম লইলে যত পাপ নষ্ট হয়, মানুষের সাধ্য নাই যে, একজন্মে তত পাপ করিতে পারে। এই কথার পর আর কে দেবলীলার কথা ছাড়িয়া মালঞ্চমালা ও মহুয়ার কথা শুনিবে? মহাপ্রভু হিমগিরির মত বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে দিক সম্মুখ করিয়া দাঁড়া-ইলেন, তাঁহার কৃপামধুর দৃষ্টিতে সে দিক ধন-ধান্যে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হইয়া হাসিয়া উঠিল। তাঁহার পশ্চাতের দিকে যেন প্রদীপ নিবিয়া গেল। রূপকথা, গীতি-কথা, পালাগান আঁধারে পড়িয়া গেল। বিষহরী দেবীর গান ও চণ্ডীর গান—যাহাদের কথা বৃন্দাবন দাস উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা শাক্তদের চেষ্টায় পাড়াগাঁয়ে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়া টিকিয়া রহিল। পালাগানগুলি এক সময়ে বঙ্গের সর্ব্বত্র মানুষের লীলা বর্ণনা করিয়া আদর লাভ করিয়াছিল, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গৃহে তাহারা হতাদৃত হইয়া যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, এমন কি ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যসেবীরাও তাহার খোঁজ জানিতেন না।

কিন্তু এই পালাগান ও গীতিকথা যে কি অপূর্ব্ব সামগ্রী, তাহা এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও অবগত নহেন। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিয়া যদি কবিত্বের দিক্ দিয়াও ইহাদিগকে দেখি, তবুও ইহাদের অসামান্য সম্পদ ও অপূর্ব্বত্ব প্রতীয়মান হইবে। শাপ-গ্রস্থা লক্ষ্মীর ন্যায়, বিলয়োম্মুখ ইন্দ্রধনুর ন্যায়, অস্তচূড়াবলম্বী সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া—প্রবল ঝটিকা-বিতাড়িত তরণীর সহিত মলুয়া নদীর জলে নিমজ্জিত হইলেন, সেই দৃশ্য যিনি একবার দেখিবেন, তিনি ভুলিতে পারিবেন না। উহা হৃদয়ের অন্তস্থলে চিরকালের জন্য দাগ কাটিয়া যাইবে। মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া শুভ পরিণয়ের প্রাক্কালে জয়চন্দ্র নামক ব্রাহ্মণ বটু যে দিন ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিল, সে দিন শুভ্র মর্ম্মর-গঠিত সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় চন্দ্রাবতী সহসা যেন স্বর্গের দেবী হইয়া উঠিলেন। দিল্লীর বিরাট্-বাহিনীর সম্মুখীন পুরুষের ছদ্মবেশধারিণী, পক্ক-বিম্বাধরা সখিনার যোদ্ধৃবেশ দেখুন, তিনি কত শেল-শূলের আঘাত সহ্য করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম যুদ্ধ করিয়াছিলেন—একটিবার তাঁহার প্রদীপ্ত উৎসাহ শিথিল হয় নাই। স্বামীর প্রেম ছিল তাঁহার বক্ষের বর্ম্ম, দাম্পত্যের উপর বিশ্বাস ছিল তাঁহার রক্ষা-কবচ ও বাহুর বল—তৃতীয় দিন যুদ্ধাবসানে তিনি বিজয়ী হইতে উদ্যত—মোগলবাহিনী পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, এমন সময় ফিরোজ সাহার তালাক-নামা তাঁহার হাতে পড়িল,—এই স্বামীর জন্য তাঁহার পিতা শত্রু হইয়াছিলেন এবং তিনি এত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এ হেন স্বামী তাঁহাকে তালাক দিয়া দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব চালাইয়াছেন। সেই অনবদ্যসুন্দরী, অনিবার্য্য পরাক্রম-শালিনী স্বামিগতপ্রাণা রমণীর হৃদয় এই নির্দ্দয়তা সহ্য করিতে পারিল না। যে হৃদয় শত্রুর অস্ত্র বিদীর্ণ করিতে পারে নাই—

সেই তালাক-নামা তাহা বিদীর্ণ করিল। স্বামীর হস্তাক্ষর দেখিতে দেখিতে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ঢলিয়া পড়িলেন,—কেল্লা তাজপুরের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ ঘোটক হইতে পড়িয়া গেল। স্বামী জয়ী হইয়া আসিবেন আশা করিয়া যে সখিনা এক দিন বিকশিত পদ্মটির মত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া দরিয়াকে বলিয়াছিলেন, 'দরিয়া বাগান হইতে টগর, মালতী ও চাঁপা তুলিয়া আন, আমি নিজ হাতে তাঁহার গলায় জয়মাল্য পরাইব, পাঁচ পীরের দরগা হইতে ধূলি লইয়া আয়, আমি নিজ হাতে তাঁহার কপালে টিপ দিব,—আঁবের পাখা লইয়া আয়, রণশ্রান্ত স্বামীকে আমি নিজ হাতে বাতাস করিব, সুগন্ধি আতর দিয়া সরবৎ প্রস্তুত কর, আমি নিজ হাতে তাঁহাকে পান করিতে দিব'—সেই স্বামি প্রেমের এই প্রতিদান, এই পরিণাম! কি আশ্চর্য্য সখিনার প্রেম! কৃষক-পত্নীর বুক-ভরা মধু। যাঁহারা এই চিত্রগুলি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের কাছে আমার এ সমালোচনার মূল্য কি? সাপুড়ে মনিবের প্রেম, কফিন-চোরার অনুশোচনা, কাজীর অত্যাচার, জাহাঙ্গীর দেওয়ানের ধলাই বিলের পদ্মবনের মাঝিদের হাতে মার খাওয়া, ধোপার পাটের কাঞ্চনের অত্যাশ্চর্য্য ত্যাগ, অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকার একগাছি মাল্যের ন্যায় লীলার প্রেম, গর্গের ব্রাহ্মণ্য তেজ, কেনারাম দস্যুর জীবনে আশ্চর্য্য বিপ্লব, সোনাইয়ের করুণ মৃত্যু-কাহিনী, কাজল-রেখার সহিষ্ণুতা, বীণার সুরে প্রণয়িনীর নামকীর্ত্তন প্রভৃতি কত কাহিনীর উল্লেখ করিব! এই রত্নভাণ্ডারে কত কৌস্তুভ, কত কহিনুর—তাহা কি বলিব! কমলরাণী শুষ্কোদ্ধারের জন্য পুষ্করিণীর জলে প্রাণ উৎসর্গ করিতেছেন, তাঁহার পাগল স্বামী শেষ রাত্রিতে তাঁহার পট্টাম্বরের অঞ্চল ধরিয়া দাড়াইয়া আছেন, এই দৃশ্যের প্রত্যেকটি হৃদয়ে চিরতরে মুদ্রিত থাকিবে! যে দিন প্রথম কুন্দনন্দিনীর কথা পড়িয়াছিলাম, যে দিন প্রথমে রজনী,

সূর্য্যমুখী কপালকুণ্ডলা প্রভৃতির অমর চরিত্র দেখিয়াছিলাম, যে দিন সর্ব্ব-প্রথম কবিবরের নিজের মুখে "নৌকাডুবি" ও "চোখের বালির" আবৃত্তি শুনিয়াছিলাম, যে দিন আমাদের সাহিত্যিক-গগনের পূর্ণচন্দ্র শরৎচন্দ্রের "রামের সুমতি" পড়িয়াছিলাম ও অবনীন্দ্রনাথের কবিত্বময়, পাড়াগাঁয়ের ছন্দে লীলায়িত "রাজপুত-কাহিনী" "ক্ষীরের পুতুল" প্রভৃতি সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় গল্প পড়িয়াছিলাম—সেই সকল স্মরণীয় দিনের কথা আমার মনে থাকিবে। এই পল্লী-গীতিকাগুলির সম্মোহিনী শক্তি আমার পক্ষে ততোধিক হইয়াছে, যেহেতু, ইহাদের প্রত্যেকটি খাঁটি বাঙ্গালার জিনিষ। আমি এই গানগুলির প্রশংসা ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে করিয়াছিলাম। কিন্তু বিদেশী পণ্ডিতরা যখন অকুণ্ঠিতভাবে আমার প্রশংসাবাদের সায় দিয়াছেন, তখন আমি বুঝিয়াছি আমার রসাস্বাদনে কোন ভুল হয় নাই। লর্ড রোণাল্ডসেকে আমি লিখিয়াছিলাম 'পল্লী-গীতিকাগুলি যদি আপনার ভাল লাগে, তবে একটি ছত্রে আপনার মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলে সুখী হইব।' তিনি লিখিলেন "এগুলি আমার এত ভাল ও চমৎকার লাগিয়াছে যে, আমি ইহাদের জন্য একটি নাতিক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিয়া দিতে সাহসী হইলাম।" ফ্রান্সের বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক রোমান রেঁালা লিখিলেন, "যে দেশের কৃষক সখিনার মত চরিত্র অঙ্কিত করিতে পারে, তাহাদের গুণগরিমার পক্ষে কোন প্রশংসাই অতিরিক্ত হইবে না। এমন সাহিত্যিক শিল্পের পরিচয় আমি অন্য কোন দেশের গ্রাম্য-সাহিত্যে পাই নাই।" সিলভান লেভি লিখিলেন, "এই কৃষকদের সাহিত্য-রসে আমি ডুবিয়া আছি—ইঁহাদের প্রসাদে আমি ফরাসী দেশের শীতল আবহাওয়ায় বাস করিয়া আপনাদের নির্ম্মল রৌদ্রোজ্জ্বল, শ্যামল দেশ এবং প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে দাম্পত্য-জীবনের কবিত্বপূর্ণ লীলার মাধুরী অনুভব করিতেছি ও বাঙ্গালা দেশ আমার চোখে

নবশ্রী ধারণ করিয়াছে।" রদনষ্টাইন লিখিলেন "এই পল্লীগানের রমণী-চরিত্রগুলি অজান্তাগুহার চিত্রাবলীর সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাইতে পারে।" গুড্‌লে লিখিলেন—"আপনার ভূমিকার প্রশংসাবাদ পড়িয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, স্বদেশ-প্রেমের ঝোঁকে আপনি কতকটা বাড়াবাড়ি করিয়াছেন; কিন্তু গীতি কথাটা পড়িয়া আমি বুঝিয়াছি, আপনার কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।" ডিরেক্টর ওটেন ইংলিশম্যানে লিখিলেন—" কলের ধোঁয়া ও গাড়ীর নিরন্তর বিকট ঘর্ঘরের জ্বালায় অস্থির হইয়া পরিশ্রান্ত পর্য্যটক যদি পাথার অবাধ হাওয়া ও বিশাল দৃশ্য উপভোগ করে, তবে সে যেরূপ আনন্দ পায়, বর্ত্তমান কালের কৃত্রিম সাহিত্যপাঠের পর এই পল্লী-সাহিত্যে পৌঁছিলে পাঠকের মনে সেই ভাব আসিবে।" আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ষ্টেলা ক্রোমরিস্‌ কোন একটি গীতিকা সম্বন্ধে লিখিলেন, "সমস্ত ভারতীয়-সাহিত্যে ইহার জোড়া নাই।" ইহা ছাড়া গ্রীয়ারসন, ব্লক, স্ক্রাইন প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্বের পণ্ডিতদিগের অজস্র প্রশংসোক্তির কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গটি বাড়াইবার এখানে অবকাশ নাই। আমি মজুরের মত এই ভাণ্ডার বহিয়া আনিয়াছি মাত্র—তাহারও যশের ভাগী অনেকটা চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি সংগ্রাহকগণ। ইহাতে আমার বিশেষ কৃতিত্ব কিছুই নাই। উদ্ধৃত প্রশংসাবাদ আত্মস্তুতির বাহানা মাত্র, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। য়ুরোপীয়দের কথার একটা দাম আছে—তাহা এক কালে এত ছিল যে, তাঁহারা যদি আমাদের দেশের একটি মোহর হাতে লইয়া বলিতেন, এটা কাণা কড়ি, আমরা তাহাই প্রতিবাদ না করিয়া মানিয়া লইতাম, আর তাঁহারা যদি কাণা কড়িটাকে মোহর বলিতেন, তবে আমরা শামুকের মধ্যে রত্ন আবিষ্কার করিয়া বসিতাম! এখনও সেই যুগের অবসান হয় নাই, এজন্য তাঁহাদের মতামত উল্লেখ করিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই

বিরাট্ পল্লী-সাহিত্যের সঙ্গে এ দেশের বহু-সংখ্যক শিক্ষিত লোকের আদৌ পরিচয় হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তকগুলির দাম অত্যধিক করিয়া ইহাদিগকে সাধারণের একরূপ অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা আজকাল সকলেই স্বদেশ-প্রেমিক সাজিয়াছি। খুব সস্তা দরে যে আমরা এ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছি, তাহাও বলা চলে না। কারণ, স্বদেশীদের প্রতি পাদক্ষেপের উপর পাহারা-ওয়ালার সতর্ক দৃষ্টি আছে, ইহাতে তাহাদের গৃহ-সুখ ও জীবন-যাত্রা যে শুধু কণ্টকিত হইতেছে, তাহা নহে, তাহাদের ভাগ্যে দীর্ঘ কারাবাস, এমন কি; মৃত্যুদণ্ডও অনেকবার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের পথটা যে অনেক সময় ঠিক পথ, তাহা আমি স্বীকার করি না। অনেক সময় তাঁহারা ভুল করিয়া দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া আনিতেছেন। আমাদের স্বদেশটা কোথায়? হয় ত প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বদেশকে তুচ্ছ করিয়া টেমস বা সীন-নদীর ধারে অবস্থিত নগরগুলিকে প্রকৃত আদর্শ কেন্দ্র মনে করিতেছি। আমাদের নিবৃত্তির রাজ্য স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় অলীক মনে করিয়া মোহান্ধ হইয়া জড়বাদীদের সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইতেছি। নেপোলি-য়ানকে দেখিয়া নেংটা সন্ন্যাসীকে অপদার্থ মনে করিতেছি, তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দের আসনে ডি ভেলোরাকে বসাইতেছি। আমি শেষোক্ত ব্যক্তিকে অশ্রদ্ধা করিয়া এ কথা বলিতেছি না—যুগের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের পূজনীয়দিগের প্রতি আমরা অশ্রদ্ধ হইতেছি—ইহাই আমার বলিবার উদ্দেশ্য। "কাঠুরে এক মাণিক পেল, পাথর ব'লে ফেলে দিল— অভিমানে কাঁদছে মাণিক মহাজনে টের পেল না।"

আমাদের স্বদেশ, কোথায়, তাহার কি খোঁজ আমরা লইতেছি? সাচের নামক ফরিদপুর জেলায় একটা স্থান আছে, তথায় পাটী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এখনও ৫ শত টাকা মূল্যের এক একখানি পাটী তথায় পাওয়া যাইতে পারে। সেই পল্লীটির নাম স্বদেশ-প্রেমিকদের কয়জন জানেন? আমরা কি নেস্‌লসের চকোলেট ছাড়িয়া জনাইএর মনোহরা বা কৃষ্ণনগরের সর ভাজার খোঁজ করিয়া থাকি—সেই চকোলেট যতখানি চারি আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে, তাহার দশগুণ পরিমাণে কদমা বা টানা গুড় ঐ মূল্যে পাওয়া যাইবে—অথচ চকোলেটের সঙ্গে তাহাদের স্বাদের পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। আমাদের স্বদেশের সেই আনন্দবাজার—যেখানে মহিলারা কতশত প্রকারের ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের শতমুখে উৎসারিত হৃদয়ের প্রেমের সন্ধান দিতেন, সেই সকল সুখাদ্য এক্ষণে কোথায় গিয়াছে? চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, যদুনাথের কৃষ্ণলীলামৃত কাব্য, লরেখার পালাগান প্রভৃতি বিবিধ পুস্তকে সেই উপাদেয় সামগ্রীগুলি প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন পান্থাবাস বা রেষ্টুরাঁতে কোন বাঙ্গালী সেইগুলি কেমন হয়, তাহা প্রস্তুত করিয়া পরখ করিয়া দেখিয়াছেন কি? এই গ্রীষ্মকালে বাঙ্গালার হোটেলগুলি দেখুন, তাহাতে একটা নেংড়া আম, ফজলী কি বোম্বাই পাইবেন না, একখানি সন্দেশ পাইবেন না। কারণ, বিলাতে যাহা জন্মায় না, তাহা বাঙ্গালা দেশের হোটেলে কেন থাকিবে? অনুকৃতি বা রুচি-বিকৃতি আর কাহাকে বলে? পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়াছি। কারি, কাটলেট ও ডেভিলের গন্ধে মাতুয়ারা হইয়া আছি। রান্নাঘরে এখন গৃহিণীর প্রবেশ-নিষেধ, নারী-মর্য্যাদার পাঠ তাঁহাকে শিখাইয়া পোষাকী করিয়া তুলিতেছি। পূর্ব্বে গৃহটি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধিকারে ছিল—প্রকৃতপক্ষে এখন

কোন স্থানে তাঁহার অধিকার নাই, সারাদিন যিনি আলস্যে কাটাইবেন, তাঁহার আত্মমর্য্যাদা কিছুতেই থাকিবে না। প্রকৃত-পক্ষে তিনি পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতা করিবার কোন স্থানেই সুবিধা পাইতেছেন না—তালাকনামা পাইবার অধিকারটা হইলেই বোধ হয় তাঁহাদের জীবনের সফলতা হয়। যেখানে বাগান শত শত বেলা যুঁই, স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ, বকুল, রজনীগন্ধা, মালতী ও কুন্দে ভরপুর ছিল—এখন সেখানে কচুগাছের মত কতকগুলি চারা টবের মধ্যে পুরিয়া ল্যাটিন নামে তাহাদের পরিচয় দিয়া রুচির উৎকর্ষের পরিচয় দিতেছি। সহরে খাওয়া-দাওয়া একটা বিড়ম্বনায় দাঁড়াইয়াছে। রান্নাঘরে লবণাম্বুতীরবাসী উৎকল ব্রাহ্মণ লবণের শ্রাদ্ধ করিয়া ব্যঞ্জন তৈয়ারী করিতেছে, সেই বিস্বাদ খাদ্য দ্বারা আমরা কথঞ্চিৎ জীবনরক্ষা করিতেছি এবং মাঝে মাঝে লোলুপনেত্রে বাবুর্চ্চির রান্নার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি। কোথায় কে কবে হাতীর দাঁতের শিল্পের উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল, কে কবে কৃষ্ণনগরের পুতুলকে এরূপ সুন্দর করিয়া গড়িবার প্রেরণা দিয়াছিল,—সেই সকল শিল্পীর মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কাহারা, কাহারা বিশ্ব-বিশ্রুত মসলিন তৈয়ারী করিয়াছিলেন, বঙ্গের দক্ষিণ বিভাগে কাহারা জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া নৌবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ধীমান্ ও বীতপালের মত কত ভাস্কর জন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া বঙ্গশিল্পরাজ্যের বিস্তৃতিসাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোন খোঁজখবর কি আমরা রাখি? এ দেশে এখনও কত অপরিজ্ঞাত শিল্পী অপূর্ব্ব প্রতিভা লইয়া কোন নিভৃত পল্লী-নিকেতনে দারিদ্র্যের কশাঘাতে ও উৎসাহের অভাবে অশ্রুপাত করিয়া বিফলে জীবন কাটাইয়া দিতেছেন, তাঁহাদের খবর কি আমরা রাখি? বাঙ্গালা দেশে এখনও অন্যূন অর্দ্ধশত ধর্ম্ম-গুরু আছেন, হয়ত তাঁহাদের কেহ কেহ অল্প দিন হইল স্বর্গারোহণ

করিয়াছেন। যদিও কোন কোন স্থানে অনেকটা বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত, তথাপি তাঁহাদের মত প্রাচীন উপনিষৎ, বৌদ্ধধর্ম্ম ও তান্ত্রিকতার ধারা কে বজায় রাখিয়াছে? সম্প্রতি পাগলা কানাই, হরনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জনের তিরোধান হইয়াছে,—ইঁহাদের কাহারও কাহারও শিষ্যসংখ্যা পঞ্চাশ সহস্র, তাঁহাদের মধ্যে ধনবান্, বিদ্বান্ ও গণ্যমান্য লোকের অভাব নাই—ইঁহাদের কাহারও কাহারও শিষ্য সমস্ত ভারতবর্ষময়। আমরা পাড়াগেঁয়ে বলিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু সহস্র সহস্র লোক একত্র হইয়া যাহা করিতেছে তাহা কি—এ কথাটা জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল পর্য্যন্ত হয় নাই—স্বদেশের প্রতি আমাদের এমনই অনুরাগ!

এ দেশে কতকগুলি মেলা আছে। কি উপলক্ষে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কোন্ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে তাহাদের আবির্ভাব ও উন্নতি হইয়াছিল—তাহা জানিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। দেশীয় শিল্প এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে পূর্ব্বে উন্নতি লাভ করিত। এখন জার্ম্মাণী ও জাপান আমাদিকে সস্তা দরের খেলনা দিয়া ভুলাইয়া ধীরে ধীরে সেই মেলাগুলি গ্রাস করিতেছে। বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৌরব—কীর্ত্তন। সে দিনও গৌরদাসের মত কীর্ত্তনীয়া জীবিত ছিলেন, তাঁহার গান শুনিয়া পাখী চুপ করিয়া ডালে বসিত এবং তৃণাঙ্কুর রোমন্থ করিতে করিতে গাভী করুণনেত্রে অশ্রুপাত করিত, তাঁহার নাম এবং দুই এক জন কীর্ত্তনীয়া যাঁহারা এখনও বঙ্গদেশের কীর্ত্তনকে জীবিত রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি আমরা জানি? যে কথকতা দ্বারা বাঙ্গালী এক সময়ে জনসাধারণের চিত্ত-বিজয় করিয়াছিল, যাহাদের গান ও আবৃত্তিতে উপনিষদের তত্ত্ব ও ভাগবত যেন জীবন্ত হইয়া কুটীরবাসী-

দের নিকট ধরা দিত, তাঁহাদের উৎসাহ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা কি আমরা করিতেছি ? সে দিনও কৃষ্ণ কথক ও ক্ষেত্র চূড়ামণি জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রতিভা সম্বন্ধে কোন পত্রিকায় কি একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে ? অন্য কি কথা, বঙ্গদেশের কিরীট-রত্ন চৈতন্য-ধর্ম্ম কি করিয়া প্রসার লাভ করিয়াছিল, কি করিয়া তাহা মধ্যভারতে ছত্রপুর ও রাজপুতনায় জয়পুর এবং উড়িষ্যায় ধানকেনাল, ময়ুরভঞ্জ, পূর্ব্বদেশে ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রচারিত হইয়া তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছিল,—কান্দাহারে ও নাকি চৈতন্য-ধর্ম্মাবলম্বী এক সম্প্রদায় আছেন এবং দাক্ষিণাত্যেও মহাপ্রভুর প্রভাব কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে এখনও বিস্তৃত রহিয়াছে—এই গৌড়ীর বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিপুল বিস্তৃতি সম্বন্ধে একখানি ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। আমরা বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাসা, শচীমায়ের শোকগাথা ও নিমাই-সন্ন্যাস গাহিয়া গাহিয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের জ্ঞান ও চর্চ্চা শেষ করিয়া ফেলিতেছি। ভক্তগণ প্রতি বৎসর ধূলটে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু সেই ইতিহাস রক্ষাব কোন চেষ্টা হইতেছে না। মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের হাতের লেখা সংস্কৃত মহাভারতের নকলখানি অনেকেই দেখিয়াছেন, হয় ত আর কয়েক বৎসর পরে তাহা বিলুপ্ত হইবে। আমাদের দেশের বালকরা, যাঁহারা কিং লুই এবং প্রথম চার্লসের হত্যার কথা বিশেষভাবে অবগত আছেন, তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম জগতের কোন্ কোন্ স্থানে—এমন কি ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালীরা কোথায় সেই সকল আশ্রমে কি ভাবে নেতৃত্ব করিতেছেন, তাহার খবর রাখেন না। বাঙ্গালার পল্লীতে শত শত বাঙ্গালা পুথি—যাহাতে এ দেশের ভূগোল, ইতিহাস, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে—যাহা না পাইলে আমরা কখনও এ দেশের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

ইতিহাস লিখিতে পারিব না—প্রতি বৎসর কীটদষ্ট হইয়া তাহারা বিলুপ্ত হইবার পথে চলিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই ?

এই বাঙ্গালাদেশের কত স্থানে কে কত বিরাট্ দীঘি ভগ্ন-রাজ প্রাসাদ, স্তূপ ও মন্দিরাদি আছে, কত প্রবাদ ও গীতিকথা আছে; চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে—বাঙ্গালী বিজয়ী সৈন্যের নৌ-যানের অভিযান-কাহিনী গীতিকবিতায় লিপিবদ্ধ আছে, বাঙ্গালীরা সফর করিতে বঙ্গোপসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপ ও উপদ্বীপে যাইতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গীতিকা আছে—এমন কি তাঁহারা যে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত যাইতেন এবং পর্ত্তুগীজ-দস্যু যাঁহাদিগকে দেশীয় ভাষায় হার্ম্মাদ বলিত, তাহাদের সঙ্গে সেই দ্বীপবাসীদের সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইত, সে কথাও লিপিবদ্ধ আছে। এই বিপুল উপকরণ কালে বিলয় প্রাপ্ত হইবে. আমরা পশ্চিমমুখী দৃষ্টি কবে পূর্ব্বমুখে ফিরাইয়া আনিব ? এখন আমাদের একটা কূপ খনন করিবার শক্তি নাই, মহীপাল দীঘি, রামপালের দীঘি, রাজদীঘি, ধর্ম্মসাগর প্রভৃতি হ্রদোপম বিপুলায়তন দীর্ঘিকা খনন করিয়া যাঁহারা রাজধানীর পত্তন করিয়াছিলেন, সেই সকল মহামনা নৃপতির কীর্ত্তি-কাহিনী উদ্ধার করিবার কি কোন প্রয়োজন নাই ? বাঙ্গালা দেশটা কি ছিল, তাহা জানিতে চাহিলে এমন একখানা ইতিহাস বা বিবরণী নাই, যাহা আমাদিগকে এ দেশের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করিবে। এখন কি সময় হয় নাই—যখন তরুণের দল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বঙ্গদেশের সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবার জন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ক্যামেরা লইয়া পর্য্যটন করিবেন ? বঙ্গের বহু মূল্যবান্ উপকরণ বৎসর বৎসর নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বড়ই ক্ষোভের বিষয়, আমরা স্বদেশসম্বন্ধে এত গান বাঁধিয়াও এ দেশের খোঁজ-খবর লইতে একেবারে পরাঙ্মুখ

হইয়া আছি। আজ এক দল তরুণ চাই—যাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গমন করিয়া জানিবেন, আমাদের কোন শিল্প এখনও কি উপায়ে রক্ষা করা যাইতে পারে; যাঁহারা প্রতিভাবান্ শিল্পীদের উৎসাহ দিয়া তাঁহাদের নাম দিবালোকে আনয়ন করিবেন; যাঁহারা পল্লীগুলির প্রাচীন ইতিহাস রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন। কত ভগ্নস্তূপে ও আবর্জ্জনাপূর্ণ দীর্ঘিকার অন্তরালে লুকাইয়া আমাদের রাজলক্ষ্মী অভিশপ্তা হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন, তাঁহার অঞ্চলে এখনও অনেক মহার্ঘ রত্ন রক্ষিত আছে, পূজারী ভক্তিপূর্ব্বক চাহিলে তিনি তাঁহার প্রতি বিমুখ হইবেন না। মহাপ্রভুর পর প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বৎসর অতীত হইলে রাজা রামমোহনের অভ্যুদয় হয়। তিনি বৈষ্ণব আদর্শ ও বৈষ্ণব-সাহিত্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন, যেমন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন চৈতন্যদেব পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে। বঙ্গের অপূর্ব্ব কীর্ত্তন ও পদাবলী এক যুগের জন্য হৃতমান হইয়া পল্লীর নিভৃত নিকেতনে আশ্রয় লইল। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা অবিরত বংশীধারীর নিন্দা করিতে লাগিয়া গেলেন। রামমোহনের সম্মুখে নূতন যুগ, নূতন সাধনা ও নূতন ভাবপ্রণালী। সেই নূতন চিন্তা ও ভাবের তাড়নায় আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন সর্ব্বসমন্বয়ের যুগ আসিয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে কিছুই পরিত্যাজ্য নহে। এখন বুঝিতে হইবে, যাহা আপাততঃ মূল্যহীন বলিয়া প্রতীত হইতেছে, প্রকৃত জহুরী আসিলে তাহার অভাবনীয় মূল্য আবিষ্কার করিয়া তিনি হয় ত আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিবেন। এখন সংগ্রহের দিন, কুড়াইয়া রাখিবার দিন। এখন কালের ধ্বংসলীলা হইতে প্রাচীন সংস্কার ও প্রাচীন কথা রক্ষা করার দিন। এখনকার মন্দিরে হয় ত পূর্ব্ব-যুগের আগ্রহ ও উদ্যম-সহকারে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিবে না। কিন্তু তাহা না হইলেও মন্দিরের শিল্প,

মন্দিরের উপকরণ, এমন কি, পূজার নৈবেদ্যটি পর্য্যন্ত আমাদের প্রণিধানযোগ্য। বঙ্গীয় চিন্তার ক্রমোন্নতিশীল, বর্দ্ধিষ্ণু ধাবার আদি ও বিকাশ আমাদের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট করিতে হইবে। সমগ্র-ভাবে আমাদের সাহিত্য ও সমাজের আলোচনা করিতে হইবে। ধরুন, বাঙ্গালার রামায়ণগুলি—ইহাদের কোনটিই বাল্মীকি হইতে অনুদিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে কত উপাখ্যান ও প্রবাদ আছে, যাহাদের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, এমন কি, জগতের দূর-দূরান্তর স্থানেরও প্রচলিত আখ্যানের একটা যোগ আছে। কোন কোন উপাখ্যান আবার বাল্মীকির পূর্ব্বযুগের। এ কথা হয় ত অনেকেই জানেন যে, বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতে দেশ প্রচলিত বহু উপাখ্যান আছে—যাহা মূলে নাই। চন্দ্রাবতী ষোড়শ শতাব্দীর কবি, তিনি কৈকয়ী-কন্যা কুকুয়ার কথা তাঁহার রামায়ণে লিখিয়াছেন। গ্রীয়ারসন বলিতেছেন, কাশ্মীরী রামায়ণে কৈকয়ীর এই দুহিতার কথা আছে। সীতার জন্ম সম্বন্ধে বঙ্গীয় বিভিন্ন রামায়ণে যে সকল কাহিনী পাওয়া যায়, জনৈক জার্ম্মাণ পণ্ডিত আমাকে জানাইয়াছেন, জাবা দ্বীপের কবি-ভাষায় প্রচলিত রামায়ণে সেই সকল কাহিনীর অনেক কথা আছে। ইহা ছাড়া বৌদ্ধজাতক ও প্রাচীন জৈন-রামায়ণের অনেক কথা আমরা বাঙ্গালা রামায়ণগুলিতে পাই—বৃদ্ধ বাল্মীকির সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কবিচন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীতে যে রামায়ণ লিখিয়াছেন—তাহাতে তরণীসেন বীরবাহু ও অতিকায়ের ভক্তির কথায় লঙ্কাকাণ্ড প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে, রণ-প্রাঙ্গণ সঙ্কীর্ত্তন-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পরবর্ত্তী পুথি-লেখকরা কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে উহা জুড়িয়া দিয়াছেন—চৈতন্য ও নিত্যানন্দের ছায়া এই কবিচন্দ্রী রামায়ণে অতি স্পষ্টভাবে রাম-লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছে। রঘুনন্দনের রাম-রসায়নে রাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ পরম রমণীয়ভাবে রাম-সীতার দাম্পত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া

বইখানি যেন ফুল-পল্লবে সুশোভিত করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির স্তূপে যে অর্দ্ধ-শত ভিন্ন ভিন্ন লেখক-বিরচিত রামায়ণ কুড়াইয়া পাইয়াছি, তাহা বাঙ্গালা সমাজের এক এক সময়ের ইতিহাসের এক একখানি পৃষ্ঠা আঁকিয়া দেখাইতেছে। কে বলে, সেগুলি ত্রেতা যুগের কথা? কে বলে, বাল্মীকির লেখার অনুকৃতি বা উত্তর-কোশলের কথা? সেই রামায়ণগুলিতে বাঙ্গালা দেশেরই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের স্বর্ণলঙ্কা গৌড়ের রাজপ্রাসাদ, তাহাদের পঞ্চবটী বঙ্গের নীপকুঞ্জ, তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্র নবদ্বীপের সঙ্কীর্ত্তনভূমি। কেবল তাহাই নহে, এই সকল বাঙ্গালা পুস্তকে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে অনেক য়ুরোপীয় আখ্যানের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। গ্যালিক উপাখ্যানের ব্যালর বাঙ্গালা রামায়ণের ভস্মলোচন। বৃদ্ধ বাল্মীকি এমন চরিত্র স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। মহীরাবণের কথা ও ধর্ম্ম-মঙ্গলের ইদাঁচোরের যাদু-বিদ্যা, ড্রুইড পুরোহিতদের মন্ত্রশক্তির অনুরূপ। এই সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে, কোন সন্দেহ নাই যে, দূর প্রাচ্যদেশের সঙ্গে প্রতীচ্যের এক সময় ভাবের আদান প্রদান হইয়াছিল। ময়নামতীর গানে বৃদ্ধা রাণীর রূপ-পরিবর্ত্তন কখনও শ্যেনরূপে, কখনও পানকৌড়ী বা কপোতে পরিণতি গ্যালিক উপাখ্যানগুলির সঙ্গে আশ্চর্য্যভাবে মিলিয়া যায়।

এতগুলি সুবৃহৎ মনসা-মঙ্গল আমরা পাইয়াছি—যদিও মূল বিষয়টি একরূপ, তথাপি তাহাদের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র পুস্তক। ষোড়শ শতাব্দীর বংশীদাস যখন ময়মনসিংহে বসিয়া তদীয় পদ্মপুরাণ রচনা করেন, তখনও সমুদ্রযাত্রা তদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত হয় নাই। তৎকৃত মনসা-মঙ্গলে জাহাজ নির্ম্মাণের বিস্তারিত বিবরণ ও বাণিজ্যাদির কথা বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিজয়গুপ্তের

সময় হিন্দু ও মুসলমানের প্রথম সংঘর্ষ। এই দুই শ্রেণীর বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক কলহ তাঁহার কাব্যের অনেকটা যায়গা জুড়িয়া আছে। জয়নারায়ণের হরিলীলায় মুসলমান রাজত্বকালে ডিটেক্‌টিভ পুলিস কি ভাবে কার্য্য করিত, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণের প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় দেশের মানচিত্র আঁকিয়া সদাগরদিগের বাণিজ্যের অভিযানের মধ্যে তৎসময়ের বঙ্গদেশের ভৌগোলিক তত্ত্বের আভাস দিতেছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি নানা উদ্ভটকল্পনার-লীলাভূমি হইলেও তাহাতে হিন্দু রাজত্বের অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ দিয়া যাইতেছে। এখনও লাউসেনের ময়নাগড ও ইছাই ঘোষের শ্যামরূপা দেবীর মন্দির বিদ্যমান। বার-ভূঞারা সম্রাটের সভায় কি কি কায করিতেন, মাণিক গাঙ্গুলী তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীকদিগের ডডনপ্লাস ও হিন্দুর দ্বাদশমণ্ডল আর্য্য-সভ্যতার আদিযুগের এই ব্যাপক প্রথার পরিচায়ক। বাঙ্গালার বারভূঞা আকবরের সময়ের সৃষ্টি নহে। এখনও ত্রিপুরা ও রাজ-পুতানার কোন কোন স্থানে এই বহু প্রাচীন প্রথার শেষ চিহ্ন বিদ্যমান। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে হিন্দু-সৈনিকের বেশভূষা ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে নানা বিবরণ আছে। ডোম ও নমঃশূদ্র সেনারাই হিন্দু-রাজাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। তাহারা সাধারণতঃ রায়বাঁশ লইয়া যুদ্ধে যাইত। এই রায়বাঁশই বাঙ্গালার ইতিহাস-বিশ্রুত লাঠী, বর্ত্তমান কালের রেগুলেশন লাঠী ভয় দেখাইবার একটা মুখোস মাত্র। রায়বাঁশে বন্দুকের গুলী ফিরাইয়া দিত। নিম্নশ্রেণীর সৈন্যসংখ্যাই বেশী ছিল। কিন্তু বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণও পদাতিক সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইতেন। সেই শার্দ্দূল-বিক্রান্ত যোদ্ধাদের বিবরণ পড়িলে বাঙ্গালীর বীর্য্যবত্তার কথা স্বতই মনে হয়। দুই ছত্রে এক একটি চিত্র, কিন্তু তাহা পাষাণের লেখা—

" সেনার প্রধান চলে সীতারাম ভূঞে।
যার ভরে প্রমত্ত কুঞ্জর পড়ে মুঞে॥

প্রমত্ত কুঞ্জর যার ভরে মুঞে পড়িত, সেইরূপ বীরদের বংশধররা এখন কোথায়? গৌরদ্বারের রাজা চাঁদ রায় মুসলমান সম্রাটের বিশাল হস্তীর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাহার শুণ্ড ধরিয়া এমনই ঘুরপাক খাওয়াইয়াছিলেন যে, মাহুতের পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশ-আঘাত সত্ত্বেও সে এক পাও অগ্রসর হইতে পারে নাই। নরোত্তম-বিলাসে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আছে। সেই সকল বীরের বংশ এখন বঙ্গদেশে কোথায়?

এ দেশের নানাদিক্ দিয়া আমাদের জানিবার বিষয় আছে। আমরা কি হইব, জানিবার পূর্ব্বে কি ছিলাম, তাহা জানা দরকার। সুখের বিষয়, আমরা অনেকটা কিছুই ছিলাম, দুঃখের বিষয় এই যে, সে অনেক কিছুর কণিকা জ্ঞানও আমাদের নাই। প্রকৃত স্বদেশী হইবার চেষ্টা তখনই সফল হইবে, যখন স্বদেশের সমস্ত পরিচয় আমরা জানিব। যখন স্বদেশের প্রাণ কোথায়, তাহা আবিষ্কার করিতে পারিব এবং প্রকৃত অনুরাগ আমাদের নয়নে এমন অঞ্জন পরাইবে—যাহাতে এ দেশের ধূলি-মাটীরও একটা যথার্থ মূল্য আমরা বুঝিতে পারিব। যখন আমাদের দেশে যাহা নাই, এবং বিদেশের যাহা আছে—মিছামিছি সেই মিথ্যা ভূষণ আমাদের দেশকে পরাইয়া ডাকের সাজ দিয়া মাতৃমূর্ত্তি বাহির করিব না; যাহা আমাদের আছে বিদেশের যাহা নাই,—তাহার দর কষিয়া বিদেশীরা আদর না করিলেও আমরা আমাদের ঠাকুরকে মাথা হইতে নামাইয়া ফেলিব না; যখন দেবদারু জন্মিল না বলিয়া গোলাপের মাতৃ-ভূমি বসোরা বিলাপ করিবে না, কিংবা দেবদারুর

শিরস্ত্রাণ পরিয়া হিমাদ্রি জবাপুষ্পের অভাব-জনিত শোকে অধীর হইবে না। আমাদের যাহা ছিল তাহার বিস্তর পরিচয় আছে। হরিভক্ত যেরূপ লুটের বাতাসার জন্য আঙ্গিনার কানাচ হাতড়াইয়া দেখে, আমরাও আজ এই দেশের গৌরবের স্বর্ণরেণু কোন্ নিভৃত পল্লীতে কোন্ দীঘির জলে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—তাহাদের জন্য তেমনই আগ্রহে প্রাণান্ত চেষ্টায় খুঁজিব।

যে জাতির পৈতৃক ভাণ্ডারের কোহিনূর ভাগাড়ে পড়িয়া আছে, কেহ দেখে না, সে জাতির চক্ষু ফুটাইবার উপায় কি? যে জাতি দ্রবময়ী গঙ্গাকে কঠিন করিয়া পতিতের স্পর্শ হইতে দূরে নামাবলীর মোড়কে পূরিয়া শিবের জটায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—সে জাতির পবিত্রতা কিসে হইবে। যাঁহাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই মৃত শব-চতুষ্টয়কে রক্ষা করিবার জন্য নানা সমস্যা লইয়া পক্ষিরূপী যে ধর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিলেন, পঞ্চানন ষড়াননের দল তাহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার উদ্যম করিয়াছে, সে জাতিকে ধ্বংস হইতে কে উদ্ধার করিবে? যাহাদের নিরপরাধ কোন তথাকথিত হীন বর্ণের লোকের মুমূর্ষু শয্যা যদি কোন উচ্চ বর্ণের লোক স্পর্শকরে, তবে তাহার আত্মীয়স্বজন গোবর-জলের কলসী লইয়া তাহার বাড়ীর দরজা আগুলিয়া রাখে—এমন নিষ্ঠুর জাতি ভগবানের দয়া পাইবে কিরূপে?

তরুণদলের নিকট আমার এই নিবেদন, আপনারাই আমাদের আশা ও ভবিষ্যৎ। বাঙ্গালী জাতি জগতে টিকিয়া থাকিবে কি না, যে দারুণ সংঘর্ষ আসিতেছে, তাহাতে আমরা জয়ী হইব কি না—সে সমস্যার সমাধান আপনাদেরই করিতে হইবে। আমরা বৃদ্ধ, আমরা যতই হুমকী দেখাই না কেন, পুত্ররূপে, কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে,

জামাতারূপে আপনারাই আমাদের উত্তরাধিকারী ও গৃহের প্রকৃত স্বামী। আমরা ভ্রূকুটি কুটিল মুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু আপনারা পরিণামে যে পথে যাইবেন, আমাদেরও সেই পন্থার অনুসরণ করিতে হইবে। আপনাদের দুর্জ্জয় শক্তি স্বীকার করা ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই। আমরা যদি অত্যাচারী, অমিতব্যয়ী, কুসংস্কারশীল, স্বার্থান্ধ ও সমাজদ্রোহী হই, আপনারা বয়কট করিলেই আমরা সোজা হইব। বণিক্‌রাজ ধনপতি সদাগরকে যখন তাঁহার সমাজ বয়কট করিতে চাহিয়াছিল, তখন তিনি সম্রাটের সহায়তার দর্প করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞাতিরা উত্তরে বলিয়াছিল—

"জ্ঞাতি যদি অভিরোষে গরুড়র পাখা খসে
জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল।"

সমাজের চাপ এমনই বেশী, ফলে ধনপতিকে গলবস্ত্র হইয়া জ্ঞাতিদের মনস্তুষ্টি করিতে হইয়াছিল। সে দিন পর্য্যন্তও বঙ্গদেশে সমাজনিগ্রহের সেইরূপ আতঙ্ক ছিল। কিন্তু এখন আমাদের সমাজ বিশৃঙ্খল,—কে কাহার কথা শুনে? যদি অন্যায়কারীকে আমরা একঘরে করিতে পারি, তবে কি সাধ্য তাঁহার, অন্যায় কার্য্য করিবেন? তিনি যত বড়ই হউন না কেন, কন্যা-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপার লইয়া তাঁহাকে বারংবার সমাজের দ্বারে আসিতে হইবে। আজ যদি তরুণের দল সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন—তবে তাঁহাদের হস্ত দুর্জ্জয় শক্তি লাভ করিবে! যুদ্ধ আসিতেছে, হে তরুণ যোদ্ধার দল, আপনারা প্রস্তুত হউন। এই যুদ্ধে আপনাদের জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সমাধান হইবে। এই যুদ্ধ গোলাগুলী-অসিভল্লের নহে—সে পাশবিক যুদ্ধের যুগ অতীত হইয়াছে। আপনাদের অস্ত্র হইবে সঙ্ঘশক্তি, সংযম, ধর্ম্মভয় ও সহিষ্ণুতা; আপনাদের

অস্ত্র হইবে—দেশের প্রতি অটল অনুরাগ, ত্যাগ ও প্রীতি; আপনাদের অস্ত্র হইবে—নির্ভীকতা, দুঃখসহনক্ষমতা, শরীরকে তুচ্ছ করিয়া আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা ও অপরাজেয় সাহস। এই সকল অস্ত্র লইয়া সংঘশক্তি অর্জ্জন করুন—পুরাকালে সংঘশক্তি সমাজের ছিল, পাছে জাতি যায়, এই ভয়ে রাজা উজীর সকলেরই হৃৎকম্প হইত। এখনও উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে সমাজের সেই শক্তি আছে। সংঘশক্তি—এই যুগে সাফল্যের একমাত্র মন্ত্র। শত শত লোক—কিন্তু এককণ্ঠ,—শত শত বাহু, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে এক ব্যক্তির ন্যায়। সামরিক রীতির অনুযায়ী দলপতি বা গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি এবং নিজের মত ডুবাইয়া সংঘের বাণী দৈববাণীর মত স্বীকার করিয়া লওয়া—ইহাই এখনকার যুগধর্ম্ম। আপনারা শতধা ভগ্ন হীরকখণ্ডের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছেন, কোন একটি খণ্ডের দীপ্তি দেখিয়া জগৎ হয় ত আপনাদিগকে উচ্চ মূল্য দিতেছে, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত জানিবেন, খণ্ড প্রতিভা আর ভারতকে আলোকিত করিতে পারিবেনা। শতখণ্ড জোড়া না লাগিলে আত্মদ্রোহ ও ভেদবুদ্ধি আপনাদের সর্ব্বনাশ-সাধন করিবে। বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে জ্যোতিষ্মান্ প্রতিভার আলোক চিরকালই এ দেশে বিকীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ঐক্যের সাধনাই এ যুগের সর্ব্বপ্রধান সাধনা। যাঁহারা ঐক্যে পথে আসিবেন না—আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া দূরে থাকিতে চাহিবেন, তাঁহাদিকে ছাঁটিয়া ফেলুন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র ঔষধ

আপনাদের সম্মুখে কর্ম্মতালিকা বিরাট্। সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম দেশের সঙ্গে পরিচয়স্থাপন। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে কুক্ষণে মেকলে বাঙ্গালা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মন্দির হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজী মোহান্ধ দেশীয় শিক্ষিত

সম্প্রদায় তৎকালে মাতৃভাষার এই অপমান শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮০০ অব্দে ওয়েলেস্‌লি কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ দেশীয় ভাষা অনুশীলনের একটা প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এই কলেজ হইতে মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত তাঁহার প্রবোধচন্দ্রিকা, রামরাম বসু প্রতাপাদিত্য-চরিত, রাজীবলোচন কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত এবং কেরী তাঁহার বহু বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত করেন। এমন কি, এই কেন্দ্রে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালা লেখার হাতে খড়ি হয়। অল্পসময়ের মধ্যে প্রধানতঃ কেরীর চেষ্টায় বঙ্গভাষা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রায় দ্বিসহস্র বাঙ্গালা পুস্তক বিরচিত হইয়াছিল। ইতিহাস, সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, স্থপতিবিদ্যা, পাটীগণিত, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, জ্যামিতি, বীজগণিত, রসায়ন, ভূগোল, শরীর-স্থান, মস্তিষ্কতত্ত্ব, চিকিৎসা, ন্যায়দর্শন, স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্র প্রভৃতি এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহাতে তখন বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচিত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বাঙ্গালা বহির অনেকগুলি য়ুরোপীয়রা লিখিয়াছিলেন। তার পর এক শতাব্দীর ঊর্দ্ধ কাল চলিয়া গিয়াছে—সেই প্রাচীন বাঙ্গালা অবশ্য এখন কতকটা উদ্ভট বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় যে সর্ব্ববিষয়ে বই লেখা চলে, একশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী লেখকরা তাহা প্রমাণ করিয়া ছিলেন। দুই তিন বৎসর হইল, যখন বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় কি না এই বিষয়টি গোলদীঘির পণ্ডিতদের বৈঠকে উঠিয়াছিল তখন ঘন ঘন প্রশ্ন হইয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষায় কি ঐ সকল বিষয়ের পুস্তক লিখিত হইতে পারে? মাতৃভাষায় যাঁহাদের একরূপ হাতে খড়ি পড়ে নাই, অথচ ইংরাজীতে যাঁহারা মহাপ্রাজ্ঞ

এইরূপ অনেক পণ্ডিত সেই প্রশ্নের উত্তরে অবিশ্বাসের ভাবে ঘাড় নাড়িয়াছিলেন। এক শত বৎসরের উর্দ্ধকাল হইল, যাহা বাঙ্গালা-ভাষায় অনায়াসসিদ্ধ ছিল—এই শতাধিক বৎসরের পরে এবং এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বজনস্বীকৃত অত্যাশ্চর্য্য, দ্রুত উন্নতির প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের ভাষা সেই কার্য্যের জন্য অনুপযোগী বিবেচিত হইয়াছিল! কিমাশ্চর্য্যং অতঃ পরম্। যদি মেকলের হাতে অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া বাঙ্গালাভাষা উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমা হইতে তাড়িত না হইত, তবে এই ভাষায় যে শত শত মৌলিক পুস্তক বিরচিত হইত—তাহার কি সন্দেহ আছে? তাহা হইতে অনেক অল্পসময়ের মধ্যে জাপানীভাষার এতটা উন্নতি হইয়াছে যে, উহা সর্ব্ববিষয়ে পাশ্চাত্য ভাষাগুলির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট ছিল। প্রত্যেক সিভিলিয়ানকে দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে হইত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাৎসরিক সভায় তাঁহাদের দেশীয়-ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হইত। সেই পরীক্ষার ফলের উপর তাঁহাদের চাকুরীর উন্নতি ও স্থায়ীত্ব নির্ভর করিত। বহু সম্ভ্রান্ত টোলের অধ্যাপক, দেশীয় রাজা, মহারাজা, গণ্যমান্য লেখক ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী একত্র হইয়া সিভিলিয়ানদের বিদ্যার বিচার করিতে বসিয়া যাইতেন। এই মহাসভায় য়ুরোপীয় সিভি-লিয়ানদের কোন গুরুতর দার্শনিক, সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনা করিতে হইত। মোট কথায় দেশীয় ভাষায় তাঁহারা দেশীয় পণ্ডিতগণের মতই বিচক্ষণতার প্রমাণ দিতে না পারিলে তাঁহাদের চাকুরী থাকিত না এবং চাকুরীর উন্নতি হইত না।

মেকলে দেশীয় ভাষাকে বিসর্জ্জন করার পর এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাতে মুষ্টিমেয় ইংরাজ-বিচারকের অজ্ঞতার জন্য শত শত উকিল-মোক্তারকে ইংরাজী শিখিতে হইতেছে—অনুবাদ করিবার জন্য মতরজ্জম ও ইণ্টারপ্রেটারের বহর বসিয়া গিয়াছে। ৮।১০ বৎসর কাল গলদঘর্ম্ম হইয়া ভারতবাসীকে ইংরাজী বলা-কওয়া শিক্ষার জন্য কত যে পরিশ্রম ও অর্থ-ব্যয় করিতে হইতেছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। এ কথা একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব যে, এক আধ জন ইংরাজের সুবিধার জন্য আদালতে ইংরাজীর কাক-কোলাহল চলিতেছে। সরকার বাহাদুর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও পরোক্ষভাবে অজস্র টাকার শ্রাদ্ধের উপলক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোটি কোটি লোকের ভাষা না জানিয়া তাহাদিগের বিচার করিবার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত আমাদের দেশ জগৎকে দেখাইতেছে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে—স্বদেশী ভাষাকে জীবনক্ষেত্রে বাল্যকাল হইতে হারাইয়া। আমাদের দেশের সঙ্গে এখন আমাদের নাড়ীচ্ছেদ হইয়াছে—এই দেশীয় ভাষাকে অগ্রাহ্য করার ফলে। এখন আণ্টামাসের চৌদ্দপুরুষের নাম ও অষ্টম হেন্‌রীর রাজ্ঞীদের নাম মুখস্থ করিতে করিতে আমরা নিজেদের বংশপরিচয় ভুলিয়া গিয়াছি। দেশীয় আদর্শ আমাদের দৃষ্টিতে বিষ হইয়াছে, দেশীয় ধর্ম্মকে রাজনীতির চালে বজায় রাখিয়াছি, কিন্তু তাহার উপর ভক্তি-বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। নিবৃত্তিমূলক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে হেয় মনে করিতেছি, মার্টিন লুথারকে চৈতন্য হইতে অনেক উচ্চে আসন দিতেছি এবং দেশের প্রাচীন সাহিত্যের অসামান্য সম্পদকে কাণা কড়ির মূল্য দিতেছি। ঘষা পয়সার লোভে মোহরের মূল্য দিতে ভুলিয়াছি, দেশের ঠাকুরের গোঁপের চাড়া হইতে এখন বিদেশী কুকুরের লেজ নাড়াই বেশী প্রশংসা

পাইয়া থাকে। দেশীয় সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত আদর্শচ্যুত হইয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। হে তরুণ সম্প্রদায়, আপনারা দেশের এই যুগ ফিরাইয়া আনুন। আপনাদের সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম্মের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করুন। প্রকৃত স্বদেশী হইবার কতকগুলি প্রধান লক্ষণ আছে—তাহার সর্ব্বপ্রধান দেশীয় জিনিষের প্রতি অনুরাগ। শীতপ্রধান দেশের পক্ষে আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালের তাপ অসহ্য—তথাপি য়ুরোপীয়রা এদেশে সার্জ্জের কোট ছাড়িবেন না। দেশের প্রতি আমাদের প্রকৃত অনুরাগ অর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের দেশে অনুরাগযোগ্য এত উপকরণ আছে, যাহা বহু দেশের ভাগ্যে নাই। তবে যে অনুরাগ নাই, তাহা ভাণ্ডারের অভাব বলিয়া নহে—আমাদিগের সে দিকে দৃষ্টি নাই বলিয়া। আমরা পশ্চিম-মুখো হইয়া আসিয়াছি। সূর্য্যোদয় কি প্রকারে দেখিব? কিন্তু সূর্য্যোদয় রোজই হইতেছে—আপনারা একটিবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখুন—কত মঠ-মন্দিরে, গোষ্ঠের শ্যামলক্ষেত্রে,বৈষ্ণব-গীতে, আগমনী গানে, ন্যায়ের অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম অনুশীলনে, স্মৃতি-শ্রুতি-কাব্যের মহিমায় এই বঙ্গমায়ের চিত্র সমুজ্জ্বল হইয়া আছে, পূজারীর যদি ভক্তি থাকে, তবে পূজার জন্য বিগ্রহের অভাব হইবে না। একবার ফিরিয়া এ দেশের গৌরবের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, যেমন দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন—মাইকেল মধুসূদন। তিনি বিলাপ করিয়া বলিয়াছেন, এই রত্নখনি তিনি মূঢ়তাবশতঃ অগ্রাহ্য করিয়া কতটা ভুল করিয়াছিলেন। পশ্চিমের উপাসনা ত বহুদিন করিয়াছেন, একবার পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইয়া বসুন। তাহা হইলে দেখিবেন আমাদের হ্রদে তড়াগে, দীর্ঘিকায় যে শতদল প্রস্ফুটিত হয়, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। ডেইজি ও ওয়াটার লিলির মায়া কাটাইয়া একবার দেখুন দেখি।

বাঙ্গালাদেশের সঙ্গে পরিচয়-স্থাপনের পর যে অনুরাগের সৃষ্টি হইবে, তাহাই স্বরাজের ভিত্তি। নতুবা এখনকার উৎসাহের কতটা আসল ও কতটা ভেল, তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

বঙ্গীয় সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য আছে—তাহা শিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যেও কতকটা অবজ্ঞাত, তথাপি তাহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়। এই দেশের সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে, সকল দিক্ দিয়া সেই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম্মের দিক্ দিয়া এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে রসের সন্ধান দিয়াছে, জগতের অন্য কোন জাতি তাহা দিতে পারে নাই। আমরা পথহারা পথিকের মত দিগ্ভ্রান্ত হইয়া যে সত্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,—তাহা হয় ত আমাদের অতি নিকটেই আছে, আমরা মোহান্ধ হইয়া তাহা দেখিতে পাইতেছি না।

ধর্ম্মের দিক্ দিয়া ভগবান্‌কে বাঙ্গালী যতটা অন্তরঙ্গ করিতে পারিয়াছে, এই ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের লোক তাঁহার সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমাদের সাহিত্যের আদিম অধ্যায়গুলিতে কয়েকটি সৌর সঙ্গীত আছে, তাহাতে সূর্য্যঠাকুর অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীকে বিবাহ করিয়া কিরূপে বাড়ীতে লইয়া যাইতেছেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই গৌরী মাতৃস্নেহে ভরপুর বঙ্গের দুহিতা ;—অতটুকু মেয়ে স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘর করিতে যাইতেছে। যে ভাই-বোনের সঙ্গে সে দণ্ডে দশবার ঝগড়া করিয়াছে আজ আসন্ন বিরহের দিনে সেই ছোট ভগিনীর জন্য তাহাদের কি কান্না! গৌরী কাঁদিয়া বলিতেছে, " আমি যাব

না, মা, তুমি আমায় লুকাইয়া রাখিয়া দাও।"—মা বলিতেছেন—"পণের টাকা খাইয়া বিবাহ দিয়াছি, কেমন করিয়া তোমায় রাখিব?" নৌকায় গৌরী যাইতেছেন, মায়ের ক্ষীণ কান্নার সুর বায়ুতে ভাসিয়া আসিয়া মেয়ের কাণে বাজিতেছে—তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, সে বলিতেছে, "ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢল্‌কে উঠে পানী। ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি ভাই, আমি মায়ের কান্না শুনি।" তার পর পিত্রালয় দূর-দূরান্তরে পড়িয়া রহিল, গৌরী অকূলে ভাসিতেছে। গৌরী সূর্য্যঠাকুরকে বলিতেছে—"আমি তোমার সঙ্গে যাব, ঠাকুর, ক্ষুধা পাইলে আমি ভাত কোথায় পাইব?" স্বামী বলিতেছেন, "আমার নগরগুলিতে শত শত হেলে কৈবর্ত্ত চাষ চষিতেছে, সুগন্ধি শালিধান্য তোমার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—তোমার ভাতের অভাব হইবে না।" অশ্রু-গদগদকণ্ঠে গৌরী বলিতেছে, "আমি তোমার সঙ্গে যাব কিন্তু পরিবার শাড়ী আমায় কে দেবে?" উত্তর,—"আমার নগরে নগরে তাঁতিরা তাঁত চালাইয়া তোমার জন্য কত রঙ্গের ডুরে শাড়ী তৈরী করিতেছে।" পুনরায় গৌরী শাঁখার কথা বলিতেছেন উত্তরে সূর্য্যঠাকুর বলিতেছেন—"তোমার জন্য আমি শাঁখারী আনাইয়াছি, বাড়ীতে যাইয়া দেখিবে, তোমার ছোট্ট দুইখানি হাতে শাঁখা কিরূপ সুন্দর মানাইবে।"

কিন্তু এ সকল কথা ত কথা নয়; যে ব্যথা তাহার মনে গুমরিয়া উঠিতেছে—যাহা মনের অতি গোপনীয় কথা—লজ্জায় চোখের জল সামলানো যায় না—সূর্য্যঠাকুরের বুকে মাথা লুকাইয়া লাল শাড়ী-পরা বিয়ের ক'নেটি সেই মর্ম্মের কথাটি বলিতে যাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ঃ—"তোমার দেশে যাব ঠাকুর, আমি মা বলিব কারে?"

সূর্য্য কত স্নেহে কত আদরে সোহাগ করিয়া গৌরীর চুল গুছাইতে গুছাইতে বলিতেছেন—"কেন? আমার যে মা আছে, মা বলিবে তারে!"

সাহিত্যের সৌরমণ্ডল হইতে গৌরীর নাম ধুইয়া মুছিয়া গেল। শৈব-সাহিত্যে তিনি হইলেন শিব-সোহাগিনী উমা। এখানেও সেই স্নেহময়ী দুহিতা-মূর্ত্তি। নারদ মেনকাকে বলিয়া গেলেন—"কৈলাসে দেখিলাম, ভাঙ খাইয়া ভোলানাথ দিগম্বর হইয়া গৌরীকে কত গালাগালি দিতেছেন, শিব দিনরাত্রি ভাঙ খাইয়া বেহাল আছেন, বিয়ের সময় আপনারা গৌরীকে যে বসনভূষণ দিয়াছিলেন,—তাহা পর্য্যন্ত বেচিয়া তিনি ভাঙ খাইয়াছেন। নারদ আরও বলিলেন—"আমি দেখিয়া আসিলাম, গৌরী 'মা মা' বলিয়া কাঁদিতেছে।"

এই গৌরী সৌরলোকের নহে, কৈলাসেরও নহে—গৌরী বাঙ্গালার পাড়াগাঁয়ের দুগ্ধপোষ্যা দুহিতা। তাহাকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া মায়ের মনে যে ব্যথা শেলের মত বিঁধিয়া থাকিত, সেই ব্যথা এই সকল গীতের সূতিকাগার। এই জন্য আগমনী গানে বাঙ্গালী মেয়েদের মর্ম্মকথা এমন করিয়া স্নেহার্দ্র বেদনার সৃষ্টি করিত। মেনকা রাজ-রাণী—শিবানী ভিখারীর গৃহিণী,—যে খাদ্য মেনকা তাঁহার গৃহে ফেলাইয়া ছড়াইয়া দেন,—সেই খাদ্যের অভাবে শিশুদের লইয়া গৌরী কত কষ্ট পান,—ইহা শুনিলে মায়ের মন কিরূপ আকুলি-ব্যাকুলি করিবার কথা! তিনি চোখের জল আঁচলে মুছিতে মুছিতে গিরিরাজকে বলিতেছেন—"তুমি যে কতদিন, গিরিরাজ, আমায় কহিয়াছ কত কথা। সে কথা শেলসম আছে আমার হৃদয়ে গাঁথা। আমার লম্বোদর নাকি উদরের

জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াত। হয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোনার কার্ত্তিক ধূলায় প'ড়ে লুটাত।" এই আগমনী গান বাঙ্গালার মেয়েদের মনের জীবন্ত বাৎসল্য-রসের উৎস। দশভূজার রণরঙ্গিনী মূর্ত্তির ছদ্মবেশে বঙ্গমায়ের এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট দুহিতার পূজা লইয়া আমাদের দুর্গোৎসব। মেয়েরা ভগবতীকে বিদায় দেওয়ার পূর্ব্বে যে ভাবে বরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে দশভূজা মহিষমর্দ্দিনীর মহিমার কোন কথা মনে হয় না। বাঙ্গালার দুহিতা বাঙ্গালী মায়ের কত সোহাগ ও আদরের দ্রব্য, তাহাই মনে হইয়া থাকে। উমা দুহিতা-বেশে আমাদের বুকের ধন,—এ দিকে তিনি যে অন্নপূর্ণা জগৎপালিনী, বঙ্গের নিরক্ষর ভক্তগণ এক দিনের জন্যও তাহা ভোলে নাই। শিবায়নে তিনি স্বামিপুত্র প্রভৃতি গৃহের সকলকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেষণ করিতেছেন,—সে মূর্ত্তি—মাতৃমূর্ত্তি, তাহাতে জগজ্জননী ভগবতীর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। অন্নদা-মঙ্গলে সেই মাতৃহৃদয়ের যে করুণার ছবি পড়িয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব, তাহা জগজ্জননীরই মূর্ত্ত ছবি। শিবের সঙ্গে ব্যাস শত্রুতা করিতেছেন, কিন্তু সেই স্বামি-শত্রু অনাহারে ক্লিষ্ট, এ কথা শোনা মাত্র তাঁহার মাতৃহৃদয় করুণায় ভরপূর হইল, যিনি শিবনিন্দা শুনিয়া পূর্ব্বজন্মে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এ জন্মে স্বামিনিন্দককে অনাহার-ক্লিষ্ট দেখিয়া তাঁহার মন ব্যথায় ভরিয়া যাইতেছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া শিশুর মত যত্নে খাওয়াইতেছেন—মাতৃভাবের নিকট এখন অন্য সমস্ত বৃত্তি পরাজিত, এক পটে তিনি বাঙ্গালীর মেয়ে, আদরিণী, সোহাগিনী, গৃহের সকলের—নয়ন-পুত্তলি; অপর পটে সমস্ত দ্বিধাসংস্কার-বিরোধ অতিক্রম করিয়া তিনি মহিমময়ী জগজ্জননী; যে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছে সে যত অপরাধই করুক না কেন, শাস্তির গণ্ডী এড়াইয়া গিয়াছে। একটি পার্থিব আর একটি অপার্থিব রূপ।

শিব ঠাকুরের চাষার বেশ। তিনি ইন্দ্রের নিকট ত্রিশূলটি বাঁধা দিয়া কতকটা জমী মৌরসী পাট্টা লইয়া দখল করিয়াছেন। ভৃত্য ভীমের সাহায্যে শত শত আগাছা ফেলিয়া দিয়া ভুঁই চষিয়া ফেলিয়াছেন, ক্ষেতের আইল প্রস্তুত করিতেছেন, জোঁকের উৎপাত হইলে চূণের জল ছড়াইতেছেন। শিবায়ন পড়িয়া দেখুন, উহা একখানি বঙ্গের কৃষি-বিষয়ক manual বা পাঠ্যপুস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্গের চাষীরা কি ভাবে লাঙ্গল চালায়, আগাছাগুলির নাশ, মশা-মাছি তাড়াইবার উপায়, পোকায় কাটা নিবারণের ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ ধান কি ভাবে কোন্ ঋতুতে রোপণ করিতে হইবে, তাহার সকল কথা তাহাতে আছে। উপরি উপরি—ভাসা ভাসা রূপে পড়িলে মনে হইবে, এ হেন শিবঠাকুরের মধ্যে শ্রদ্ধা করিবার কিছু নাই। কবি বলিতেছেন, বুড়ো শিব সারারাত্রি জাগিয়া বাঘের মত ক্ষেতে পাহারা দিতেছেন।

মেনকা বলিলেন, গিরিরাজ, তুমি বেতো রোগী—একরূপ অচল, চলাফেরা তোমার পক্ষে সহজ নহে, উমাকে বৎসর বৎসর আন্‌তে যাওয়া তোমার পক্ষে কষ্টকর, অথচ উমাকে ছাড়া থাক্‌তে দিন-রাত আমার প্রাণে কেমন একটা হাহাকার হয়। তুমি এবার শিবের সঙ্গে উমাকে লইয়া আইস, আমি তাহাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিব। সে একটু রাগী, কিন্তু ভোলানাথের মস্ত বড় গুণ এই যে, একটা জবা, ধুতুরা-ফুল কিংবা বিল্বপত্র পাইলে অমনি খুসী হইয়া যান। তাঁহার রাগ যত সহজে জ্বলিয়া উঠে, আবার তত সহজেই নিভিয়া যায়।

যখন এই সকল আখ্যানের ভিতর দিয়া গ্রাম্য-গৃহস্থালী, কৃষকের জীবন-যাত্রা, বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে তরুণী ভার্য্যার দাম্পত্য-কলহের

চিত্র, এই সকল আলোচনা করিবেন, তখন মনে পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্নটি হওয়া স্বাভাবিক, এই কি শিবঠাকুর? এই কি শৈব ধর্ম্ম? কিন্তু ইহা যে ধর্ম্ম, ইহা যে অত্যুন্নত শৈবাদর্শ, তাহাতে একটুও ভুল হইবে না—উপসংহারকালে মেনকা শিবঠাকুরকে ঘরজামাই করিতে চাহিলে, কবি বলিতেছেন, যাঁহার কুবের ভাণ্ডারী, তাঁহাকে তুমি তোমার রাজধানীর লোভ দেখাইয়া এখানে আনিতেছ! যিনি সোনার পুঁরী কৈলাস ছাড়িয়া শ্মশানে-মশানে বেড়ান—যাঁহার কাছে পাঁক পঙ্কজ ছাই ও চন্দনের এক দর, তাঁকে তুমি সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহে আসক্ত করিতে চাও! এই দারিদ্র্য যে তাঁহার লীলা,—তিনি ভিখারীর পর নহেন, বরঞ্চ ভিখারী তাঁহার কত অন্তরঙ্গ, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার এই ভিখারীর সাজ। কাশীদাস লিখিলেন, সকলে যাহাকে ঘৃণা করে, শিব তাহাকেই প্রাণের বস্তু বলিয়া লন; এই জন্য সুগন্ধি দ্রব্য ছাড়িয়া ছাইকে এত আদর; রত্ন-পট্টাম্বর ছাড়িয়া তিনি বাঘছাল পরেন,—নিঘৃ‍্ণ শিব বুড়ো বলদটিকে বাহন করিয়াছেন এবং নন্দী ভৃঙ্গীকে আদরে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছেন। এই শৈব-বিভূতি—শৈব-লীলার মহিমা চাষীরাও অনায়াসে বুঝিতেছে। জগৎ যখন বিষের প্লাবনে ভাসিয়া যায়, তখন তিনি স্বয়ং তাহা পান করিয়া জগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। সমুদ্র-মন্থনের সারদ্রব্য ঐরাবত কুঞ্জর, উচ্চৈঃশ্রবা এবং পারিজাতপুষ্প দেবরাজ লুটিয়া লইলেন; দেবাদিদেব মহাদেব লইলেন বিষ—জগৎরক্ষার জন্য। তাহা তিনি আকণ্ঠ পান করিয়া চিরকালের জন্য নীলকণ্ঠ হইয়া রহিলেন।

চাষীদের গানের শিব চাষী হইয়া চাষীর অন্তরঙ্গ হইয়াছেন। এ দিকে তিনি কত বড়, সে অপূর্ব্ব শৈব-মহিমাও চাষীদের অবিদিত নাই। শিব মহান্ হইতেও মহান্—তাহাও এই চাষীর সাহিত্যে

তেমনই ভাবে পাওয়া যায়, যে ভাবে তিনি অণুরূপী অণীয়ান্, এই সত্য তাঁহার কৃষি-প্রসঙ্গে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি পরাৎপর এ কথাও তাহারা যেমনই বুঝাইয়াছে, তিনি ক্ষুদ্রেরও আপনার হইতে আপনার, এ কথাও তেমনি প্রমাণ করিয়াছে।

ভগবান্‌কে যে এই ভাবে আপনার করিয়া দেখা, তাহা বঙ্গের বৈষ্ণব-সাহিত্যে যেরূপ পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহার তুলনা আছে বলিয়া আমার জানা নাই। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বাঙ্গালার দান পঞ্চতত্ত্ব, যাহা রাম রায়ের মুখ দিয়া মহাপ্রভু কহাইয়াছেন। এই যে শিশুটিকে আমরা আঙ্গিনায় খেলিতে দেখি, ইহার মত আশ্চর্য্য জগতে আর কিছুই নাই। মায়ের কালো কুৎসিত ছেলেটি তাঁহার নয়নের মণি। সারারাত্রি প্রদীপ জ্বালাইয়া তিনি সেই ছেলেটির মুখ দেখেন, তবু সেই মুখের শোভা—কুৎসিতের রূপ ফুরায় না। বাঘের মত নির্ম্মম কোন জীবজন্তু নাই, তবুও সেই বাঘের দৃষ্টিতে শাবকটি মমতার উৎস-স্বরূপ। বৈষ্ণব জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন, যাহা কুৎসিত, তাহা অনন্ত সৌন্দর্য্য লাভ করে কিসে? যে স্বভাবে নির্ম্মম, তাহার মন এরূপ নবনীত-কোমল হইয়া যায় কিসে? উত্তরে তাঁহারা বলেন, ভগবান্ স্বয়ং জীব-রক্ষার জন্য মাতার নয়নে যাদু-অঞ্জন পরাইয়া শিশুরূপে দেখা দেন; প্রতি বার তিনি মায়ের বুকের সমস্ত সুধা আহরণ করিয়া মূর্ত্তহইয়া শিশুরূপে পুনঃ পুনঃ জগতে আসিতেছেন; তাঁহার পালনীশক্তি এই ভাবে জগৎ রক্ষা করিতেছে। বাৎসল্যে যে লীলা, দাম্পত্যেও সেই লীলা, সখ্যেও তাহাই। আমাদের গৃহের আঙ্গিনায় যে ক্ষুদ্র জীবটি খেলিয়া বেড়াইয়া যায়, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখুন, সে যখন কুন্দ-দন্ত বিকাশ করিয়া হাসে, তখন তাহার মুখে ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্ব দেখিতে পাইবেন—কুরূপের রূপের অন্ত নাই। একদা কৃষ্ণ হাঁ করিলে যশোদা সেই মুখে অনন্তের আভাস

পাইয়াছিলেন। তিনি সখ্যে, বাৎসল্যে এবং দাম্পত্যে ক্ষুদ্র উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া স্বয়ং নয়ন-সমক্ষে আসিয়া দাঁড়ান এবং কুরূপকে রূপ-মণ্ডিত করেন ও দুর্ব্বলকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করিয়া দেখান। একটি হিংস্রজন্তুপূর্ণ জঙ্গলে শীর্ণা মাতা তাঁহার শিশুটিকে কোলে লইয়া যাইতেছেন; মায়ের মন ভয়ে দুরু দুরু কাঁপিতেছে, কিন্তু শিশু তাঁহার কাঁধের উপর মাথা হেলাইয়া অসীম নির্ভরের সহিত চলিতেছে, তাহাকে যদি ক্রমওয়েল্ তাঁহার সমস্ত 'আয়রন্ সাইড' লইয়া আশ্রয় দিতে উপস্থিত হন, তবুও সে মাতৃ-অঙ্ক ছাড়িয়া যাইতে চাহিবে না। ক্ষীণ-শরীরা মাতার উপর তাহার এই অনন্ত বিশ্বাসের কারণ কি। আমাদের গার্হস্থ্যজীবনের স্নেহ-ভালবাসার মধ্য দিয়া তিনি স্বয়ং আমাদিগের দৃষ্টিতে এই ভাবে বারংবার ধরা দেন, এজন্যই এত বিশ্বাস, এত রূপের আবিষ্কার, এত ত্যাগস্বীকার জগতে সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা বৈষ্ণবী মায়ায় ঠেকিয়া তাঁহাকে দেখি না, দেখি শুধু মানুষকে। তাঁহাকে এই ভাবে চেনার পর দারাপুত্র পরিবার কেউ নয় কেউ নয় বলিয়া বিরাগের চীৎকার করার কোন মূল্য নাই। সকল রূপের মধ্যে তাঁহার রূপ, সকল লীলার মধ্যে তাঁহারই লীলা। বৈষ্ণবদের গোষ্ঠে সখাদের সঙ্গে ক্রীড়া, যশোদার বাৎসল্যে ও রাধার মহা-ভাবে বাঙ্গালী গৃহ-আঙ্গিনা ও স্বীয় বাসস্থানের সীমানার মধ্যে ভগবান্কে আনিয়া যেমন ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। ইহাই তাঁহার মহা দান। অন্য সকল সম্প্রদায় কর্ত্তব্যের মধ্যে, সাংসারিক কার্য্যের বাধ্যবাধকতার মধ্যে ভগবানের আদেশ-বাণী আবিষ্কার করিয়াছেন। জীব তাঁহার দাস, শুধু আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, মানুষ শুধু কর্ত্তব্য করিতে আসিয়াছে, ইহার উপর আর কিছু নাই। বাইবেল বলেন, মানুষ জীবনান্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলে মহা-বিচারের দিনে তিনি ভাল লোকদের বলিবেন, well

done, ভাল কায করিয়াছে। ইহাই তাহার চূড়ান্ত পুরস্কার। কিন্তু কর্ম্মশালার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি যে স্থানের নাগাল পায় না, বৈষ্ণবের রসের বৈকুণ্ঠ সেই ঊর্দ্ধলোকে অবস্থিত। এখানে কর্ম্মশীলতার শেষ নাই, কর্ত্তব্যের কোন গণ্ডী নাই, এখানে ৫টায় ছুটী হয় না। জননী, প্রণয়িনী এবং সখার কি সেবার অবধি আছে? সে সেবা উৎকটতম অথচ তাহাতে শ্রম-বোধ নাই। প্রেমের দায়ে আত্ম-হারা হইয়া যাঁহারা কায করেন, তাঁহাদের কর্ম্ম সমস্ত কার্য্যের সার, তাহাতে প্রাণান্ত কষ্টেও পরমানন্দ, তাহা সংগীতের সার, সামবেদ।

ভগবান্‌কে ইঁহারা এতই আপনার জন মনে করিয়াছেন যে, আপনার জনের যে পূর্ণ অধিকার ও আধিপত্য থাকে, তাহাই তাঁহারা ভগবানের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। যে তাঁহাকে চায় আর কিছু চায় না, তাহার কাছে জগৎস্বামীর হা'র হইয়া গিয়াছে, তিনি কিছু দিয়া তাহাকে ভুলাইতে পারিলেন না। তাহার জোর তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইবেই, তাহার মান ভাঙ্গিতে তিনি তাহার পায়ে হাত দিয়া মিনতি করিয়া থাকেন, ইহা বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কেহ ধারণাই করিতে পারিবে না। বাঙ্গালায় ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রভেদ একেবারে মুছিয়া গিয়াছে, অন্যত্র ব্যবধান খুব বেশী। ভগবান্‌কে যে ভালবাসা যায়, তাহা বাঙ্গালী যেমন করিয়া দেখাইয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। স্ত্রী-পুত্রের জন্য মানুষ যাহা করে, মহাপ্রভু তাহাপেক্ষা বেশী আকুতি-কাকুতি করিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, ভগবান্‌কে যত ভালবাসা যায়, পৃথিবীতে অন্য কিছুকে তাহার শতাংশের একাংশ ভালবাসা যায় না। এজন্য গৌরাঙ্গদেব এ দেশের চাষী হইতে রাজ-রাজন্য পর্য্যন্ত সকলের নয়নের মণি হইয়াছেন। অন্যত্র কোন ভক্ত বা মহাজনের জীবনী

লইয়া বড় বড় পুস্তক লিখিতে হয়, তাহা শিক্ষিত সমাজের পাঠ্য। মহাপ্রভুরও সেরূপ জীবন-চরিত আছে। কিন্তু বঙ্গদেশের চাষীরা জীবনী গানে গানে আঁকিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক গানের পূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়া তাহারা চৈতন্য-লীলার আধ্যাত্মিক রস আস্বাদন করিয়া থাকে। এই সকল গানের অবধি নাই। বাঙ্গালায় যতগুলি কুন্দফুল, গৌরচন্দ্রিকাও সংখ্যায় তাহার কম নহে। এরূপ গানে গানে জীবনী আর কাহার আছে? বৈষ্ণব সাহিত্য জগতের সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। একাধারে রূপ ও অপরূপকে,—পার্থিব ও অপার্থিবকে আর কোন সাহিত্য এমন করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। পদাবলী পড়িয়া দেখুন, যেমন কোন পর্য্যটক নদীর দুইধারে পুষ্পরেণু-মণ্ডিত—ভ্রমরগুঞ্জরিত রমণীয় উদ্যান ও জনশালিনী অভ্র কিরীটিনী নগরী দেখিতে দেখিতে যাইয়া যখন সমুদ্রের মোহানায় উপস্থিত হন, তখন পশ্চাদ্ভাগের যত কিছু দৃশ্য ও শব্দ, তাহা স্বপ্নের ন্যায় বিলীন হইয়া সম্মুখের অকুল অফুরন্ত বিশাল জলধি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিমূঢ় করিয়া ফেলে, তেমনই এই সাহিত্য রাধাকৃষ্ণ প্রেমের শত দৃশ্য, সখ্য ও বাৎসল্যের শতচিত্র, গৃহ-প্রাঙ্গন ও গোষ্ঠলীলার শত লীলা দেখিতে দেখিতে পাঠক আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিবেন—যেখানে রূপের শেষ রেখা বিলীন হইয়াছে ও অরূপ তাহার আভাস দিতেছে। যেখানে পার্থিব রসের অপার্থিবে পরিণতি ও যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও উপভোগ্য, তাহা আধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছে। বৈষ্ণবপদের এক দিকে জন-কোলাহল অপর একদিকে দৈববাণী,—একদিকে বাঁশীর সুরে গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে অপর দিকে মানুষকে তাহার একমাত্র অন্তরঙ্গের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। জগতের কোন সাহিত্যে অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মকে এতটা মনোবুদ্ধির গোচর

করে নাই। যদি শ্রদ্ধার সহিত কোন ভাল কীর্ত্তনীয়ার গান শোনেন, তবে এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবেন।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের বীজ ভারতে ছড়ান ছিল। পরমহংসদেব এই যুগে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন, তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর বিশ্বাস গ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, "যত মত তত পথ।" ভিন্ন মত হইলে তাহা অশ্রদ্ধেয় হয় না, বরং আর একটা পথের সন্ধান দেয় মাত্র। কেশব যখন নববিধান প্রচার করেন, তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "কি করিলে কেশব? পুকুরের চারটা ঘাট ছিল, তিনটে ভেঙ্গে একটা রাখলে?" এমন উদার কথা এই যুগে বাঙ্গালা ভিন্ন অপর কোন স্থানে উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। তুমি ব্রাহ্ম হও, শাক্ত হও, নববিধানই হও, হিন্দু হও, খৃষ্টান বা মুসলমান হও, প্রত্যেকটি ঘাট পুকুরের জল আনার পক্ষে দরকারী এবং সে কাযের উপযোগী—সমস্তই বজায় থাকুক। বাঙ্গালার মহাপুরুষ নিজের মধ্যে সর্ব্বধর্ম্মের তপস্যা করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছিলেন। নিজে একটা নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বিচ্ছেদের আর একটা রেখা টানেন নাই। এই সার্ব্বজনীন উদারতা, এই অমৃতফল বাঙ্গালার। ভগবান্‌কে, পুত্র, সখা ও প্রণয়িণীর শত লীলার মধ্যে বাঙ্গালী যেরূপ অন্তরঙ্গরূপে পাইয়াছে, তাহাও অন্যত্র দুর্লভ।

বাঙ্গালার শিল্পেও সেই বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন হরগৌরী, বুদ্ধ ও বাসুদেব-মূর্ত্তিতে তাহা স্পষ্ট—তাহাতে একটা অপার্থিব আনন্দ আছে—যাহা শুধু বাঙ্গালী শিল্পীই আঁকিতে জানেন। হরগৌরীর একখানি প্রস্তরমূর্ত্তি আমার নিকট আছে, তাহা দ্বাদশ শতাব্দীর। শিব গৌরীর চিবুক ধরিয়া তাঁহার মুখখানি

দেখিতেছেন,—সেই স্নেহমধুর দৃষ্টিতে যে আনন্দ আছে, তাহা পার্থিব আনন্দ নয়,—পুকুরের জলের সঙ্গে বারিধির জলের যে প্রভেদ, খণ্ড আকাশের সঙ্গে সীমাহীন বৃহৎ আকাশের যে প্রভেদ, পার্থিব সুখের সঙ্গে এই আনন্দের সেই প্রভেদ। শিব গৌরীর চিবুকখানি ধরিয়া আছেন, তাঁহার হস্তের অঙ্গুলীর প্রত্যেকটি দিয়া শতধারায় সেই অপার্থিব স্নেহ-সুধা ঝরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে সেই আনন্দ-জাত স্নেহ ঝরিয়া পড়িয়াছে। এই আনন্দ শরীর অতিক্রম করিয়া মূর্ত্তিটিকে চিন্ময় করিয়া তুলিয়াছে। যে বাঙ্গালী দ্বারা এই হরগৌরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর নিজস্ব। আপনাদিগকে আমি ৫৫নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে বলাইলাল মল্লিকের বাড়ীতে রক্ষিত মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের ছবিখানি দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করি। যে সময় র‍্যাফেল্ ইটালীতে বসিয়া ম্যাডোনা আঁকিয়াছিলেন, অপরিজ্ঞাত-গোত্র-নামা বাঙ্গালী চিত্রকর সেই সময় এই চিত্র আঁকিয়াছিলেন, উহা সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বের অঙ্কিত। বলাইবাবু এই অপূর্ব্ব চিত্রের ইতিহাস বলিতে পারিবেন। বাঙ্গালার হাতে ডঙ্কা নাই, তাহা হইলে জগতের নিকট এই চিত্রের মহিমা প্রচার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম, এইখানি ভাল কি ম্যাডোনার চিত্রখানি ভাল? গঙ্গাতীর, প্রায় শতাধিক লোক একত্র হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, সমস্ত চিত্রে যে আনন্দ পরিব্যপ্ত, তাহার ছটায় উহা বৈকুণ্ঠ লোকের সামগ্রী বলিয়া মনে হইবে। পথিক নৌকাযোগে চলিয়াছেন, তাঁহার হাত হইতে হুকার কলিকা খসিয়া পড়িয়াছে, জ্ঞান নাই; নির্নিমেষ-নেত্রে তিনি তীরস্থ মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিতেছেন। সেই মাধুরী দর্শনে মাঝিরা বৈঠা উঁচুতে তুলিয়া উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া আছে। মেয়েরা তাঁহাকে দেখিতেছে, লজ্জা সরম ছাড়িয়া—কলসী গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। এই চিত্রখানি

যখন অঙ্কিত হইয়াছিল, তখনও মহাপ্রভুর গায়ের হাওয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে চলিয়া যায় নাই, নতুবা ইহা তাঁহার ব্রহ্মানন্দের এরূপ আভাস কি করিয়া দিবে? হায় স্বদেশী। আপনাদের কাহারও কি এই চিত্র দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে? স্বদেশের কোহিনূর যে অতলে তলাইয়া যাইতেছে। এই চিত্রখানিও যে নষ্ট হইবার মধ্যে। ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফ্রেঞ্চ এই চিত্রখানি এক ঘণ্টা বসিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাও সন্ধান রাখেন, আমাদেরই শুধু চোখ নাই।

আর বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন, জগতের ইতিহাসে অনন্যসুলভ মহিমানণ্ডিত নব্য ন্যায় আপনারা কত জনে পড়িয়াছেন? বহুবার য়ুরোপীয়রা চেষ্টা করিয়া হটিয়া গিয়াছেন। সেই অতি সূক্ষ্মতর্ক বিশ্লেষণের জটিল গতিবিধি অনুসরণ করিতে যাইয়া তাঁহারা হারিয়া গিয়াছেন। এই ন্যায়শাস্ত্র, যাহা উচ্চশিক্ষার উচ্চতম কোঠায় অবস্থিত, তাহা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এতটা প্রচার ও আদর লাভ করিয়াছিল যে, আমাদের গ্রামে গ্রামে ন্যায়-পঞ্চানন, তর্কচঞ্চু, তর্করত্ন, তর্কবাগীশ, ন্যায়রত্ন প্রভৃতি উপাধির ছড়াছড়ি ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য এ দেশে এখন যে ব্যবস্থা, কিছুদিন পূর্ব্বে এ দেশে তাহার অনেক বেশী ছিল। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ের এক টুলো পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর টোলে ৫ শত পড়ুয়া পড়িত। বলা বাহুল্য, ইহাদের সকলের আহারাদির ব্যয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় সরবরাহ করিতেন।

যদিও প্রাচীন-সাহিত্য, শিল্প ও সমাজের ইতিহাস অনুশীলনের জন্য আমি আপনাদিগকে উদ্বোধিত করিতেছি, কিন্তু তাই বলিয়া আমি বঙ্গীয় সভ্যতার কোন স্থানে দাঁড়ি টানিয়া তাহাকে ‘স্থিরো ভব’

বলিয়া নিশ্চল হইতে পরামর্শ দিতেছি না। বঙ্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য চিন্তার স্বাধীনতা। বঙ্গের পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথমে ন্যায়শাস্ত্রকে ধর্ম্মের অনুশাসন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। যখন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" শব্দে ভারতের দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ, তখন ভারতের ছোট ছোট ভূস্বামীরা পর্য্যন্ত "প্রাণ দেব, তথাপি দিল্লীর রাজ-কোষে কর দিব না"—এই বিদ্রোহী সুর তুলিয়াছিলেন। শুধু প্রতাপ, ইশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায় এইভাবে জলন্ত অগ্নির সমক্ষে পতঙ্গের ন্যায় সম্মুখীন হন নাই। পালাগানে ক্ষুদ্র ভূস্বামী ফিরোজ খাঁর নির্ভীক উক্তি পাঠ করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। যখন অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী যাহার "দন্ত মুকুতা গন্ধতন" তাহাকে পিতামাতা "বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দর্শন" এমন লোকের হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করাই নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন—সে সময়ে বাঙ্গালীর কৃষক কবি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের মনোনয়ন দ্বারা যে বিবাহ হয়—তাহাই তাহার স্বর্গ—নারীজীবনের তদপেক্ষা কাম্য আর কিছু নাই। যেখানে সতীধর্ম্মকে ব্রাহ্মণরা সর্ব্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেখানে সহজীয়ারা নির্ভীকভাবে বলিয়া-ছেন, যে প্রেম কুল বিসর্জ্জন দেয়, যাহা পরনিন্দাকে পুষ্পচন্দন বলিয়া মনে করে, যাহাতে পিতৃকুল, স্বামিকুল পরিত্যাগ করে এবং নারীর নিকট স্বর্গ তেমন কাম্য হয় না, যেমন প্রিয়জনের মুখদর্শন,—সেই প্রেমদেবতার একনিষ্ঠ সেবিকা, সেই কুলকলঙ্কিনীই সতী-শিরোমণি। পরকীয়াই তাহাদের আদর্শ। বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র এই স্বাধীন চিন্তার বিকাশ—বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য খুঁজিতে গিয়া এই চিন্তার স্বাধীনতা সর্ব্বপ্রথমে চোখে পড়িবে। আতিথ্য করিতে হইবে' পিতা স্বয়ং করাত ধরিয়া পুত্রের মস্তক কাটিতেছেন, মাতা পুত্রের মাংস রন্ধন করিয়া অতিথিকে ভক্ষণ করাইতেছেন—

বাঙ্গালার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত আদর্শ অবাধ, তাহার কোনস্থানে বিরাম-চিহ্ন নাই। বাঙ্গালার এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া আমার বলার উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা লাটিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে যেইখানে ছিলাম, সেইখানে যাইয়া স্থির হইব। বর্ত্তমান সভ্যতা ও শিক্ষা-প্রণালী আমাদের দৃষ্টিতে নানা নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বতন চিন্তার ধারাকে নব-প্রবর্ত্তিত নানা খাদে বহাইয়া দিতে হইবে। তবে উন্নতি করিতে হইলে নিজের জিনিষ কড়া-ক্রান্তির হিসাব করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে বৈ কি ?

আমার এখন জীবনাবসানের সময়। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গশিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সূর্য্যাস্তের শেষ-রেখা দিনান্তের দিগ্বলয় হইতে মুছিয়া যাইতেছে। ভগবানের নিকট জীবনসন্ধ্যায় আমার এই প্রার্থনা, যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে যেন বঙ্গমায়ের অঙ্কেই জন্মগ্রহণ করি। আমি লণ্ডন, প্যারী, সেণ্টপিটাসবর্গ, মাস্কো, ভিয়ানা, বোষ্টন, বারলিন, এমন কি, টকিওর রাজপ্রাসাদে বিধি অনুগৃহীত কোন শ্বেতাঙ্গ বা পীতাঙ্গ রাজকুলে জন্মিতে চাহি না। আমি সে বিজয় চাই না, যাহাতে পরের পরাজয়—আমি সে গৌরবস্তম্ভ চাহি না, যাহা অন্য জাতির ভগ্ন ও চূর্ণ মনোরথের ইট-সুরকীর উপাদানে গঠিত, সে রাজকোষ চাহি না, যাহা নির্ম্মম পরকীয় উদরান্ন লুণ্ঠনের গৌরবে দর্পিত। হউক না দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট, বঙ্গের পল্লীই আমার শ্রেষ্ঠতম শান্তি ও আনন্দের উৎস। কবে দীর্ঘ-বিলম্বিত দুঃখ-রজনীর অবসানে সেই নিগৃহীত পল্লীর দুর্দ্দশা ঘুচিবে—তাহাই আমার একমাত্র চিন্তা। কবে আমাদের স্নেহ-শীতল শত স্মৃতি-জড়িত আম, জাম, কাঁঠালের শীর্ষে স্বর্ণচ্ছটা দান করিয়া পুনরায় সূর্য্যোদয় হইবে ? নিদারুণ ব্যাধি-যন্ত্রণাকাতর মাতার রোগের শয্যা ত্যাগ করিয়া যেমন সন্তান

অন্য স্থানে গেলে ক্ষণমাত্র সোয়াস্তি পায় না, আমার আত্মা সেই-রূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার চিরদুঃখময়ী বঙ্গ-ভূমির পার্শ্বেই থাকিতে চায়। ইহার পবিত্র পরম শান্তিপ্রদ অঙ্ক ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও যাইতে আমার সাধ নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—মাদ্রা

সাহিত্য-শাখার সভাপতি

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল্

সাহিত্য-শাখার সভাপতি—

শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল,

মহাশয়ের অভিভাষণ।

এক গ্রামে এক যাদুকর গিয়াছিল। সে তার বিজ্ঞাপনে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিল যে, তার নানা আশ্চর্য্য কাণ্ডের ভিতর, সে তার থলির ভিতর হইতে একটা জীয়ন্ত বাঘ বাহির করিবে! এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিল, রাশি রাশি টিকিট বিক্রী হইল, প্রেক্ষাগৃহ ঠাসাঠাসি হইয়া ভরিয়া গেল।

এখন, যাদুকরেরা সত্য সত্যই কোনও জিনিষ হাওয়া হইতে সৃষ্টি করিয়া বাহির করে না তাহা আপনারা জানেন। যে জিনিষ বাহির করে, সেটা তার কাছেই কোথাও লুকান থাকে। এই যাদুকরেরও পোষা একটা বাঘ ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিনই বাঘটা কেমন করিয়া পলাইয়া গেল।

প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য, খেলা দেখিবার জন্য দর্শকেরা উগ্র ব্যাকুলতায় ক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু বাঘ কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যাদুকর মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

শেষে সে খেলা দেখাইতে আরম্ভ করিল। সবই হইল, কেবল—যখন বাঘ বাহির হইবার কথা, তখন সে থলি হইতে বাহির

করিল—এক বিড়াল। দর্শকগণ তো চটিয়া লাল। যাদুকরের যা দুর্দ্দশা তারা করিল তাহা বলিবার নহে।

মাজুর সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের দশাটা অনেকটা সেই যাদুকরের মত, আর আপনাদের অবস্থা সেই দর্শকদের মত। এঁরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আজকার এই সভায় সভাপতি হইবেন সাহিত্য-শার্দ্দুল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে দেখিবেন আশা করিয়া আপনারা আসিয়াছেন, আর এঁরা উপস্থিত করিয়াছেন—আমাকে। সেই প্রসিদ্ধ যাদুকর তার দর্শকদের বলিয়াছিল যে বিড়ালও ব্যাঘ্রবিশেষ, প্রাণীতত্ত্বের এক পর্য্যায়ে তাদের স্থান। এঁরাও হয় তো আপনাদের বলিবেন যে আমিও, শরৎ বাবুর মত, ঔপন্যাসিক। সে কথায় দর্শকেরা ভোলে নাই—আপনারা ইঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন কি না জানি না।

কিন্তু ইঁহাদের যার যে দোষ থাক, আমার কোনও অপরাধ নাই। আমি আজ সকালে যখন বাড়ী ছাড়িয়া আসি তখন পর্য্যন্ত আমি কল্পনা করিতে পারি নাই যে আমাকে আজ শরৎ বাবুর জন্য কল্পিত সিংহাসন অধিকার করিতে হইবে। জানিলে, হয় তো অন্ততঃ গায়ের উপর দুটো ডোরা কাটিয়া একটু জাঁক করিয়া বাঘের মত চেহারা করিয়া আসিতাম, কিম্বা আসিতাম না। কিন্তু আসিয়া পড়িয়াছি—এবং আমার নগ্ন তুচ্ছতাকে আবৃত করিবার কোনও আয়োজনই করি নাই।

সভাপতির যেটা অপরিহার্য্য কার্য্য, সেই অভিভাষণও আমার নাই। আমি আপনাদিগকে যাহা বলিয়া পরিতুষ্ট করিব এমন কোন ও অভিভাষণ প্রস্তুত করিবার অবসর আমি পাই নাই।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একেবারে শূন্য হাতে আসি নাই। সাহিত্য শাখায় পাঠের জন্য একটি প্রবন্ধ আনিয়াছিলাম, তাহাই আপনাদের নিকট পাঠ করিব। সেইটিই সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আপনাদের দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইতে হইবে।

সাহিত্যিকের কাজ অনেকটা বিয়ের ক'নে সাজানর মত। তাঁর মানস কন্যাটিকে কন্যার সজ্জায় এমন করিয়া সাজাইয়া বাহির করিতে হইবে, যেন সবার মন মুগ্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু সবার পছন্দ এক রকমের নয়। তাই হয় নানা রকমফের। একজন চান মেয়েকে সেকেলে ভারি গয়নায় ঢাকিয়া ঝল্‌মলে বেনারসী চেলী পরাইতে। আর একজন একেলে,—তাঁর চোখে লাগে হাল্‌কা গয়না—দু'চার খানা পাথর-বসান—আর সাদা জমীর উপর খুব ফিকে রংয়ের শাড়ী, যাতে সবটা মিলাইয়া একটা নরম মাধুরী, একটা স্বপ্নের আমেজ আনে। আর একজন হয়ত এসব কিছুই চান না। গয়না বা শাড়ীর বাহারে মেয়ের স্বভাবসুন্দর শোভা অভিভূত না করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চান সেই শোভাটাকেই,—তার সব পরিচ্ছদকে অভিভূত করিয়া যেন রূপটাই বড় হইয়া উঠে। আটপৌরে শাড়ী পরাইয়া হাতে বড়জোর দু'গাছা সরু চূড়ী পরাইয়া—তাঁরা তাঁদের স্বয়ং-সুন্দরী মানস-কন্যাকে আসরে আনিতে চান। এঁদের কাউকেই নিন্দা করা যায় না।

বসনভূষণের রুচির মধ্যে যেমন জোর করিয়া একটার চেয়ে আর একটাকে বড় বলা যায় না, ভাষার সজ্জা সম্বন্ধেও তেমনি কোনও একটা প্রণালীর পক্ষেই স্থায়ী বা সনাতন সৌন্দর্য্যের

দাবী করা যায় না। যে প্রকৃত রূপজ্ঞ সে আটপৌরে শাড়ীপরা বঙ্গবধূ আর জড়োয়া মোড়া রাজকন্যার ভিতর রূপের কমি বেশী দেখে না। দেখে তার প্রকাশের প্রস্থানভেদে রূপ বৈচিত্র্য। তেমনি ভাষার রসে যে বিশেষজ্ঞ সে তার বিবিধ ভঙ্গীর প্রত্যেকটির ভিতরেই রসের আস্বাদন করিতে পারে।

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণের ভাষার রসসমৃদ্ধির তুলনা নাই। কিন্তু সে রস প্রধানতঃ ভাবের রস, ভাষার রস তার সরল সৌষ্ঠব। ভাবের পরিপূর্ণ রসটা শ্রোতার অন্তরে জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে যাহা পর্য্যাপ্ত রামায়ণের ভাষায় তার চেয়ে বেশী কিছু নাই। ভাষার অলঙ্কার রামায়ণে একরকম নাই বলিলেও চলে।

কালিদাসের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের। তাঁর ভাষা শুধু ভাবের বাহন মাত্র নয়, তার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ইহাতে কবি ও পাঠকের অন্তরের ভিতর সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সে সেতুর ভিতর কারুকার্য্য আছে। পাঠক শুধু কবির অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁর অনুভূতির স্বাদ লাভ করেন না, পথে চলিতে সে পথের শোভাটুকুও তাঁর চোখে লাগে। বাল্মিকী যেখানে সোজা পথ কটিয়া গিয়াছেন, পথের রেখাটির অনাড়ম্বর সরলতা ছাড়া অন্য কোন সৌষ্ঠবের আয়োজন করেন নাই, কালিদাস সেখানে একটি বিচিত্র তোরণ চারুচিত্রাঙ্কিত কুসুমাস্তরণে শোভিত করিয়াছেন। বাল্মিকীর কবিতা যেন একটা অনাড়ম্বর বিবাহের আসর, যেখানে অনবদ্যা কন্যালাভই একমাত্র আনন্দের উপাদান। কালিদাসের আসরে যেন তার পাশে গান বাজনার আয়োজন আছে, ভূরিভোজনের যোগাড় আছে। তবে কালিদাস ও বাল্মিকীর মধ্যে আর একটা প্রভেদও আছে। রামায়ণের

রসাস্বাদনের জন্য প্রয়োজন শুধু অনুভব-শক্তির; কালিদাসের রসাস্বাদনের অধিকার আছে শুধু পণ্ডিতের। তবু যে অধিকারী তার পক্ষে কালিদাসের কবিতার অন্তরে প্রবেশ করিতে কোন অন্তরায় নাই, তাঁর ভাষা পথ আগলাইয়া দাঁড়ায় না; রসিকের যাত্রাপথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বন্দীর মত সে পথ সঙ্গীতে মুখরিত করিয়া তোলে, নিজের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু পথ আটকায় না। মাঘের কাব্যের ভাষাটা আরও বেশী ঘোরাল। সে শুধু কবি ও শ্রোতার মধ্যে সম্বন্ধ-পথ অলঙ্কৃত করিয়া সন্তুষ্ট নয়; তার মাঝ পথে একটা রত্নখচিত তিরস্করণীর মত পথ আগলাইয়া আছে, তাকে অবহেলা করিয়া যাওয়া চলে না, কিন্তু তাতে বাধাও জন্মে না। দুদণ্ড তার শোভার দিকে চাহিতে হইবে, এই বিচিত্র ব্যূহ-কৌশল ভেদ করিয়া তার কেন্দ্রের রত্ন আহরণ করিতে হইবে।

কিন্তু জয়দেবের কবিতার ভাষা কবি ও পাঠকের ভিতর দরোয়ানের মত দাঁড়াইয়া আছে। ভাষাকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাবের কুঠুরীতে প্রবেশ করে কার সাধ্য? বাল্মিকী বা কালিদাসের তুলনায় জয়দেবের ভাবের যেমন দৈন্য, ভাষার ছটা তেমনি অধিক। ভাষার লালিত্য ও অলঙ্কার চিত্তকে এমন পরিপূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় যে, ভাবের কোঠায় কতটুকু পুঁজি আছে সে খবর লইবার অবসর পাঠকের আদৌ হয় না।

ভাবের ঐশ্বর্য্যই কবিতার গৌরব; ভাষা তাহার বাহন মাত্র। তবু ভাবকে ভাষায় ফুটাইতে গিয়া কল্পনাকুশল কবির চিত্তে আনুসঙ্গিক ভাবে আরও কতকগুলি ভাব ফুটিয়া উঠে। রূপকাদি ভাবালঙ্কারে ভাবের বিকাশ অলঙ্কৃত হইয়া উঠে।

কবির ভাবের ঐশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে। সুকবির হাতে সে অলঙ্কার তার মুল ভাবের রসবৃদ্ধি করে, তাহার কোনও হানি করে না। কিন্তু অলঙ্কারের বিপদ এই যে তার শোভা অনেক সময় অলঙ্কতের সৌষ্ঠবকে আবৃত করে। পটু আর্টিষ্ট অলঙ্কার গুলির সুনিপুণ বিন্যাসে অলঙ্কতের রূপ বাড়ান, কিন্তু যে শুধু কারিগর, আর্টিষ্ট নয়, সে মসগুল হইয়া যায় অলঙ্কারের কারিগরিতে, সমগ্র বস্তুটির রূপের সঙ্গে সমন্বয় না করিয়া সে অলঙ্কারের পর অলঙ্কার চাপাইয়া যায়, সেই অলঙ্কারের ভিতর অশেষ কারচুপি করিয়া যায়, কিন্তু তাতে অলঙ্কতের রূপ বাড়ে না, চাপা পড়িয়া যায়। জয়দের ছিলেন এই শ্রেণীর কারিগর। জয়দেবের ভিতর কবিত্ব ছিল। তাঁর কাব্যের অনেক স্থানে প্রকৃত কবিত্বের আস্বাদ আমরা পাই, কিন্তু গীত-গোবিন্দের অধিকাংশ স্থলে শব্দালঙ্কারের সূক্ষ্ম কারিগরির উপর তাঁর এত বেশী দৃষ্টি যে তার চাপে ভাব মারা গিয়াছে। অনেক স্থলে অলঙ্কারগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে তার ভিতর কবিত্বের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

কবিচিত্ত আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় সহজ ভাবে যাহা সৃষ্টি করে, অলঙ্কার সেখানে রসের সমৃদ্ধি সাধন করে।—যেখানে ভাষা ভাবের সহজ বাহন সেইখানেই তাহা সার্থক, কিন্তু যেখানে তার ভিতর চেষ্টার পরিচয় পাই, সেইখানেই কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। কবির ভাব ও তার প্রকাশের ভিতর যেখানে এই চেষ্টার ব্যবধান থাকে সেইখানেই কাব্য রসিকের পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে। যদি তাহা না হয়, কাব্য যদি কবিচিত্তের সহজ প্রকাশ হয়, তবে সে প্রকাশের উপাদান নিরাভরণই হউক বা সালঙ্কারই হউক তাহা সুন্দর হইবে। যে কবি মূল ভাবের ঐশ্বর্য্যে ভরপুর হইয়া অনাড়ম্বর আন্তরিকতার সহিত তাঁর

ভাব প্রকাশ করেন, তাঁর কবিতা সুমধুর হয় আন্তরিকতার গুণে। যে কবির কল্পনার সমৃদ্ধি প্রকাশের মুখে স্বভাবতঃ নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া উঠে তাঁর রচনাও সুন্দর ও সমৃদ্ধ হয়। তাজমহলের সূক্ষ্ম অলঙ্কারবহুল রূপ সকলকে মুগ্ধ করে, কিন্তু নাগিনা মসজিদের বিরলাভরণ সৌন্দর্য্যও তুচ্ছ নহে। যারা আর্টিষ্ট নয়, শুধু কারিগর, তাহাদের হাতের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবহুল অনেক সৃষ্টি দেখা যায় যাহা সমগ্র ভাবে একেবারে নিরর্থক। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ রাজমিস্ত্রীদের পরিকল্পিত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বহুল অনেক বাড়ী দেখিয়া এই কথাটাই মনে হয় যে ইহারা কারিগর—আর্টিষ্ট নয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার রূপটা কেমন হওয়া উচিত, কোন্ রূপটা ভাল, ইহা লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। যাঁরা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁরা সব সময় সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে এই সরল সত্যটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অনেক সমালোচক ভাষার প্রধান স্রষ্টাদের তুলনা করিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কার আদর্শটা বেশী সুন্দর, কোন্‌টা ভবিষ্যৎ সাহিত্যের আদর্শ হওয়া উচিত।

স্কুলে ছাত্রদের ভাষা শিক্ষা দিতে এরূপ বিচারের অনেকটা সার্থকতা আছে, কিন্তু সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করিবেন তাঁদের ভাষার নমুনা এমন করিয়া ছকিয়া দিবার চেষ্টা যেমন স্পর্দ্ধিত, তেমনি নিরর্থক। যাঁরা এমন চেষ্টা করেন, তাঁরা ভুলিয়া যান যে, যাঁর প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টির অধিকার থাকিবে তিনি ষোল আনা পরের ভাষায় কথা লিখিতে পারিবেন না। কবির ভাষা তাঁর বিশিষ্ট চরিত্র ও কল্পনার ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, তাহার ভিতর স্বাতন্ত্র্য থাকিবেই। তা' ছাড়া আর একটা কথা ইহাঁরা হিসাবের ভিতর আনেন না যে,

ভাষার ভালমন্দ বিচারের ভিতর মামুলের অনেকটা বিশিষ্ট অধিকার আছে। বেশ ভূষার যেমন ফ্যাসান আছে,—একদিন যেটা লইয়া হৈ চৈ পড়িয়া যায়, আর একদিন সেটা যেমন তুচ্ছ হইয়া পড়ে,—ভাষার ভঙ্গী সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। একদিন ইংলণ্ডে Enphues এর ভাষার কি রেওয়াজই হইয়াছিল!—স্বয়ং সেক্সপিয়ার পর্য্যন্ত তার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পান নাই।

যিনি কবি, যিনি স্রষ্টা, তাঁর মুখে সহজে যে ভাষা আসে সেই তাঁর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ভাষা; তার ভিতর দিয়াই তাঁর প্রতিভা সার্থকতা লাভ করিতে পারে, কোনও ধার-করা ভাষায় তার সার্থকতা লাভ হইতে পারে না। কোন্ ভাষা সুন্দর সেটা ভাষার প্রকৃতি বা অলঙ্কারের উপর যতটা নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশী নির্ভর করে লেখকের উপর। ভাষার যে ধারা ধরিয়া লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন কবি সেই ভঙ্গীর অশেষ শক্তির পরিচয় দেন, সেই ধারাই অনুকারীর হাতে পড়িয়া নিবর্বীর্য্য ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে—এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ভাষার প্রাণ যে শুধু শব্দে নয়, এই কথাটা আমরা স্মরণ করি না বলিয়াই প্রতিভাবান লেখকের ভাষার বাহ্য লক্ষণগুলি দিয়া তাঁর শক্তির উৎস নির্ণয় করিবার চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা প্রমথ চৌধুরীর ভাষার শক্তি বা উৎকর্ষ বাহ্য লক্ষণের গুণ নয়—তাঁদের প্রাণের গুণ। এঁদের বিশিষ্ট শক্তি ও চরিত্র এই ভাষায় সহজে প্রকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়াই এ ভাষা সুন্দর, সমৃদ্ধ—শক্তিমান। ভাব যাহাতে সুন্দর ও শক্তিমান হইয়া প্রকাশ হয় তাহাই ভাষা। তার শুধু একটা বাঁধা পথ নাই—বহু পথ আছে। প্রত্যেক শক্তিমান লেখক তাঁর আপন ধারা খুঁজিয়া বাহির করেন।

অনেক পণ্ডিত তর্ক তুলিয়াছেন যে সাহিত্যের ভাষা কথ্য ভাষা হইবে, না একটা পোষাকী ভাষা হইবে—সংস্কৃতবহুল হইবে, না সংস্কৃতবর্জ্জিত হইবে—তার ক্রিয়াপদগুলির স্বরূপ কথ্যভাষার মত হইবে, না বিদ্যাসাগরী ভাষার মত হইবে? কিন্তু এ তর্কের কোনও মানে নাই।

ভাষার ভিতর শক্তির আকর যতগুলি আছে সবগুলি কোনও লেখকই কাজে লাগাইতে পারেন না। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভা ও চরিত্র অনুসারে তার মধ্যে এক বা একাধিক উৎস হইতে শক্তি সংগ্রহ করেন।

আর শক্তির আকর ছড়ান আছে চারিদিকে। সংস্কৃত ভাষা ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বহু উপাদান আছে যার সুনিপুণ প্রয়োগে ভাষার অশেষ শক্তি ও সমৃদ্ধি হইতে পারে। সংস্কৃত শব্দসম্পদের অপটু প্রয়োগে যেমন ভাষা আড়ষ্ট হইয়া যায়, তার নিপুণ প্রয়োগে যে তাহা তেমনি শক্তিমান হইতে পারে, বর্ত্তমান যুগে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিয়াছেন তাঁরাই যাঁরা কথ্যভাষার সব চেয়ে বড় ভক্ত—রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। প্রমথবাবুর ভাষার ভিতর হইতে শক্ত সংস্কৃত কথাগুলি ছাটিয়া ফেলিলে যাহা থাকে, তার পরিমাণ খুব বেশী নয়. অপ্রচলিত অনেক সংস্কৃত কথা তিনি বিপুল শক্তিও রস সমৃদ্ধির সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখার ভিতর পদে পদে সংস্কৃত কাব্য ও উপনিষদের ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাব এতটা সুস্পষ্ট যে তার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন।

আবার আর এক দিকে, চলতি কথার ভিতর যে কত অসংখ্য শক্তি ও রসের কেন্দ্র ছড়ান রহিয়াছে তার যথেষ্ট পরিচয় বাঙ্গলা

সাহিত্য আজও ভাল করিয়া পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথবাবু এই শক্তির ভাণ্ডার হইতে উপাদান আহরণ করিয়া অনেক ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত দেশবাসীর আটপৌরে জীবনের সমস্ত রস যে ভাষার ভিতর সঞ্চিত আছে, তার রসের সাগরের ভিতর এঁরা দু'চারটা ডুবুরী বইত কিছুই নন! আমাদের চল্‌তি ভাষা বিশিষ্ট-ভাবে অনুশীলন করিলে ইহার চারিধার হইতে যে কত রাশীকৃত হীরার টুকরা খুঁটিয়া বাহির করা যাইতে পারে, তার আর একটা সামান্য পরিচয় দিয়াছেন শৈলজানন্দ। গ্রাম্য লোকের ভাষার প্রাণটাকে নিবিড় ভাবে আয়ত্ত করিয়া তাহা হইতে রসের প্রচুর উপকরণ তিনি বাহির করিয়াছেন।

সংস্কৃত ও চল্‌তি ভাষা দুয়ের বাহিরেও কথার রসসঞ্চারের যথেষ্ট উপকরণ পড়িয়া আছে, শক্তিমান সাহিত্যিক তাহা হইতে অশেষ সম্পদ সংগ্রহ করিতে পারেন। আরবী ও ফারসী কথায় যে ভাষা কতদূর সমৃদ্ধি ও লালিত্য লাভ করিতে পারে তার পরিচয় উর্দ্দু ভাষা ও সাহিত্য। আর আজকার দিনে, শুধু আরবী ফারসী কেন, ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি জগতের সমস্ত ভাষার ভিতর রস-সঞ্চারের উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

অনেকের বিশ্বাস, বিদেশীয় ভাষা হইতে কথা বা কথার ভঙ্গী সংগ্রহ করিলে বাঙ্গলায় সেটা বিসদৃশ হইয়া পড়িবে। ইংরাজী-নবিসের লেখা বাঙ্গলার ভিতর শুধু ইংরাজীর ভাষান্তর করিয়া লেখা যে সব অদ্ভুত কথা অনেক সময় দেখা যায় তাহাই এ সম্বন্ধে চরম প্রমাণ বলিয়া সকলে মনে করেন। কিন্তু এ সব অদ্ভুত উদাহরণ কেবল রচয়িতার অক্ষমতার পরিচয় দেয়, বিদেশী ভাষা

হইতে শব্দ বা ভঙ্গী বা পদযোজন বা imagery যে বাঙ্গলায় চালান যায় না ইহাতে তাহা প্রমাণ হয় না। যার শক্তি আছে তার হাতে বিদেশী ভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহে ভাষার যে শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে তার বহু পরিচয় রবীন্দ্রনাথের লেখায় আছে। ইংরাজী ভাষায় কথার বা পদযোজনার ভঙ্গী বা imagery রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় যত আহরণ করিয়াছেন তত বোধ হয় আর কেহ করেন নাই। আর আরবী ও ফারসী লব্‌জ্‌ যদি হিন্দুস্থানী ভাষায় এমন শক্তি ও সৌষ্ঠবের আকর হইতে পারে তবে বাঙ্গলায় তাহা হইতে না পারিবার কোনও হেতু নাই। সম্পূর্ণ বেমানান ভাবে আরবী বা ফারসী কথা জুড়িয়া দিলে রচনা কিম্ভূতকিমাকার হইতে পারে; কিন্তু ভাষার প্রাণ ও সুরের সঙ্গে যার সম্যক পরিচয় আছে, আহৃতের সমীকরণের শক্তি যাঁর আছে, সে লেখক যে আরবী ফারসী শব্দ অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করিয়া ভাষার সৌষ্ঠব হানি না করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন, তার পরিচয় দিয়াছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, আর আজকাল কবি নজরুল ইস্‌লাম ও মোহিত লাল। তাছাড়া শব্দগুলি অবিকৃতভাবে আহরণ না করিয়া ও বিদেশীয় ভাষার ideology বাঙ্গালাভাষায় আত্মসাৎ করিলে তাতে রসের সমৃদ্ধি অনায়াসে সাধিত হইতে পারে। বাহির হইতে ভাষার সম্পদ সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়া যে তাহা নিজস্ব করিয়া লইতে পারে সেই ইহা হইতে তার ভাষায় রস সঞ্চার করিতে পারে। যে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, বিদেশীয় শব্দ বা পদযোজনারীতি যে আপনার করিয়া লইতে পারে না, শুধু চেষ্টা করিয়া অনুকরণ করে, তারই লেখায় ইহা বেমানান ও অশোভন হইয়া দেখা দেয়।

শক্তিমান লোকের হাতের গোড়ায় চারিধারে ছড়ান আছে ভাষার রস ও সমৃদ্ধির অজস্র উপাদান। এই অফুরান ভাণ্ডার

হইতে নিজ নিজ শক্তি ও সাধনা অনুসারে তাঁরা উপকরণ সংগ্রহ করেন। সংস্কৃত ভাষার ভিতর ডুবুরী হইয়া না নামিলে কিছুতেই ভাষা সুরসাল হইবে না, একথা যেমন অসত্য, বাঙ্গলার চল্‌তি ভাষা ভিন্ন অপর কোথাও এত রসের বাহুল্য পাওয়া যাইবে না, একথাও তেমনি অসত্য। ভাষাটা শক্তিমান বা রসভূয়িষ্ট হইবে কি না, তাহা নির্ভর করে লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর। লেখক যদি শক্তিমান হন তবে তিনি বিচিত্র রস সৃষ্টি করিতে পারিবেন, তার শব্দের পুঁজি সংস্কৃত হইতেই আসুক, আর চল্‌তি কথা হইতেই আসুক বা আরবী ফারসী হইতেই আসুক।

সংস্কৃতঘেঁসা বাঙ্গলা ও চল্‌তি বাঙ্গলার কল্পিত বিরোধ লইয়া এই যে তর্ক ইহা খুব নূতন নয়, আর প্রকৃত প্রস্তাবে তর্কটা প্রথম যে এদেশেই উঠিয়াছে এমনও নয়। বিরোধটা সংস্কৃত ও চল্‌তি ভাষায় নয়, বিরোধ দুটি ভিন্ন style লইয়া। আর এ তর্ক চলিয়া আসিতেছে নানা দেশে, সকল যুগে, সুদূর অতীত কাল হইতে। সে কালের গ্রীসের সাহিত্যে এ বিরোধ দেখিতে পাই ইউরিপিডিস্‌ ও আরিষ্টফেনিস্‌ এর যুগে। ইস্কাইলাসের ভাষা ছিল গুরুগম্ভীর, বড় বড় কথা, গালভরা বিশেষণ, আর জটিল অলঙ্কার ছিল তার আভরণ। ইউরিপিডিস্‌ এই সব আভরণকে কৃত্রিম বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁর সময়ের সহজ চল্‌তি কথায় সাদামাঠা ভাবে তাঁর নাটক লিখিয়াছিলেন। হোমারের দেব-দেবী ও দেব-মানবদের লইয়া নাটক লিখিয়াছেন ইস্কাইলাস্‌; ইউরিপিডিস্‌ এই সব অতিমানবদের বাতিল করিয়া সহজ নরনারী লইয়া নাটক লিখিয়াছেন চল্‌তি সরল ভাষায়। এই লইয়া সেকালে যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল তার একটা চিত্র আরিষ্টফেনিসের Frogs এ আছে।

ইস্কাইলাস ও ইউরিপিডিসের তর্কের ভিতর যে সমস্যা দেখিতে পাই, সেই সমস্যাই দেশে দেশে, নানা যুগে, নানা ভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। নানা যুগে নানা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্যা লইয়া সাহিত্যিকেরা দল বাঁধিয়াছেন। তাঁহাদের ঝগড়া শুধু ভাষার আকার লইয়া নয়, সাহিত্যের দ্বারা ভাব প্রকাশের সমগ্র প্রণালী লইয়া। একদল প্রাচীন-পন্থী আর একদল নূতন-পন্থী, একদল সাহিত্যের ভাব ও ভাষার কঠোর ভব্যতা ও নিয়মের পক্ষপাতী, আর একদল নিয়ম ভাঙ্গিয়া সাহিত্যে সহজ জীবনের প্রকাশের পক্ষপাতী; এক দল কঠোর নিষ্ঠা ও সাধনা দ্বারা ভাষার ও কল্পনার ভিতর একটা চাঁচাছোলা সুসংস্কৃত সৌষ্ঠবের পক্ষে, আর এক দল তার ভিতর জীবনের স্বচ্ছন্দলীলা ফুটাইয়া তোলার পক্ষে। সাহিত্যে যুগে যুগে বিভিন্ন আকারে এই যে প্রকাশভেদ লইয়া তর্ক—ইহার মূলে আছে মানুষের চরিত্রের ভিতর একটা প্রকাণ্ড ভেদ।

মানুষের জীবন, প্রাণ ও শাসনের—উচ্ছ্বাস ও নিয়মের সমবায়। প্রাণ ছাড়া কালচার বা আর্ট কিছুই হয় না। কিন্তু নিয়ম ছাড়া প্রাণ সুন্দর বা সৌষ্ঠবযুক্ত হয় না। মানুষের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁরা স্বভাবতঃ প্রাণটাকে গৌণ ও নিয়মকে প্রধান বলিয়া গণ্য করেন, আবার আর একদল আছেন যাঁরা নিয়মের চেয়ে প্রাণকে বড় করেন। এই প্রভেদ হইতে সাহিত্যে, আর্টে, সঙ্গীতে যুগে যুগে বিভিন্ন আকারে যে মতবিরোধ দেখা দেয় তাকে এক কথায় ক্লাসিক বা রোমাণ্টিকের বিরোধ বলিয়া প্রকাশ করা যায়। ক্লাসিসিজ্‌মের ঝোঁকটা নিয়মের দিকে, সনাতন বিধিনিষেধে বাঁধা বিকাশপন্থার দিকে; রোমাণ্টিসিজ্‌মের ঝোঁক প্রাণের দিকে, প্রাচীন নিয়মের বন্ধন ভাঙ্গিবার দিকে।

ক্লাসিক ও রোমাণ্টিকের এই বিরোধ ইউরোপের কালচারের ইতিহাসে নানাস্থানে নানাভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মূলের কথাটা আরও ব্যাপক। ইহা শুধু আর্টের বিকাশ-প্রণালীর বিষয়ে বিশিষ্ট মতান্তরে নিবদ্ধ নয়, ইহা আর্টের সাধনায় সমস্ত ইতিহাসব্যাপী। এই একই বিরোধ নানা স্থানে নানা আকারে দেখা দিয়াছে। ল্যাটিন ফ্রেঞ্চ ছাড়িয়া চসার যখন ইংরাজী লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁর চেষ্টার ভিতর ও দেখিতে পাই ক্লাসিসিজমের বিরুদ্ধে রোমাণ্টিসিজমের এই বিদ্রোহ। সংস্কৃত ছাড়িয়া পালির আবির্ভাব, সংস্কৃত ও ইংরাজী ছাড়িয়া বাঙ্গালায় সাহিত্য রচনা—এ সবই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রাণের বিদ্রোহের পরিচয়।

সকল দেশের সব সাহিত্যের ভিতরই প্রাণের সঙ্গে পদ্ধতির এই বিরোধ যুগভেদে বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু এই বিরোধের গোড়ার কথা তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ইহার মূলে আছে মানুষের জীবন ও ভাষার ভিতরকার গতি ও বৃদ্ধি। ভাষা একটা সজীব পদার্থ, ইহার একটা স্বাভাবিক গতি ও বৃদ্ধি আছে। ভাষার এই সহজ পরিণতির ইতিহাস সুধু সাহিত্যের ভিতর আবদ্ধ নয়, ইহা সাহিত্যের বহির্ভূত সমাজের জীবনের একটা প্রকাশ মাত্র। ব্যক্তির জীবনের মত সমাজের জীবনও একটা অবিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনের স্রোত। সমাজের জীবনের পরিণতি মুখে তার প্রতি অঙ্গ, প্রতি রীতি ও অভ্যাস যেমন ক্রমে বদলাইয়া যায়, লোকের মুখের ভাষাও তেমনি বদলায়। একযুগে যে ভাষা লোকের ভাব-প্রকাশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত আর একযুগে তাহা হয় নিতান্ত অপ্রচুর—তাই সমাজ তার জীবনের প্রয়োজন অনুসারে ভাষাকে বাড়াইয়া

কমাইয়া বদলাইয়া লয়। চল্‌তি ভাষায় এই যে পরিণতির স্রোত, সাহিত্যে তার ভিতর অল্প বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে সত্য, কিন্তু বেশীর ভাগ পরিবর্ত্তনটা হয় সাহিত্যের বাহিরে। প্রায়ই এমনি হয় যে সমাজের জীবনে ও ব্যবহারে একটা নূতন ধারার ব্যবহার সম্পূর্ণ সমীকৃত হইয়া গেলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পায়। তবে বিশেষ প্রতিভাবান সাহিত্যিকের লেখার ভঙ্গী ও অনেক সময় চল্‌তি ভাষার ভিতর স্থান পাইয়া যায়।

মোটের উপর একথা বলা যায় যে লোকসমাজে ভাষার পরিবর্ত্তন যতটা হয়, সাহিত্যের ভিতর পরিবর্ত্তনটা তত দ্রুত হয় না। কেন না সাহিত্য যত কেন স্বচ্ছন্দচারী হউক না, তার ভিতর নিয়মের শাসন অনেকটা থাকিয়া যায়—কিন্তু লোকের জীবনে কথাবার্ত্তার ভিতর অতটা বাঁধা বাঁধি কোন দিনই হয় না। সাহিত্য চলে অনেক পরিমাণে আদর্শ অনুকরণ করিয়া—প্রশংসিত সাহিত্যের অনুসরণ করিয়া তার পদ্ধতি রীতির ঘাট বাঁধা হইয়া যায়; কিন্তু চল্‌তি কথার কোন বাঁধা ঘাট নাই, লোকের সহজ সুর-বোধই তার একমাত্র নিয়ামক। এই চল্‌তি ভাষা যত বদলায়, সাহিত্যেয় ভাষা তত বদলায় না।

যুগে যুগে ভাষার আকার লইয়া যে বিরোধ দেখিতে পাই—ক্লাসিক ও রোমান্টিকের যে বিরোধ নানা আকারে নানা যুগে দেখিতে পাই, এই ব্যাপার হইতেই তার উৎপত্তি হয়।

আদি কবি যখন সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন তিনি একটি পোষাকী ভাষা মাথা হইতে বাহির করেন নাই! তিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁর যুগের যেটা চল্‌তি ভাষা সেই ভাষায়। চল্‌তি

ভাষাকে তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া গড়িয়া পিটিয়া তিনি তাঁর ভাবের বাহন করিয়াছিলেন।

তারপর যারা লিখিল তারা তাঁর ভাষাকে আদর্শ করিয়া অল্প বিস্তর তার অনুকরণ করিয়া গেল। এমনি করিয়া সাহিত্যের ভাষার একটা পদ্ধতি দাঁড়াইয়া গেল, তার ব্যাকরণ, অভিধান ও অলঙ্কারের শাস্ত্র গড়িয়া উঠিল।

বাল্মিকী যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি যে ভাষায় লিখিয়াছিলেন তাই ছিল লোকের প্রাণের সহজ ভাষা। একটু চাঁচাছোলা একটু 'সংস্কৃত', কিন্তু মূলে সে ছিল লোকেরই ভাষা। কালিদাস যখন লিখিয়াছিলেন, তখন সংস্কৃত সাধারণের চল্‌তি ভাষা ছিল না—চলিত ভাষা ছিল প্রাকৃত, কিন্তু তখনও সংস্কৃত ছিল ভদ্রের ভাষা, কালচারের জ্যান্ত ভাষা; তা ছাড়া কালিদাসের যুগের প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার পার্থক্য যথেষ্ট থাকিলেও প্রাকৃতভাষীর পক্ষে সংস্কৃতের তাৎপর্য্য গ্রহণ খুব কঠিন ছিল না; কেননা উভয় ভাষার ভিতর প্রভেদটা তখনও খুব প্রকাণ্ড ছিল না। জয়দেব যখন লিখিয়াছিলেন তখন তাঁর আটপৌরে ভাষা ছিল সে কালের বাঙ্গালা, যার সঙ্গে সংস্কৃতের জ্ঞাতিত্ব কুরসীনামা না দেখিয়া বোঝাই যায় না। বাল্মিকীর সংস্কৃত তাঁর সহজ ভাবানুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। কালিদাসের যুগে প্রাকৃত তার অধিকার প্রচার করিলেও ভদ্রসমাজের পক্ষে সংস্কৃত ছিল সহজ ভাবপ্রকাশের ভাষা। তাই বাল্মিকী বা কালিদাসের কবিতা সংস্কৃত হইলেও তাহাতে স্বচ্ছন্দ ও সহজভাবে ভাবপ্রকাশের বাধা হয় নাই; কিন্তু জয়দেবের সংস্কৃত কৃত্রিম, চেষ্টাকৃত—তাহা তাঁর ভাবস্ফুর্ত্তির সহজ বাহন নয়। জয়দেব চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা তাঁর কৃত্রিম

ভাষায় এমন একটা লালিত্য সঞ্চার করিয়াছেন যে, তার কৃত্রিম ভাবটা অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু ভাষার সঙ্গে ভাবের অন্বয় করিয়া দেখিলে এই কৃত্রিমতা সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে।

ভাষাটা যতক্ষণ ভাবের সহজ অভিব্যক্তি থাকে, ততক্ষণ তাহা অলঙ্কৃত হউক বা নিরলঙ্কারই হউক, সংস্কৃতই হউক আর অসংস্কৃতই হউক, তাহা সাহিত্যের ভাষা হইতে পারে।

সকল সাহিত্যের গতি অনুশীলন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সাহিত্যের গতি সহজে চলতি ভাষার ব্যাকরণ অভিধান ও ভাবপ্রকাশের রীতির দিকে। এক আধটা গুরুতর সন্ধিস্থলে সাহিত্যের ইতিহাসে এই গতিটা একটা তীব্র প্রতিবাদ লইয়া হাজির হয়, তখন বিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠে; কিন্তু তাছাড়া সহজ ও অনমুভূতভাবে এই গতি নিরন্তর চলিয়াছে। সাহিত্য নিয়ত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে জীবন্ত সমাজের প্রাণের অভিব্যক্তি যে চল্‌তি ভাষা তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া। ইহা হইতেই যুগে যুগে সাহিত্য সজীব পরিণতি লাভ করিতেছে।

কিন্তু এ কথা বিশদভাবে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না।

ইতিহাস-শাখার সভাপতি—

শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এচ-ডি,

মহাশয়ের অভিভাষণ।

বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাস-চর্চ্চা

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইতিহাস-বিদ্যা ভারতবর্ষে আদর ও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ খণ্ডে আমরা সর্ব্বপ্রথম ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। পরবর্ত্তিকালে শতপথব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য-উপনিষদ্, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, শাংখায়ন শ্রৌতসূত্র প্রভৃতিতে ইতিহাস বিশিষ্ট বিদ্যাসমূহের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ, গোপথ-ব্রাহ্মণ ও শাংখায়ন শ্রৌতসূত্র ইতিহাসকে বেদ আখ্যা প্রদান করিয়াছে এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণ স্পষ্টতঃ পঞ্চম বেদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে যজ্ঞের হোতা প্রতিদিন একটি করিয়া দশদিনে দশটি বিশেষ বিদ্যার বিষয়ে আলোচনা করিতেন। সারা বৎসর ধরিয়া এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে যে দশটি বিদ্যার পুনঃ পুনঃ আলোচনা হইত ইতিহাস তাহার অন্যতম। এই সমুদয় দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে ইতিহাস একটি বিশিষ্ট বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু তৎকাল প্রচলিত এই 'ইতিহাস' বিদ্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি কি প্রকার ছিল তাহা ঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। পূর্ব্বে যে সমুদয় গ্রন্থের নাম করিয়াছি তাহাতে ইতিহাসের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকিলেও স্পষ্টতঃ ইহার কোন সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং পুরাতন টীকাকারগণ ও বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয়ে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—মাজু

ইতিহাস-শাখার সভাপতি

ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এচ্-ডি

অনেক মতভেদ আছে, সে সমুদয়ের সবিস্তার আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম ইতিহাস বিদ্যার ব্যাপক ও নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কৌটিল্য ঋগ, যজু, সাম, অথর্ব্ব, ও ইতিহাস এই পাঁচটিকে বেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপর ইতিহাসের সংজ্ঞানির্দ্দেশ কল্পে বলিয়াছেন, "পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্ম্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ" অর্থাৎ পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র এই সমুদয় ইতিহাস! কৌটিল্য এখানে ঐ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ সমূহের সমষ্টি, অথবা যে কোনও গ্রন্থে ঐ সমুদয়ের আলোচনা থাকে তাহাকেই ইতিহাসরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা বলা শক্ত। আপাততঃ প্রথমোক্ত অর্থই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দ্বিতীয় অর্থ ও প্রণিধানযোগ্য। কারণ একই গ্রন্থে উক্তরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অসম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভারতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে একাধারে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র সকলেরই আলোচনা আছে।

সে যাহাই হউক ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমরা ইতিহাস বলিতে এখন যাহা বুঝি, কৌটিল্যের যুগে ইতিহাস তাহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ছিল। বর্ত্তমান কালে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যে সমুদয় বিভিন্ন বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তৎকালে ইতিহাসেরই অন্তর্গত ছিল। যাঁহারা বর্ত্তমান সাহিত্য সম্মিলনীর আলোচ্য বিষয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস এই চারিশাখায় বিভক্ত করিয়াছেন, তাঁহারাও ইতিহাসের বর্ত্তমানকাল প্রচলিত ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়া কৌটিল্যের সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে জ্ঞানের গণ্ডী অযথা সঙ্কীর্ণ করিবার অভিযোগ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাস বলিতে আমরা কি বুঝি অথবা কি বুঝা উচিত তাহাও নিরূপণ করা সহজ নহে। ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট বিদ্যার উদ্ভব হওয়ায় ইতিহাস বিদ্যার গণ্ডী ক্রমশঃই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। রাজনীতি (Politics) ও সমাজনীতি (Sociology) ইতিহাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তত্ত্বালোচনা হিসাবে ভিন্ন বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। এখন জাতি বা সমাজ-বদ্ধ মনুষ্যের কার্য্যকলাপ আলোচনাই ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ইহার পরিধি সংকীর্ণ ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে করিলেও, অন্যদিক দিয়া দেখিলে বর্ত্তমান ইতিহাস প্রাচীন কালের ইতিহাস-বিদ্যাকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছে। প্রথমতঃ দেশ ও কালের গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া ইতিহাস এখন বিশ্ববিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন কালে নিজের জাতীয় ইতিহাস ব্যতীত অন্য কোন ইতিহাস চর্চ্চা বড় বেশী একটা হইত না, বড় জোর অন্য দেশ সম্বন্ধে কৌতুকপ্রদ ও বিস্ময়কর কাহিনী ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগৃহীত হইত। বর্ত্তমানকালে ইংরাজী, ফরাসী অথবা জার্ম্মাণ-ভাষায় পৃথিবীর সমুদয় জাতির ইতিহাস আলোচনার পরিমাণ দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। যে সমুদয় জাতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অপরিসীম অধ্যবসায় ও অপূর্ব্ব মনীষা সহকারে বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতগণ ঐন্দ্রজালিকের মত পরিত্যক্ত বিচ্ছিন্ন অস্থিখণ্ড মাত্র সংযোজন করিয়া তাহাদের মৃতদেহে নবজীবন সঞ্চারপূর্ব্বক আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে বহু সহস্র বৎসর পশ্চাতে লইয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জগতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যেমন অপরিজ্ঞাত জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার ও নভোমণ্ডল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উৎকর্ষ হইয়াছে, এই নূতন ঐতিহাসিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে তেমনি অতীতের অন্ধকার আকাশ হইতে মিশর, সুমের, আকাড, হিটাইট এবং মধ্য এশিয়ার

ও আমেরিকার অজ্ঞাত ও অন্যান্য বিস্মৃত-প্রায় জাতির বিলুপ্ত কাহিনী জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে আমরা যে কেবলমাত্র নূতন নূতন জাতির ইতিহাস জানিতে পারিতেছি তাহা নহে, যে সমুদয় জাতির ইতিহাস সুপরিচিত ছিল তাহাও নূতন আলোকে নূতন করিয়া দেখিতেছি। যেমন ক্রীট, এশিয়া ও ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে পারায় প্রাচীন গ্রীস সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক ধারণা অনেকাংশে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমান ইতিহাস যে কেবল দেশ ও কালের সীমা-পরিধি বৃহত্তর করিয়াছে তাহা নহে, ইহা ঐতিহাসিক আলোচনার প্রণালীর সংস্কার করিয়া ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ ও উপলব্ধি করিবার নূতন পথ প্রবর্ত্তন করিয়াছে। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে ইতিহাসের সংজ্ঞা ব্যাপক থাকিলেও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সত্য নির্ণয়ের প্রণালীর প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও দৃঢ় সত্য-নিষ্ঠার একান্ত অভাব ছিল। এই জন্যই জনপ্রবাদ কিংবদন্তী, উপাখ্যান, উপন্যাস ও নৈতিক গল্প প্রাচীন ইতিবৃত্তকারগণের নিকট তুল্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশের ইতিহাস এই সমুদয় বৃহৎ বনস্পতির সুশীতল ছায়ায় জন্মলাভ করিয়াছে, কখনও ইহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া সত্যের তীব্র আলোকের অভিমুখে ধাবিত হয় নাই ; তাই তাহার জীবনীশক্তিও কখনও প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু সত্যের অভাব আমরা কল্পনায় পূরণ করিয়াছি। ভারতবর্ষের বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে আমরা সপ্ত সমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের বিচিত্র উপাখ্যানেও তন্নিহিত দধি, দুগ্ধ, সুরা, সর্পির মধুময় মোহে অভিভূত হইয়াছি এবং প্রকৃত অতীতের অজ্ঞান-তিমির ভেদ করিবার চেষ্টা না

করিয়া লক্ষ নিযুত-কোটি বৎসরের যুগভাগ করিয়া তাহাতে এক একটি মনু প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানবজাতির সংকীর্ণ কয়েক শত বৎসরের কাহিনীকে কৃপামিশ্রিত উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এইরূপে আমরা ইতিহাস বলিতে এখন যাহা বুঝি ভারতবর্ষে তাহা গড়িয়া ওঠে নাই এবং ভারতবর্ষের বাহিরের কোন দেশের সম্বন্ধে ভারতবর্ষে সত্যলব্ধ কোন জ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই না। যে হিসাবে গ্রীস, রোম ও চীনদেশের ইতিহাস আছে সে হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই। গ্রীস্, রোম, চীন ও আরবজাতি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছে, ভারতবর্ষে কিন্তু এই সমুদয় অথবা অন্য কোন জাতির তথ্য লিপিবদ্ধ হয় নাই। আমাদের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে জ্ঞানের নানা বিভাগে উন্নতিলাভ করিলেও আমাদের পূর্ব্বপিতামহগণ ইতিহাস বিদ্যায় সমসাময়িক প্রাচীন জাতিগণের সকলের পশ্চাতে।

কিন্তু কেবল পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্যই এই সমুদয় অপ্রীতিকর কথার অবতারণা করি নাই। সর্ব্বাপেক্ষা গভীর দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, যে সমুদয় কারণে প্রাচীন কালে আমাদের দেশে ইতিহাস বিদ্যা প্রসার লাভ করিতে পারে নাই, সহস্র সহস্র বৎসর পরে আজিও আমাদের জাতীয় জীবনে সে সমুদয় কারণই বিদ্যমান। আমাদের অতীত ইতিহাস সত্য করিয়া জানিবার আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও সাহস এখনও আমাদের জাতীয় জীবনে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই। এখনও আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে স্বরচিত কাল্পনিক জগতে বিচরণ করিতেই ভালবাসি, নির্ম্মম সত্যের সম্মুখীন হইতে সঙ্কুচিত হই। আমাদের স্বকপোলকল্পিত গৌরব ও কীর্ত্তির

সমর্থন বা মহিমা বর্দ্ধিত করিতে উদ্ভট অনুমান বা অসঙ্গত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করি না। যদি কোন সত্যনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসু কোনও অংশে ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করেন তবে আমাদের সমাজের মহারথিগণ এই সব ম্লেচ্ছ মতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রসাগর মন্থন পূর্ব্বক একাধারে উৎকট পাণ্ডিত্য ও স্বদেশ প্রেমের অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়া দেশবাসিগণের নিকট বাহবা লাভ করেন। পাথরের উপর দাগ বসে না, তাই আমরা পাথুরে প্রমাণকে আভিজাত্যের আসন হইতে দূরীভূত করিয়াছি। অনার্য্য জাতি কর্ত্তৃক এই প্রমাণ প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় স্পর্শদোষে তাহাও অনাচরণীয় হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিহাস আলোচনার কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই যে সংকীর্ণ সমাজ বা ভূখণ্ডে লেখকের জন্ম তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাই এই সমুদয় সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য, সত্য নির্ণয় গৌণ উদ্দেশ্যমাত্র। আমাদের ঐতিহাসিক প্রেরণার মূলে সত্যনিষ্ঠা নাই—আছে সংকীর্ণ স্বদেশ-প্রেম অথবা স্বজাতি প্রেম। বঙ্গসাহিত্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় জাতির এবং বাঙ্গালা দেশে যতগুলি জিলা তাহার অধিকাংশের এবং তদন্তর্গত ছোট ছোট ভূখণ্ডেরও এক বা একাধিক ইতিহাস রচিত হইয়াছে। ফলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ভূখণ্ডের দাবীর বিষয়ীভূত হইয়া পড়ায় অনাবশ্যক জটিল সমস্যা ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। লেখকের জাতি ও বাসস্থান অনুসারে সেন রাজগণ পর্য্যায়ক্রমে বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য ও সদ্‌গোপ জাতিতে জন্মলাভ করিতেছেন এবং তাঁহাদের

রাজধানী কখনও পদ্মার পারে কখনও রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত একখানি সংবাদ পত্রে দেখিলাম সমুদ্র গুপ্তের 'কর্তৃপুর' বর্ত্তমান ঐতিহাসিক ব্যাকরণের নূতন সূত্র অনুসারে 'ত্রিপুরায়' রূপান্তরিত হইয়াছে। কয়েকজন বৈদ্য লেখক মৌর্য্য ও গুপ্তবংশীয় রাজগণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় প্রসিদ্ধ রাজগণকে এবং এমন কি শকাব্দের প্রতিষ্ঠাকারী নৃপতিকেও বৈদ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই সমুদয় ঐতিহাসিক গবেষণার প্রমাণ প্রয়োগ যাহাতে আরও সুলভ হয় তাহার ব্যবস্থাও এই সমুদয় দূরদর্শী ঐতিহাসিকগণ এখন হইতেই করিতেছেন! পুরাণো পুঁথি নূতন করিয়া সৃষ্টি হইতেছে—একখানি 'কায়স্থ-পুরাণ'ও ইতিমধ্যেই রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কালক্রমে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতি যে ইহাকে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্ততঃ উপপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিবে না এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন। তখন শত পাথুরে প্রমাণেও ইহার মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে না।

অবশ্য ইংরাজী শিক্ষিত কয়েকজন বাঙ্গালী ঐতিহাসিক যথার্থ প্রণালী অনুসরণ কয়িয়া প্রকৃত ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহাদের প্রভাব এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। বঙ্গদেশেও সর্ব্বসাধারণের মানসিক বৃত্তির উপর তাঁহাদের প্রভাব বড় বেশী তাহা মনে করিবারও কোন কারণ নাই। আমি যাহা বলিয়াছি দুই চারিটি ব্যতিক্রম থাকিলেও সাধারণভাবে তাহা বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযুজ্য। অবশ্য জাতি বা জিলার ইতিহাস লেখা অন্যায় আমি একথা বলি না—তাহার যথেষ্ট সার্থকতা আছে এবং ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তাহার মূল্য অনেক তাহাও স্বীকার করি, কিন্তু সংকীর্ণ স্বদেশ ও স্বজাতি

বাৎসল্যের পরিবর্ত্তে যদি প্রকৃত সত্য-নিষ্ঠাই কেবলমাত্র এই সমুদয় প্রেরণার পশ্চাতে থাকে তবেই তাহা সার্থক ও কার্য্যকরী হয়। অথচ বঙ্গসাহিত্যে ইহার অসদ্ভাবই পদে পদে লক্ষিত হয়।

ইতিহাস রচনার যথার্থ প্রণালী সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বা অনভিজ্ঞতা, যেমন প্রাচীন কালের মত বঙ্গ-সাহিত্যে পদে পদে পরিলক্ষিত হয়, তেমনি বিশাল বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা ও ঔৎসুক্যের অভাবও যে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যথেষ্ট পরিমাণেই পাইয়াছি, বঙ্গ-সাহিত্য তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। উনবিংশ, বিংশ শতাব্দীতে নূতন করিয়া যে কত প্রাচীন দেশ জাতি ও সভ্যতার আবিষ্কার হইয়াছে বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও শুনা যায় কিনা সন্দেহ। ইউরোপীয় বড় বড় ভাষায় এ সম্বন্ধে কত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার আলোচনা কতটুকু হইয়াছে? প্রাচীন সভ্যতার কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বর্ত্তমান জগতের দিকে তাকাই, তাহা হইলেও অবস্থা খুব আশাপ্রদ মনে হয় না। বিগত যুদ্ধ ও তাহার ফলে যে সমুদয় নূতন রাজ্য, নূতন জাতি, নূতন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ইউরোপে নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে, কেবল বঙ্গ-সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহার কতটুকু সংবাদ পাই? ইংরাজি দৈনিক সংবাদ পত্রের স্তম্ভে যে সংবাদ থাকে তাহার বাংলা অনুবাদ বা চুম্বক ব্যতীত এই সমুদয় সমস্যা সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা ও ভারতবর্ষের জাতীয় সমস্যার দিক হইতে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা বঙ্গ-সাহিত্যে এক রকম নাই বলিলেই চলে। আমাদের দেশে অনেক কৃতবিদ্য শিক্ষিত যুবক আছেন যাঁহারা মূল দলিল-পত্রাদির অভাবে কেবলমাত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির সাহায্যেও এই বিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্যকে সু-সমৃদ্ধ করিতে পারেন।

ইংরাজী ব্যতীত ইউরোপীয় অপর কোন ভাষা যাঁহার জানা আছে তিনি মনে করিলে অনায়াসে অনেক মূল্যবান তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বঙ্গ-সাহিত্যকে উপহার দিতে পারেন। এরূপ শিক্ষিত লোকের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও একেবারে অভাব নাই, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্যই বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্দ্দশার কারণ। বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার ঔৎসুক্য আমাদের প্রাচীন কালেও ছিল না, এখনও বড় একটা নাই।

অন্যান্য সভ্য জাতির সাহিত্যের তুলনায় বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস বিভাগ যে কত পশ্চাৎপদ তাহা আর বিস্তার করিয়া আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে ইহার উন্নতি সাধন করিবার উপায় কি? এ বিষয়ে আমার মন্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। প্রথমতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ অথবা অপর কোন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টায় বঙ্গ-ভাষায় একখনি সর্ব্বাঙ্গীন ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশিত করিতে হইবে। বিগত একশত বৎসরের চেষ্টায় যে উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার একত্র সমাবেশ এবং এই সমস্ত উপাদান ব্যবহার করিবার প্রকৃস্ট বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী কি, তাহা যথাযথভাবে প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। ইহাতে কেবল রাজ-নৈতিক নহে পরন্তু ভারতের প্রাচীন ও মধ্য যুগের সভ্যতার সকল বিভাগেরই আলোচনা থাকিবে। ইউরোপে ঐতিহাসিক আলোচনা ও সত্য নির্ণয়ের যে প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে—যে প্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রাচীন মিসর ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ইতিহাস রচিত হইয়াছে, সেই প্রণালীতেই এই ইতিহাস রচিত হইবে। জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি অথবা প্রাচীন সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান সমর্থনের কল্পনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া কেবলমাত্র সত্য নির্ণয়ের দিকে

লক্ষ্য রাখিয়াই এই ইতিহাস রচিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে আবশ্যক হইলে ঐতিহাসিক কোন স্থির সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তে ঐ সিদ্ধান্তের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে যে সমুদয় প্রমাণ আছে যথাযথ সমাবেশ করাই ঐ গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য হইবে। এই প্রকার গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিহাস রচনার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইবে। এই প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষেই সম্ভব নহে, এই জন্য কোন অনুষ্ঠানকে ইহার ভার লইতে হইবে।

এই প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ বহু ব্যয় ও শ্রমসাধ্য, সুতরাং দরিদ্র বঙ্গদেশে বহু গ্রন্থের প্রচার আপাততঃ সম্ভবপর মনে হয় না। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে মাসিক পত্রের প্রাচুর্য্য আছে, সুতরাং ইহার সাহায্যে ঐতিহাসিক সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। প্রধানতঃ দুই উপায়ে মাসিক পত্র ঐতিহাসিক আলোচনার প্রণালী সুসংস্কৃত করিতে পারেন। নির্ব্বিচারে যে কোন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ গ্রহণ না করা এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের ও গ্রন্থের উপযুক্ত নিরপেক্ষ সমালোচনার ব্যবস্থা করা। এই দুই উপায় যথারীতি অনুসরণ করিলে বঙ্গ-সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনার মূল্য বৃদ্ধি হইবে আশা করা যায়। তারপর বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনার পথও মাসিক পত্রিকার সাহায্যে স্বল্পায়াসেই হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের নানা কলেজে ইতিহাসের যে অধ্যাপকগণ আছেন তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যানুরোধেই বিদেশের ইতিহাসের সন্ধান রাখিতে হয়। তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান ভাণ্ডার কেবল ছাত্রদের জন্যই উন্মুক্ত না রাখিয়া যদি বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকার সাহায্যে দেশবাসির নিকট উপস্থিত করেন, তবে এই আলোচনার পথ সুগম হইতে পারে।

এবিষয়ে প্রধান বাধা এই যে অনেক অধ্যাপকই বাংলা ভাষায় কিছু লিখিতে কুণ্ঠা বোধ করেন এবং অনেক স্থলে স্পষ্টতঃ ঐ বিষয়ে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। বিদেশীয় ভাষায় লিখিতে পারি কিন্তু মাতৃ-ভাষায় লিখিতে পারি না—কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এই প্রকার স্বীকারোক্তি যে কতটা জাতীয় অবনতির পরিচায়ক তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। জাতি দুর্দ্দশার কোন্ স্তরে উপনীত হইলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই প্রকার উক্তি করিতে লজ্জা বোধ না করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও বোধ হয় আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু অনেক স্থলেই এই অক্ষমতা কাল্পনিক মাত্র, অতি অল্প আয়াসেই ইহা দূরীভূত করা যায়। চিরাগত ঔদাসীন্য ও বিতৃষ্ণা পরিহার করিয়া এই সমুদয় অধ্যাপক ও অন্যান্য ইংরাজী শিক্ষিত ইতিহাসবিদ্‌গণ যদি যথাশক্তি বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি করিতে কৃতসংকল্প হন তাহা হইলে অচিরেই ইহার ঐতিহাসিক জ্ঞানভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। কেবল তাহাই নহে, বহির্জ্জগতের নানা সমস্যা ও তাহার সমাধানের চেষ্টার সহিত পরিচিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির মানসিক শক্তি ও জাতীয় প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে।

বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিহাস আলোচনা যাহা হয় তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে। এই আলোচনা প্রণালীর দোষ ও সংকীর্ণতার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই আলোচনা কোন্ পথে অগ্রসর হইলে বঙ্গ-সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হইতে পারে অতঃপর তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথমেই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও গড়িয়া ওঠে নাই, গঠনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণের

প্রথম অবস্থায় যেমন ইট কাঠ প্রভৃতি মাল মসলার দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিতে হয়, এখনও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ কার্য্যেই স্বভাবতঃ আমাদের মনোযোগ বেশী। এই উপাদান সংগ্রহের নামই প্রত্নতত্ত্ব এবং যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী তাঁহারাই প্রত্নতাত্ত্বিক। কিন্তু উপকরণ সংগ্রহ ও গৃহনির্ম্মাণ এক কথা নহে, সুদক্ষ স্থপতি ভিন্ন শেষোক্ত কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না। এই দুইএর যে সম্বন্ধ, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের সহিত সেই সম্বন্ধ। যিনি গৃহনির্ম্মাণোপযোগী ভাল ইট ও কাঠ তৈরী করিতে পারেন তাঁহাকেই উপযুক্ত স্থপতি বলিয়া নিশ্চিত ধারণা করিলে বিষম ভ্রম করা হইবে। প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক মাত্রেই ঐতিহাসিক নহেন। প্রত্নতত্ত্বের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে তদনুযায়ী শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু সেই শিক্ষা দীক্ষাই ঐতিহাসিকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তাঁহার পক্ষে অন্যবিধ শিক্ষা দীক্ষারও আবশ্যক। এই দুই বিদ্যা পরস্পর বিরোধী তো নহেই, একেবারে বিচ্ছিন্নও নহে। সুদক্ষ স্থপতি ইট কাঠ ভাল কি মন্দ নির্ব্বাচন করিতে না পারিলে কখনও সুদৃঢ় গৃহনির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হন না, সুতরাং ইট কাঠ প্রস্তুত প্রণালী এবং তাহার ভালমন্দ যাচাই করিবার মত জ্ঞান তাঁহার থাকা আবশ্যক। ঐতিহাসিককেও তেমনি প্রত্নতত্ত্বের মূল্য তথ্য গুলি জানিতে হইবে কিন্তু তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এ দুইয়ের শিক্ষা দীক্ষা ও লক্ষ্য যে বিভিন্ন এই কথাটি স্মরণ না রাখায় উভয় ক্ষেত্রেই গোলযোগ হইয়াছে। যিনি তাজমহল কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহাকে যদি উপকরণ সংগ্রহের ভার দেওয়া যাইত, অথবা যাহারা মর্ম্মর প্রস্তর প্রভৃতি কাটিতে সুদক্ষ তাহাদিগের উপরই যদি তাজমহল নির্ম্মাণের ভার পড়িত, তাহা হইলে ফল কি হইত অনুমান করা শক্ত নহে।

কিন্তু বহির্জ্জগতে যাহা প্রত্যক্ষ সত্য, অনেক সময়েই অন্তর্জ্জগতে আমরা তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি না। তাই প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে যিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাকেই ঐতিহাসিক বলিয়া মহাভ্রম করিয়া বসি। সাহিত্যে প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক এ উভয়েরই আবশ্যক আছে, কিন্তু ইঁহারা যদি স্ব স্ব গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হন, তবে সাহিত্যেরও দুর্গতি হয়, তাঁহাদেরও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথা বেশী করিয়া খাটে। ইহার স্বল্পসংখ্যক ভক্ত সেবকের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিকও আছেন ঐতিহাসিকও আছেন। উভয়েরই সংখ্যা অল্প সুতরাং স্ব স্ব সীমার মধ্যে কার্য্য করিলে উভয়েরই বঙ্গ-সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু মূলগত পার্থক্য ভুলিয়া যদি প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার ব্যর্থ চেষ্টায় অথবা শক্তি ও সময় নিয়োগ করেন, তবে ইতিহাসের শ্রীহানি হয়, প্রত্নতত্ত্বের শ্রীবৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। বাঙ্গালার নিভৃত পল্লীতে এবং জনহীন প্রান্তরে অনেক প্রত্ন সম্পদ লুক্কায়িত আছে। সামান্য আয়াস করিলেই অনেকে ইহার বিবরণ প্রকাশিত করিয়া ইতিহাস রচনার পথ সুগম করিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে কয়েকটি সাবধানতার প্রয়োজন। বিবরণ যথাযথ হওয়া চাই— অর্থাৎ যাহা আছে কোনরূপ কল্পনার আশ্রয় ব্যতিরেকে এবং কোনরূপ ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থন বা প্রতিবাদের উদ্দেশ্য মাত্র পরিহার করিয়া তাহারই সত্য বিবরণ দিতে হইবে। অনেকে এই সাবধানতা অমূলক আশঙ্কা বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু মালদহ জেলার অমৌতি নামক গ্রামে রামপালের রাজধানী রামাবতী নির্ণয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালী যে উর্ব্বর কল্পনার পরিচয় দিয়াছে, তাহার পর এইরূপ সাবধানতা অপরিহার্য্য। যাঁহারা এই সমুদয় প্রত্ন-সম্পদ আবিষ্কার করিতে

সমর্থ তাঁহারা অনেক সময়েই কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্বের গণ্ডীতে আবদ্ধ না থাকিয়া তাঁহাদের আবিষ্কারের ক্ষুদ্র ভিত্তির উপর বিরাট ঐতিহাসিক সৌধ নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াস করেন ; ইহাতে ইতিহাসের সাহায্য না হইয়া বিপরীত ফলই প্রসব করে। কারণ তাঁহাদের আবিষ্কৃত প্রত্ন-সম্পদের যেটুকু ন্যায্য মূল্য তাহাও ঐতিহাসিক সৌধের চাপে পড়িয়া নষ্ট নয়। এই বিষয়ে মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা এত বেশী যে অনেক সময় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণও তাহার হাত এড়াইতে পারেন না। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দুইজন সুপ্রসিদ্ধ মহারথীকে ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। স্পুনার সাহেব প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খনন কালে কতকগুলি প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নাংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া ভারতের জরথুস্ত্র যুগের ইতিহাস নামক যে বিশাল ঐতিহাসিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া জগৎকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিলেন, তাহা কয়েক দিনের মধ্যেই জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া তাহার নির্ম্মাতাকে উপহাসের পাত্র করিয়াছিল। ফলে যে প্রত্নসম্পদ স্পুনার সাহেবের ন্যায্য দান তাহার সম্বন্ধেও বহুদিন পর্য্যন্ত এদেশে সুবিচার হয় নাই। প্রত্ন বিভাগের আর এক মহারথী ফুরার সাহেব অনেক প্রত্ন সম্পদের বর্ণনা করিয়াছিলেন যাহা পরে অলীক প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার অবনতির কারণ ঘটাইয়াছিল। সুতরাং যাঁহারা প্রত্ন সম্পদ আবিষ্কার করিতে সমর্থ তাঁহাদিগকে এই সব মোহ কাটাইয়া সত্যনিষ্ঠা সহকারে প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে হইবে।

ঐতিহাসিকের পথেও এইরূপ অনেক বাধা বিঘ্ন আছে। কোন তথ্য প্রতিপাদন কল্পে সুবিধামত উপকরণ নির্ব্বাচন করিয়া যাহা মতের অনুকূল কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণ করিয়া, যাহা মতের

প্রতিকূল তাহাকে অযথা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস সর্ব্বথা পরিহার করিতে হইবে। কোন্ উপকরণ গ্রহণযোগ্য কোন্ উপকরণ গ্রহণযোগ্য নহে তাহার নির্ণয় সাধারণ বিচার-সহ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই করিতে হইবে, ঐতিহাসিকের গরজ অনুসারে নহে। তারপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক উপাদানের রূপান্তর সম্পাদন অথবা নূতন কৃত্রিম উপাদানের সৃষ্টি— তাহা তো আরও ভয়ানক। অথচ এ বাংলা দেশে এ উভয়েরই দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান।

এই সমুদয় ইতিহাস রচনার প্রণালীগত বাধা-বিঘ্ন ব্যতীত ঐতিহাসিকের আর এক প্রবল বাধা বর্ত্তমান। তাহা ঐতিহাসিকের জাতিগত বা ধর্ম্মগত সংস্কার ও বিদ্বেষ। এই বাধা যে কত বড় গুরুতর তাহা আমরা প্রতিপদে অনুভব করিতেছি। যে কোনও হিন্দু প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিতে অগ্রসর হইবেন তাঁহাকেই এই চির-পোষিত বংশগত সংস্কার বা বিদ্বেষ-ভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, অন্যথা তিনি ইতিহাস রচনার অনধিকারী। ইতিহাস রচনার কালে ঐতিহাসিক জাতি, দেশ, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র সত্যকেই ধ্রুবতারা জ্ঞান করিয়া অগ্রসর হইবেন। কিন্তু এই আদর্শ গ্রহণ করা যত সহজ কার্য্যে পরিণত করা ততই শক্ত। এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় সংস্কার কত দৃঢ় ও কত অন্ধ তাহার পরিচয় তো প্রতিদিনই পাইতেছি। মিস্ মেয়ো ভারতীয় নারীর নিন্দা ও কুৎসা করিয়াছেন তাহাতে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রতিবাদের ভীষণ রোল উঠিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসিরা শ্বেত অধিবাসির হস্তে লাঞ্ছিত হওয়ায় আমরা এই অমানুষিক অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। কিন্তু পরম পূজনীয় মহর্ষি মনু তাঁহার

স্মৃতিতে হিন্দু নারীর প্রতি যে দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা চিরদিনের জন্য লেপন করিয়াছেন * অথবা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আর্য্য পিতামহগণ শূদ্র ও চণ্ডালের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার ক্ষীণ প্রতিবাদ ধ্বনি করিলেও অগণিত হিন্দু সমাজ এবং এমন কি তাহার শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও শতকরা ৯৯ জন আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক নানা ব্যাখ্যা দ্বারা আমাদের প্রাচীন ব্যবস্থার সমর্থন করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি এই অন্ধভক্তি ইতিহাস রচনার প্রধান বাধা। ইহার ফলে আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াও স্বচ্ছ হয় না এবং দৃষ্টি দূরদর্শী হইলেও উদার হয় না। প্রাচীন আর্য্যজাতির বংশধর হিসাবে তাঁহাদের গৌরব ও অখ্যাতি এ উভয়কেই তুল্যভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, পক্ষপাতদুষ্ট যুক্তি দ্বারা তাঁহাদের জাতীয় কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টা করিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না এবং আমাদেরও অনিষ্ঠ ব্যতীত ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। কারণ আমাদের জাতীয় দোষগুলির দিকে ঐতিহাসিক আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন তবেই তাহার নিরাকরণ সম্ভবপর হইবে।

অনেকে মনে করেন এবং আমার কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, এই রাজ-নৈতিক সংগ্রামের দিনে ইতিহাসকে তাহার অন্যতম সহায়স্বরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে অর্থাৎ সত্য মিথ্যার দিকে দৃকপাত না করিয়া এমনভাবে ইতিহাস ঢালিয়া সাজিতে হইবে যাহাতে দোষের দিক উপেক্ষা করিয়া প্রাচীন মহত্ব ও গৌরবের নেশায় এ জাতি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং বর্ত্তমানে অন্য যে সমুদয় সভ্যজাতি আছে আমরা যে সকল বিষয়েই তাহাদের

* মনু—পঞ্চম অধ্যায় (১৪৭ ১৬৯), অষ্টম অধ্যায় (২৯৯), নবম অধ্যায় (১-২০ ৭৮-৮৪) দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য ঢাকা হইতে প্রকাশিত শান্তি পত্রিকায় বিবদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সমকক্ষ অথবা শ্রেষ্ঠ ছিলাম এ ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়! কিন্তু এরূপভাবে ইতিহাসকে রাজনীতির বাহনমাত্রে পরিণত করিলে প্রকৃত ইতিহাসও গড়িয়া উঠিবে না, রাজনীতির দিক দিয়াও কোন স্থায়ী কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। রাজনীতির দোহাই দিয়া আমরা তো বহির্জ্জগতের সভ্যতার সহিত অসহযোগ করিয়াছি, তার পর আবার যদি অন্তর্জ্জগতে। স্বাধীন চিন্তা ও সত্যনিষ্ঠার সহিতও অসহযোগ করিতে হয় তাহা হইলে এ জাতির রাজনৈতিক অধিকার লাভের কতটুকু মূল্য থাকিবে ?

এক দিকে যেমন দেশীয় রাজনৈতিকগণ ইতিহাসকে তাঁহাদের সহায় স্বরূপ করিতে চান, অপরদিকে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তাঁহাদের রাজনৈতিক আদর্শের অনুকূল করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছেন। পরলোকগত ভিন্সেণ্ট স্মিথের ভারতবর্ষের ইতিহাসই ঐ বিষয়ের প্রধান পুস্তক। সম্প্রতি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাচীন ভারতেতিহাসের প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কিছু ইতিহাস চর্চ্চা হয় তাহা প্রধানতঃ এই দুই গ্রন্থ এবং উহাদের অনুকরণকারী অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বনে। কিন্তু এই উভয় গ্রন্থের লেখকগণই প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে গিয়া বর্ত্তমান ইংরেজ অধিকৃত হতবল দুর্দ্দশাগ্রস্থ ভারতবর্ষকে কিছুতেই মনশ্চক্ষু হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই। উভয় গ্রন্থেরই প্রতিপাদ্য মূলতঃ একই। কেম্ব্রিজ ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে আমরা এই শিক্ষালাভ করি যে ইংরেজ জাতি যদি ভারতবর্ষে কোনও যুদ্ধে হতবল হয় অথবা তাহার রণতরী পরাভূত হয় তবে ভারতের রণভীরু জাতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত অন্য কোন জাতির পদানত হইবেই। ভিন্সেণ্ট স্মিথও হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহার

এক অপ্রকৃত বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষে চিরকালই এরূপ হইয়া আসিয়াছে এবং ইংরেজ জাতি এদেশে যে হিতকারী অবাধ প্রভুত্ব (benevolent despotism) প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবর্ষকে সুদৃঢ় হস্তে (iron grasp) শাসন করিতেছেন তাহার অভাবে পুনরায় ভারতবর্ষের উক্ত প্রকার দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। এই সকল স্পষ্ট উক্তি ব্যতীত গ্রন্থের আগাগোড়া রচনা প্রণালী আলোচনা করিলেও এই সমুদয় গ্রন্থকারের অন্তর্নিহিত মানসিক বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্সেণ্ট স্মিথের গ্রন্থে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের বিবরণ প্রায় ৭০ পৃষ্ঠা ব্যাপী অথচ ভারতের বাহিরে ভারতবাসীগণ যে রাজশক্তি ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহার উল্লেখ মাত্র নাই।

কোন জাতির ইতিহাস লিখিতে হইলে তাহার সভ্যতা উপলব্ধি করিবার যে ঐকান্তিক চেষ্টা এবং তাহার প্রতি যে সশ্রদ্ধ পক্ষপাতশূন্য ভাব থাকা আবশ্যক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের পক্ষে নানাকারণেই তাহা অসম্ভব। প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়া বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ এবং ইতিহাস রচনার বিজ্ঞান-সম্মত প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা সম্ভবপর করিয়াছেন, এজন্য ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকট চিরঋণী থাকিবে, কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লেখা কখনই তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব হইবে না। এ কাজ ভারতবাসীকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপে এক শতাব্দী ধরিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও ইতিহাস আলোচনার যে জোয়ার বহিয়াছিল এখন তাহাতে ভাঁটা পড়িয়াছে। এই সমুদয় পণ্ডিতদলের মধ্যে যাঁহারা সম্প্রতি মৃত অথবা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের স্থলে আর সেই সেই

অনুপাতে নবীন পণ্ডিতের আবির্ভাব হইতেছে না। ম্যাক্সমুলার, বুহ্‌লার, কিলহর্ণের স্থান পূর্ণ হয় নাই, লুডার্স, য়্যাকোবি, লেভি, ফুসে, ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড, টমাস ও র‍্যাপসনের স্থান যে পূর্ণ হইবে তাহার সম্ভাবনাও অতি অল্প। কারণ বর্ত্তমান ইউরোপে আর এ বিষয়ে পূর্ব্বের মত চর্চ্চা নাই। নাবালকের সম্পত্তি সযত্নে রক্ষা ও বর্দ্ধিত করিয়া ট্রাষ্টিগণ যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত অধিকারীকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করেন, ইউরোপও তেমনি ভারতবাসীকে এই নূতন বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহাই যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং আমাদিগকেই এখন এই জ্ঞানশিখা প্রজ্জ্বলিত রাখিবার ও সম্ভব হইলে তাহাকে অধিকতর উজ্জ্বল করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়াই আমাদের দেশের ইতিহাস আলোচনার প্রকৃতি ও কি উপায়ে তাহার উন্নতি সম্ভবপর হয় তাহার সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ইতিহাস দুইটি বিশিষ্ট দিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। কোন জলাশয়ের সহিত তুলনা করিলে বলা যায় যে ইহার ব্যাপ্তি ও গভীরতা উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিলে আমাদের দৃষ্টি আর কেবলমাত্র হিমালয় ও কুমারিকার মধ্যে আবদ্ধ ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকে না। মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান, ইন্দোচীন ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমুদয় স্থানের প্রত্নসম্পদের দিকে আমাদের দৃষ্টি গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহাদের বাদ দিলে যে ভারতবর্ষের ইতি-

হাস অসম্পূর্ণ থাকে তাহাও আমরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। আর্য্যগণ পঞ্চনদ হইতে পূর্ব্বে কামরূপ ও দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত কিরূপে অগ্রসর হইলেন তাহাই ভারতেতিহাসের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু ইহা যে তাঁহাদের অগ্রসর গতির এক অংশমাত্র এবং মণিপুরের পর্ব্বতমালা অথবা সমুদ্র যে তাঁহাদের গতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই—আমরা যে এতদিন ভ্রমবশতঃ এক কৃত্রিম গণ্ডী রেখা টানিয়া তাঁহাদের গতির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি তাহা এতদিনে আমাদের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তাই এখন বৃহত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। শাস্ত্রে বলে—নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ। আশ্চর্য্য এই যে ঐতিহাসিক যাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে, জনপ্রবাদ "Indo-China, Futher India, Indonesia" প্রভৃতি নামের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের সহিত ঐ সমুদয় দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্মৃতি অব্যাহত রাখিয়াছে।

সম্প্রতি যবদ্বীপ বলিদ্বীপ ও প্রাচীন চম্পা কাম্বোজ ও শ্যাম দেশ ভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। এই সমুদয় দেশের প্রত্ন-সম্পদ প্রত্যক্ষ করিলে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার এক নূতন দিক আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। উদ্যম-বিহীন সমুদ্র-লঙ্ঘন-বিমুখ শাস্ত্রের নিগড় বন্ধনে বদ্ধ বর্ত্তমান হিন্দুগণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচীন ইতিহাস বিচার করিতে অগ্রসর হইলে যে কি বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। যবদ্বীপ অথবা কাম্বোজে যে সমুদয় বিশাল স্তূপ মন্দির প্রভৃতি দেখা যায় তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে এমন কিছু যে প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল এখনও তাহার কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মও যে অবস্থানুযায়ী

পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে তাহাও এই সমুদয় দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা যে কত বিভিন্ন দিক হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে আমাদের জ্ঞান পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতে পারে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এইরূপে যেমন এক দিকে ভারতেতিহাসের ব্যাপ্তি প্রসার লাভ করিয়াছে অপর দিকে তেমনি ইহার গভীরতারও বৃদ্ধি হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতে আর্য্যগণের উপনিবেশ হইতেই কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস আরব্ধ হইত, সম্প্রতি মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে ভূগর্ভ খননের ফলে প্রাক্ আর্য্য সভ্যতার ইতিহাস আলোচনার সূচনা হইয়াছে। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি কার্পণ্যের ফলে এতদিন ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃত ও সঠিক বিবরণ জানিবার উপায় ছিল না। অল্প কয়েক দিন হইল এ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কোন বিশেষ মতামত প্রকাশ অযৌক্তিক হইলেও ইহাতে যে প্রাক্-আর্য্য অন্ততঃ আর্য্য-প্রভাব-ব্যতিরিক্ত ভারতের নূতন এক সভ্যতার ইতিহাস আবিষ্কৃত হইল এবং আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি যে অতঃপর বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার পশ্চাতে ধাবিত হইবে তাহা আশা করা যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই যে দুই নূতন ধারা সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হইল ইহার উভয়েরই মূলে বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা বিদ্যমান। যে বৃহত্তর ভারত সমিতির যত্নে বৃহত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনার প্রথম প্রবর্ত্তনা হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ বাঙ্গালীরই

প্রতিষ্ঠান, আর বাঙ্গালী রাখালদাস বানার্জিই মহেঞ্জোদারোর প্রত্নসম্পদ আবিষ্কার করেন। ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব করার অধিকার আছে। মহেঞ্জোদারোতে যে সমুদয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে উৎকীর্ণ সাঙ্কেতিক চিহ্ন অথবা চিত্রলিপি এখনও পর্য্যন্ত পঠিত হয় নাই। যে দিন ইহা পঠিত হইবে সে দিন ভারত-বর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের এক রুদ্ধ কক্ষ খুলিয়া যাইবে। প্রাচীন মিসর ও আসিরীয় দেশের চিত্রলিপি ও ফলকাকৃতি অক্ষরের পাঠ উদ্ধার কল্পে পণ্ডিতপ্রবর সাঁপোলিও ও রলিনসন যাহা করিয়াছেন মহেঞ্জোদারোর অনাবিষ্কৃত লিপির সমস্যা সমাধান করিয়া তদনুরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার প্রশস্ত পথ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। বঙ্গদেশে যে সমুদয় ধীশক্তি-সম্পন্ন যুবকবৃন্দ প্রত্নতত্ত্বের বন্ধুর পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের সম্মুখে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই নূতন সমস্যা উপস্থিত। তাঁহারা এই সমস্যার সমাধান কল্পে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ শক্তি নিয়োজিত করিয়া সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করুন এই প্রার্থনা করি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আজ বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ যুগ-সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, ভবিষ্যৎ জাতীয় উন্নতির পথ কি তাহাই এখন পরম সমস্যার বিষয়। এ অবস্থায় ঐতিহাসিকের দায়িত্ব অতিশয় গুরু। অতীতের ভিত্তির উপরই ভবিষ্যৎ গড়িতে হইবে সুতরাং এ জাতির অতীতের প্রকৃত ইতিহাস কেবল সাহিত্য হিসাবে নহে জাতীয় কল্যাণের জন্যও অত্যাবশ্যক। বহির্জ্জগতের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবলমাত্র নিজের স্বাতন্ত্র লইয়া বাঁচিয়া থাকা বর্ত্তমান জগতে অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে স্থান ও কালের প্রভেদ সঙ্কীর্ণ হইয়াছে ও জগতের সমুদয় দেশ ও জাতি পরস্পরের সহিত এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত হইয়াছে যে, আজ কেহ কাহাকেও

অস্বীকার বা উপেক্ষা করিয়া জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। আমাদের অতীতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার এবং বর্ত্তমান জগতের ভাব-ধারার সহিত পরিচিত করিয়া দেশের এই বর্ত্তমান বিপদসঙ্কুল দিনে প্রকৃত পথ-নির্দ্দেশে সহায়তা করা ঐতিহাসিকের গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐতিহাসিকগণ যদি প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা সহকারে ও প্রকৃষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিয়া ইতিহাস চর্চ্চায় অগ্রসর হন তাহা হইলেই তাঁহারা একাধারে সাহিত্য ও দেশের কল্যাণ সাধন করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—মাজু

দর্শন-শাখার সভাপতি

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ, পি-এচ্-ডি

দর্শন-শাখার সভাপতি—

শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এচ-ডি, মহাশয়ের অভিভাষণ।

দর্শনের দৃষ্টি

আমরা চোখে দেখি এবং মনে ভাবি, এ সম্বন্ধে কাহারও হয়ত সংশয় না উঠ্‌তে পারে। কিন্তু দেখার মধ্যেও ভাবা আছে কিনা এ কথা জিজ্ঞাসা করলেই একটা কুট্‌কচালে কথা উঠে পড়ে। লাল, নীল, সবুজ কত রকম রঙ্‌ আমরা চোখে দেখি, কিন্তু লাল রঙ্‌টাকে দেখা আর লাল রঙ্‌টাকে লাল ব'লে চেনা এ দুটোর মধ্যে যে একটু তফাৎ আছে সে কথা সহজে মনে আসে না। লালের বোধ এক রকমের বোধ, নীলের বোধ এক রকমের বোধ, এ বোধ তখনই ফোটে যখন আমাদের চোখের ভিতরের বর্ণপটে বাহিরের রূপ তার রঙের ছোপ লাগায়, আর সেই ছোপের সাড়া শততন্ত্রীতে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করে। বাহিরের রূপ কেমন ক'রে রঙ্‌ হয় আর সেই রঙ্‌ কেমন ক'রে রঙের বোধ জন্মায় তার রহস্য আজও আমাদের কাছে ধরা পড়ে নি। বাহিরের রূপ যে কি জিনিষ তা জান্‌বার তখনই সুযোগ হয় যখন আমাদের চোখের ও মস্তিষ্কের ভিতরের যন্ত্রগুলির জৈব ব্যাপারে সেই রূপ রঙে পরিবর্ত্তিত হয়; কোনও বৈজ্ঞানিককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে রূপ কি, এবং রূপে রূপে ভেদ কি, তবে তিনি হয়ত বল্‌বেন যে আলোকের স্পন্দনের বেশী কমের নামই রূপ। সে রূপ কিন্তু রঙ নয়; সে রূপ আমরা চোখে দেখি না বৈজ্ঞানিক

অনুমানে বুঝি মাত্র। চোখের ভিতরের কোনও বিশেষ যন্ত্রের মধ্যে যখন এই আলোকের রূপ এসে পড়ে তখন তাহারই জৈব ব্যাপারের ব্যবস্থায় আলোক পরিস্পন্দ তার স্পন্দনের বেশী কমের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্ন রকমের রঙ্ হ'য়ে দাঁড়ায় ; কিন্তু এই জৈব ব্যাপারের ফলে যে রঙ্ হয় সেই রঙ্‌টি যে কেমন ক'রে রঙ্ বোধ হয় সে রহস্যের আজও কোনও মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু রঙ্ বোধ এবং কোনও রঙ্‌কে লাল বা নীল ব'লে জানা এ উভয় এক কথা নয়। সদ্যোজাত শিশুরও চক্ষু আছে এবং তাহার চক্ষুতেও বাহিরের রূপ পড়ে এবং রঙের বোধ জন্মায়, কিন্তু সে শিশু কোনও রঙ্‌কে লাল বা নীল ব'লে জানে এ কথা বলা চলে না। কোনও রঙ্ বোধকে লাল ব'লে জানা শুধু একটা জানা নয়, সেটা একটা পরিচয়। দুইকে এক না করতে পারলে পরিচয় হয় না। কোনও একটি রঙ্ বোধকে যদি ধরে রাখ্‌তে পারি এবং পুনরায় সেই বোধটি উৎপন্ন হলে এই দুইটির ঐক্য এবং অপর অপর বোধ হ'তে ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারি তবেই সেই দুইটি বোধের ঐক্যের পরিচয় ঘটে এবং এই ঐক্যের পরিচয় হলেই, সেই রঙ্ বোধটিকে লাল বা নীল ব'লে বুঝতে পারি। যদি আমাদের মধ্যে প্রতিক্ষণে বিভিন্ন রকমের রঙের বোধ উৎপন্ন হ'ত এবং প্রতিক্ষণে তাহা ধ্বংস হ'য়ে যেত, তবে কোনও রঙের বোধের সহিত কোনও রঙের বোধের পরিচয় হওয়া সম্ভব হ'ত না, এবং কোনও রঙ্‌কে-লাল বা নীল ব'লেও চেনা যেত না। কোনও একটি বোধ একবার বা একাধিকবার ঘট্‌লে যে সেটি প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায় এবং পুনরায় তৎসদৃশ বোধ উৎপন্ন হলে সেটি পুনরুদ্বুদ্ধ হয় এবং কালের ব্যবধান এড়িয়ে যে দুই কালের দুইটি বোধ পাশাপাশি দাঁড়ায় এবং ঐক্য সম্বন্ধ স্থাপন করে, এর নাম স্মৃতি ; এটি যদি না থাকৃত তবে লালকে লাল বলিয়া নীলকে নীল বলিয়া চেনা বা জানা সম্ভব হ'ত না।

জড়ের মধ্যে প্রতিক্ষণে আমরা স্পন্দশক্তির যে নব নব বিকীরণ দেখ্‌তে পাই, তাতে শক্তির যে আদান প্রদান দেখ্‌তে পাই, তাতে কোনও ব্যাপারের সঞ্চয় বা পরিচয়ের চিহ্নমাত্রও দেখ্‌তে পাই না। কিন্তু যেই আমরা জৈবপর্য্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করি সেই দেখি যে জৈব ব্যাপারের একটা প্রধান লক্ষণই হচ্ছে জৈব ব্যবহারের বা মূঢ় জৈব প্রত্যয়ের সঞ্চয় বা স্মৃতি এবং সেই অনুসারে স্বকার্য্যের নিয়মন। ক্ষুদ্রতম কীটেরও জীবনযাত্রা পর্য্যালোচনা কর্‌লে দেখা যায় যে সেই কীটটি তার আহারীয় বস্তুর অন্বেষণে বের হ'য়ে সেটিকে ধরে এবং হয়ত সেটি তাকে ছাড়িয়ে স'রে যায়, এবং সে তার পিছু পিছু গিয়ে আবার সেটিকে ধরে। ক্ষুদ্রতম প্রাণীর ব্যাপারের মধ্যেও এই যে একটি মূঢ় স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এটা জড় জগতের ব্যাপারের চেয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানুষের যেমন বোধ জন্মে ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও যে সেই রকম বোধ জন্মে এ কথা অবশ্য স্বীকার করা যায় না। কিন্তু বোধতুল্য তাহাদেরও যে অন্ততঃ একটা বোধাভ্যাস আছে এ কথা স্বীকার কর্‌তেই হয়। এই বোধাভ্যাসের দ্বারা তাহাদের প্রাণযাত্রা যেভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাতে স্বতই মনে হয় যে বিভিন্ন কালের এবং হয়ত কুলক্রমাগত পিতৃপুরুষের বোধাভ্যাসগুলি তাহাদের মধ্যে সঞ্চিত থেকে তাদের জৈব ব্যাপারগুলিকে তাদের প্রাণযাত্রার অনুকূল ক'রে তোলে। একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ বলেছেন—"The effectiveness which characterises the behaviour of organisms (i.e. of those that show behaviour enough to be studied) seems to depend on profitting by experience in the individual lifetime or on the results of successful ancestral experiments, or, usually on both. It appears

to us to be one of the insignia of life that the organism registers its experiments or true results of its experiences".

আর একজনও এই কথাই অন্যভাবে বলেছেন, "It is the peculiarity of living things not merely that they change under the influence of surrounding circumstances, but that any change which takes place in them is not lost, but retained, and as it were built into the organism to serve as the foundation of future actions". ক্ষণপরিবর্ত্তী কালের বিচ্ছেদ পরম্পরায় যে ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ হ'য়ে সংঘটিত, জৈব বোধাভ্যাসের সঞ্চয়বৃত্তিতে তারা যে কি কৌশলে এমন করিয়া বিধৃত হ'য়ে থাকে তার জটিল রহস্য আমাদের নিকট এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জড়জগতের মধ্যে যে নিরন্তর শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে তার প্রত্যেকটি শক্তি তার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট দিকে প্রতিনিয়ত কাজ কর্‌ছে। এই যে সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহগুলি নিরন্তর ঘুর্‌ছে, এতদিন ঘুরেও যে তাদের ঘোরার একটা অভ্যাস হয়েছে তা বলা যায় না। পৃথিবী যে তার বৈকেন্দ্রিক গতিতে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় এবং সূর্য্য যে তাকে নিজের দিকে টান্‌ছে, এই দোটানার সামঞ্জস্যে বর্ত্তুলাকারে ঘোরার সৃষ্টি। কিন্তু এতদিনের ঘোরাতেও পৃথিবীর কোনও ঘোরার অভ্যাস জন্মে নাই, এবং আজ যদি কোনও কারণে সূর্য্যের আকর্ষণ একটু হ্রাস হ'য়ে যায় তবে পৃথিবী সূর্য্য থেকে দূর দূরান্তরে আকাশের কোন্ অনন্ত পথে যে ছুটে যেতে থাক্‌বে, কি কোথায় কার সঙ্গে ধাক্কা লেগে চূর্ণ হ'য়ে যাবে তার কোনও ঠিক্ ঠিকানা

নেই। জড়ের মধ্যে আত্মরক্ষা, আত্মবর্দ্ধন, আত্মধারণ বা আত্ম-পোষণের জন্য কোনও চেষ্টা বা ব্যাপার দেখা যায় না; জড়ের মূঢ়শক্তির আদান প্রদানে এমন কোনও চিহ্ন নেই যাতে একথা বলা যায় যে আত্মশক্তিপ্রকাশের চেষ্টায় জড় তার কোনও প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করচে। জড়ের মধ্যে যদি কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় সে উদ্দেশ্য জড়ের নিজের উপকারের জন্য নয়, সে উদ্দেশ্য জীবের উপকারের জন্য, জীবের ভোগের জন্য, জীবের ব্যবহারের জন্য সাঙ্খ্যদর্শনকার জড়ের এই তত্ত্বটুকু ভাল ক'রেই বুঝেছিলেন তাই তিনি প্রকৃতিকে পরার্থা এবং পুরুষের ভোগাপবর্গসাধনে ব্যাপৃতা ব'লে বর্ণন করেছেন। সামান্য একটি পরমাণুসংশ্লেষের মধ্যেও জড়ের প্রচণ্ড আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তির খেলা দেখ্‌তে পাই; কিন্তু তার পরিমাণ, অন্যশক্তির সান্নিধ্যে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে তার ব্যবহার এ সমস্তই একান্তভাবে নির্দ্দিষ্ট এবং গণিতশাস্ত্রের আয়ত্তের মধ্যে সর্ব্বথা নিয়ন্ত্রিত। জড়ের কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির আড়ম্বর নেই, তাই নানা অবস্থায় তার ব্যবহারের বৈচিত্র্য নেই। পূর্ব্বাপর ব্যবহারের সঞ্চয় নেই, স্মৃতি নেই, অবস্থার বৈশিষ্ট্যে পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা নেই।

জীবরাজ্যে প্রবেশ কর্‌লেই আমরা দেখি যে এ রাজ্যের নিয়ম-পদ্ধতি জড়রাজ্যের নিয়মপদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জড়ের উপাদানকে অবলম্বন ক'রেই জীব তার কার্য্য আরম্ভ করে, কিন্তু প্রত্যেক বিভিন্নজাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী—তার নিজের শরীরের উপযোগী ধাতু গঠন করে। এই প্রোটিড্ ধাতু যেমন উৎপন্ন হয় তেম্‌নি ভেঙ্গে যায়, আবার গ'ড়ে ওঠে আবার ভেঙ্গে যায়, এবং এম্‌নি ক'রে জৈবশক্তির ব্যাপারে নিরন্তর শরীর ধাতুর ভাঙ্গাগড়া চল্‌তে থাকে। অথচ এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে এমন একটি ঐক্য আছে এমন একটি ছন্দ আছে যে, সেই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে জীবদেহ এমন

একটি বিশিষ্ট প্রণালীতে গ'ড়ে উঠে যে প্রত্যেকটি জীবদেহ সেই জাতীয় অন্যান্য জীবদেহের সজাতীয় হইয়াও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সম্পূর্ণ পৃথক্। ঐক্যের দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে সমস্ত জীবদেহই জীবদেহ, কিন্তু পার্থক্যের দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে প্রত্যেকটি জীবদেহ এমন কি তার প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্য যে কোনও জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পৃথক্। যে প্রোটিড্ ধাতু জীবদেহের প্রধান উপাদান সে ধাতু জড়জগতে পাওয়া যায় না ; সে ধাতু প্রাণস্পন্দনের দ্বারা এবং প্রাণশক্তির অভিষেকের দ্বারা জড়োপাদান হ'তে প্রাণকার্য্যের উপযোগিতার জন্য আহৃত ও উৎপাদিত। এ ধাতু জড় হ'লেও যতক্ষণ জৈবশক্তির দ্বারা আবিষ্ট থাকে ততক্ষণ এ জড় নয়। আমরা আমাদের শরীরকে জড় বলি, পার্থিব বলি, পাঞ্চভৌতিক বিকার বলি। এ দেহ ভৌতিক বিকার সে কথা ঠিক্, কিন্তু অন্য ভৌতিক বিকার থেকে এর পার্থক্য এইখানে যে এ বিকার জীবশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত, জীবশক্তির স্বপ্রয়োজনে জড় থেকে প্রাণাবেগে উত্থাপিত ও বিনির্ম্মিত। জীবশক্তির দ্বারা আবিষ্ট ও স্পন্দিত না ক'রে জীব কখনও জড়কে নিজের দেহধাতুরূপে ব্যবহার করতে পারে না। অথচ জীবশক্তির বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেক জীবের জীবধাতু বিভিন্ন। একবিন্দু ঘোড়ার রক্ত একবিন্দু গাধার রক্ত থেকে রাসায়নিক ও অন্যবিধ ধাতব লক্ষণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন কি দুজন মানুষের রক্তের মধ্যে যে ধাতু পাওয়া যায় তাহাও বিভিন্ন, পুরুষের রক্ত স্ত্রীলোকের রক্ত থেকে বিভিন্ন। এতে এই বোঝা যায় যে প্রত্যেকটি জীবশক্তির প্রকাশের মধ্যে একটি স্বগতবৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে যার দ্বারা সে ঠিক আপন প্রয়োজনের অনুকূল ধাতুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গঠন ক'রে তোলে। জৈবশক্তি ব'লে একটা শক্তি নয়, কিন্তু জীবরাজ্য একটা স্বতন্ত্র রাজ্য, সেখানে দেখি বিচিত্র জীবশক্তির বহুধা বিচিত্র প্রাণব্যাপার, প্রাণলীলা। সে লীলা এক নয়, সে লীলা

বহু, অথচ সে লীলার মধ্যে একটা ঐক্যের সম্বন্ধ রয়েছে, তাল রয়েছে ছন্দ রয়েছে। প্রত্যেকটি জীবকোষের মধ্যে প্রাণব্যাপারের যে লীলা দেখ্‌তে পাওয়া যায় তাতে এই ঐক্যের ছন্দটির অন্য আর একটি দিক্ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি জীবকোষ একদিকে যেমন স্বপোষণের জন্য স্বধাতু গঠন ক'রে তোলে, তেম্‌নি শক্তির ব্যবহারে সে ধাতু ক্ষয় হ'য়ে যায়, কিন্তু যেমন এক দিকে ক্ষয় হ'তে থাকে তেমনি অপর দিকে আবার স্বধাতু গঠনের কায চল্‌চে, অথচ এই ক্ষয় ও উপচয়ের মধ্যে একটা এমন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম, নির্দ্দিষ্ট ঐক্য বা ছন্দ বজায় থাকে যে উপচয় ও ক্ষয়ের দোটানার মধ্য দিয়ে জীবনের স্রোতটি তার যথানির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব'য়ে চ'লে যায়। একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ এ সম্বন্ধে বলেছেন, "In the ordinary chemical changes of the inorganic world, as in the weathering of rocks into soil, one substance changes into another. The same sort of thing goes on in the living body, but the characteristic feature is a balancing of accounts so that the specific activity continues. We lay emphasis on this characteristic, since it seems fundamental—the capacity of continuing inspite of change, of continuing, indeed, through change. An organism was not worthy of the name until it showed, for a short time at least not merely activity but persistent activity. The organism is like a clock in as much as it is always running down and always being wound up; but unlike a clock, it can wind itself up, if it gets food

and rest. The chemical processes are so correlated that up-building makes further down-breaking possible, the pluses balance the minuses; and the creature lives on." এম্‌নি ক'রে একটি জীবকোষের মধ্যে ক্ষয় ও উপচয়ের মধ্য দিয়ে তার জীবন-স্রোত বইতে থাকে। আবার বৃহত্তর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবন ছাড়া, জীবকোষগুলির পরস্পরের সামঞ্জস্যে আর একটি জীবনস্রোত প্রত্যেকটি জীবকোষের সহিত একটা সুনির্দ্দিষ্ট সামঞ্জস্যে সমগ্র প্রাণীটির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে থাকে। একদিকে যেমন প্রত্যেকটি জীবকোষের একটি স্বতন্ত্র প্রাণ পর্য্যায় আছে, অপরদিকে আবার প্রত্যেকটি জীব-কোষের জীবন সমস্ত প্রাণীটির সমগ্র জীবকোষের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্বন্ধ; এই সমগ্র থেকে বিচ্যুত হ'লে জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র প্রাণপর্য্যায় রক্ষা পায় না। অনেকগুলি জীবকোষ নিয়ে একটি হাতের জৈবক্রিয়া চলেছে, তার প্রত্যেকটি কোষের স্বতন্ত্র জীবন স্বতন্ত্রভাবে কায করছে, কিন্তু যেই হাতখানি দেহ থেকে ছিন্ন করা যায় সেই দেখা যায় যে হাতের জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। গ্রহণবর্জ্জনের জমাখরচে যেটুকু জমা থাকে সেই শক্তির বলে একটি জীবকোষ যখন আপন শক্তিকে আপনার মধ্যে সন্ধারণ করতে পারে না, তখন সে আপনা থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিভক্ত হ'য়ে ক্রমে ক্রমে বহু জীবকোষের সৃষ্টি করে তাদের সঙ্গে এমন একটি অবিচ্ছেদ্য পারিবারিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে যে তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবন সেই সমগ্রের জীবনের উপর নির্ভর করে। এবং এম্‌নি ক'রে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রেও সমগ্রের অধীন হ'য়ে থাকে এবং সমগ্রের জীবনও জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র জীবনের উপর নির্ভর করে। আবার

জীবকোষগুলির শুধু সমষ্টিতেই জীবদেহ নির্ম্মাণ হয় না। একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ পরম্পরায় বিশিষ্টরূপ আদানপ্রদানের কৌশলে, এই সমগ্রদেহের উৎপত্তি, অবস্থান ও বৃদ্ধি। সেই সেই বিশিষ্ট সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি জীবকোষ পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, সেই প্রভাবের মধ্যেই একদিকে যেমন সমগ্র জীবদেহের প্রাণপর্য্যায় রক্ষিত হয় অপরদিকে তেমনি সেই প্রভাব-কেই অবলম্বন ক'রেই প্রত্যেকটি জীবকোষ বেঁচে রয়েছে। বহুকে মুছে ফেলে এখানে এক দাঁড়ায় নি, এককে মুছেও বহু দাঁড়ায় নাই। এক দিক দিয়ে দেখ্‌লে যাকে দেখি এক, অপরদিক দিয়ে দেখ্‌লে সেই একেকেই দেখি বহু। আমরা সাধারণতঃ জানি যে, কোনও কিছু যদি এক হয়, তবে সে বহু নয়, যদি বহু হয়, তবে সে এক নয়; তাই দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যাঁরা বহুর মায়ায় পড়েছেন তাঁরা একেকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, আর যাঁরা একের মায়ায় পড়েছেন তাঁরা বহুকে মিথ্যা বলেছেন, কেউ বা বলেছেন, বহুঅংশকে নিয়ে এক। কিন্তু প্রাণজগতে এসে আমরা যে লীলা দেখি তাতে দেখি এটা একটা এমন রাজ্য যেখানে কোনও একটি সত্তা বা সম্বন্ধই অপর সত্তা বা সম্বন্ধকে ছাড়া তার আপন স্বরূপকেই লাভ কর্‌তে পারে না। এখানে ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধিকে পাওয়া যায় না; বৃদ্ধির মধ্যেই ক্ষয়, ক্ষয়ের মধ্যেই বৃদ্ধি। বৃদ্ধির পর ক্ষয় আসে এ আমরা জানি, বা ক্ষয়ের পর বৃদ্ধি আসে এ আমরা জানি। কিন্তু এ যে বৃদ্ধি-ক্ষয়ের যৌগপদ্য এবং এমন যৌগপদ্য যেখানে ক্ষয়ের মধ্যেই বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির মধ্যেই ক্ষয়। একের সমষ্টিতে বহু নয়, বহুর সমষ্টিতেও এক নয়, কিন্তু যাকে এক বলি তাই বহু এবং যাকে বহু বলি তাই এক। সাধারণতঃ য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে যেটাকে organic view বা জৈবদৃষ্টি বলে সেটাতে একের জীবনের মধ্যে বহু এসে কেমন ওতপ্রোতভাবে মিশেছে

এই কথাটিই বিশেষভাবে জোর দিয়ে দেখান হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই জৈবদৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে একের প্রাধান্য দেখাবার জন্য এবং একের সঙ্গে যে বহুর বিরোধ নেই, বহুকে নিয়েই যে এক আপ্‌নাকে সার্থক কর্‌ছেন এই কথাটি জোর ক'রে দেখাবার জন্য। সকল সময়েই আমরা এই কথা শুনে থাকি যে ভেদদৃষ্টিতেই দুঃখ, বিচ্ছেদ, ধ্বংস, এবং ঐক্যদৃষ্টিতেই মঙ্গল ও মুক্তি। কিন্তু এ সমস্ত মতবাদের মধ্যে জৈবদৃষ্টির যথার্থ শিক্ষাটি যে প্রকাশ পেয়েছে আমার তা মনে হয় না। জৈবদৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব এইখানেই প্রকাশ পায় ব'লে আমার মনে হয় যে, এই দৃষ্টিতে এক ও বহুর চিরপ্রসিদ্ধ ভিন্নতাটি তিরোহিত হয়েছে। যেমন এককে না বোঝা গেলে বহুকে বোঝা যায় না, তেমনি বহুকে না বোঝা গেলেও এককে বোঝা যায় না। বহুকে বোঝাও যেমন একপেশে বোঝা, এককে বোঝাও তেমনি একপেশে বোঝা। একের স্বতন্ত্রতায় যে বহুর উৎপত্তি এবং একের স্বতন্ত্রতা যে বহুর স্বতন্ত্রতা ছাড়া হয় না, এই যে কার্য্যকারণবিরোধী সত্য, এতে এক এবং বহুর সীমানাকে এমন অনির্বাচ্য ক'রে তুলেছে যে এক বলাও পার্শ্বদৃষ্টি, বহু বলাও পার্শ্বদৃষ্টি। বৃদ্ধির মধ্যে ক্ষয় ও ক্ষয়ের মধ্যে বৃদ্ধি এতে যে ক্রিয়াবিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে, বৃদ্ধিও পার্শ্বদৃষ্টি ক্ষয়ও পার্শ্বদৃষ্টি। এ পার্শ্বদৃষ্টির সামঞ্জস্য কোথায় সে প্রশ্নের এখানে এখন অবতারণা করা সহজ নয়। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সাধারণ বুদ্ধিতে যে সমস্ত সম্বন্ধকে আমরা এতকাল স্থির মনে ক'রে এসেছি সে সমস্ত সম্বন্ধগুলির একটিও স্থির নয়, একটিও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। নাগার্জ্জুন থেকে Bradley পর্য্যন্ত অনেকেই সম্বন্ধগুলির আপেক্ষিকতা স্বীকার করেছেন এবং সম্বন্ধগুলি সমস্তই আপেক্ষিক ব'লে নাগার্জ্জুন বলেছেন যে সমস্ত বস্তুই নিঃস্বভাব, শ্রীহর্ষ বলেছেন ব্রহ্মভিন্ন সমস্তই অনির্বাচ্য,

Bradley বলেছেন যে খণ্ডশঃ দেখি ব'লে সম্বন্ধগুলি আপেক্ষিক এবং পরস্পরবিরোধী, কিন্তু সকল সম্বন্ধকে যদি এক ক'রে ফেলি তবে সেই এক করার মধ্যে তাদের সমস্ত আপেক্ষিকতা নিঃশেষে শেষ হ'য়ে যাবে; জ্ঞান, কর্ম্ম, ইচ্ছা সমস্ত একত্র মিশে গিয়ে এই সমগ্রটি যে কি তা বলা যায় না, তা অনির্বাচ্য কিন্তু তাই পরমার্থ সৎ। কিন্তু সম্বন্ধের আপেক্ষিকতায় যে সম্বন্ধগুলি মিথ্যা ব'লে মনে হয় তার প্রধান কারণ এই যে, এক্‌টি সম্বন্ধ বুঝ্‌তে গেলে আর এক্‌টি বুঝ্‌তে হয় এবং সেটিকে বুঝ্‌তে গেলে আর এক্‌টিকে বুঝ্‌তে হয়, এম্‌নি ক'রে আমরা অনবরত যতই চলি ততই চলি এবং অনন্তকাল চ'লেও কোনও সম্বন্ধের নির্ণয় হয় না। একে সংস্কৃতে বলে অপ্রামাণিকী অনবস্থা, ইংরেজীতে বলে vicious infinite। আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, একটি সম্বন্ধকে বা সত্যকে এক দিক দিয়ে হয়ত বেশ বোঝা যায়, কিন্তু আর এক দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে পূর্ব্বের বোঝার সঙ্গে গোল উপস্থিত হয়, বিরোধ হয়। এবং যেহেতু আত্মবিরোধই মিথ্যা সেই জন্য এই সম্বন্ধনির্ণয়ও মিথ্যা। ক্রিয়া ব্যাপারের মধ্যে আত্মবিরোধ খণ্ডিত হ'য়ে যায় দেখে Hegel ক্রিয়াব্যাপারের মধ্যে সত্যের যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন ব'লে মনে করেছিলেন। কিন্তু ক্রিয়াব্যাপারটা যে নিজে কি সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা তিনি কোথাও সুস্পষ্ট ক'রে বুঝিয়েছেন ব'লে মনে পড়ে না। সম্বন্ধগুলিকে পৃথক্ ক'রে দেখি ব'লেই ক্রিয়াব্যাপারের মধ্যে তাদের একত্র দেখে তাদের বিরোধ সমাধান করতে চেষ্টা করি, কিন্তু জৈবদৃষ্টির মধ্যে এই কথাটি যেন আমাদের চোখে বেশ পরিষ্কার হ'য়ে আসে যে, যে সম্বন্ধগুলিকে আমরা বুদ্ধির মায়ায় পৃথক ব'লে মনে করি সেগুলি পৃথক নয়, তাদের প্রত্যেকের সত্তা অপরের মধ্যে নিহিত হ'য়ে রয়েছে, তারা একও নয়, বহুও

নয়। প্রাণপর্য্যায়ের মধ্যে এই অপূর্ব্ব সত্তাসমাবেশের চরম সত্যটি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। শুধু ক্ষয় বৃদ্ধির মধ্যে নয়, শুধু এক বহুর পরস্পরের সংশ্লেষে নয়, বৃদ্ধি, উৎপাদন ও ক্রমবিকাশের লীলায়, পূর্ব্বতনকে ও ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের মধ্যে সন্ধারণ কর্‌বার ব্যবহারে সর্ব্বত্রই আমরা যা দেখ্‌তে পাই তাতে শুধু এই পুরোণো কথাটি বুঝি না যে সম্বন্ধগুলি পরস্পরসাপেক্ষ, তাতে তার চেয়ে আরও একটা বড় কথা বুঝি সেটা হচ্ছে এই যে, সম্বন্ধগুলি পরস্পরের মধ্যে অপূর্ব্ব সত্তাসমাবেশে সমাবিষ্ট। যেটা বুদ্ধির চোখে অসম্ভব, জৈবজীবনে সেটা মূর্ত্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এই জন্য বুদ্ধির জালে বা জড়জগতের শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে জৈবপর্য্যায়ের বিশেষত্বটুকু ধরা পড়ে না। এই জন্য জড়জগতের নিয়মে, জড়-জগতের সংজ্ঞায়, জড়জগতের ধারণায় জীবরাজ্যের ব্যাপার বা তথ্য ধরা পড়ে না। জীবরাজ্য একটি নূতন রাজ্য। জড়জগতের থেকে জীবজগৎ কেমন ক'রে উঠ্‌ল সে রহস্য এখনও নির্ণীত হয় নি, এবং হবে কি না তাও সন্দেহ। কেউ মনে করেন যে স্বতঃপ্রবাহী প্রাণশক্তির সঙ্গে জড়শক্তির বিরোধের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন রকমের জীবপর্য্যায়ের উদ্ভব হয়েছে, কেউ বা হয়ত মনে করেন সে জড়শক্তিরই একটা নূতন পর্য্যায়ের আরম্ভেই প্রাণপর্য্যায়ের আরম্ভ। কিন্তু একজন অতি বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলেছেন যে, শুধু যে জড়ের প্রকার থেকে জীবপর্য্যায়ের প্রকার ধরা পড়ে না তা নয়, কিন্তু জীবপর্য্যায়ের মধ্যে যে সমস্ত স্তরে স্তরে প্রকার ভেদ রয়েছে তার কোনও প্রকার থেকে কোনও প্রকার ধরা পড়ে না। কাজেই কোনও পর্য্যায়ের দ্বারাই কোন পর্য্যায়ের প্রকার বা স্বভাব নির্ণয় করা যায় না। "There is no possibility of deducing or predicting true nature of the new from that of the old. No amount

of reflection on the inorganic world leads to the idea of the organic. As no emergent can be predicted from, explained by, or accounted for by what goes before it in the course of evolution, each emergent has simply to be accepted as a fact and accorded its position in the scheme. A mind cannot be explained by life neither can life be explained by mind.

এম্‌নি ক'রে নূতন ধর্ম্ম, নূতন প্রকার, নূতন নিয়ম, নূতন ব্যবহার নিয়ে জড়জগতের বুকের মধ্যে থেকে জড়জগতের সঙ্গে সহযোগে যে প্রাণপর্য্যায় উৎপন্ন হোল সেটা সর্ব্বতোভাবে একটা নূতন রাজ্য। জড়ের নিয়মে এর ব্যাখ্যা করা চলে না। জড়কে আমরা যে চোখে দেখি সে চোখে প্রাণকে দেখ্‌তে গেলেই দেখি যে সে চোখে একে দেখা যায় না। জড়ের ভাষা প্রাণের ভাষা নয়। জড়জগতের শক্তিচক্রের ঘাতপ্রতিঘাতের যে নিয়ম সে নিয়ম প্রাণজগতে খাটে না। Thomson এই কথাটি তাঁর রকমে বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন, "Making no pronouncement whatsoever in regard to the essence of the difference between organisms and things in general, we hold to what we believe to be a fact, that mechanical formulae do not begin to answer the distinctively biological questions. Bio-chemistry and Bio-physics added together do not give us one biological answer. We need new concepts, such as that of the organism as

an historic being, a genuine agent, a concrete individuality, which has traded with time and has enregistered within itself past experiences and experiments and which has its conative bow ever bent towards the future. We need new concepts, because there are new facts to describe which we cannot analyse away into simple processes." Thomson এই যে বলেছেন যে জীবনপর্য্যায়ের ব্যাপার ও প্রকার জড়পর্য্যায়ের ব্যাপার ও প্রকার থেকে এতই বিভিন্ন যে, জীবকে বুঝতে গেলে জৈবিক সংজ্ঞা ছাড়া চলে না। জড়ের সংজ্ঞা দিয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যকে আমরা ধর্‌তে পারি না। আমি এইখানে শুধু এইটুকু যোগ দিতে চাই যে, জড়রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে যদি একশক্তি ব'লে কল্পনা করি তা হ'লে জড়শক্তির যে বিচিত্র রূপ তাকে কিছুতেই আমরা পাই না। সমস্ত শক্তিকে যদি শক্তিমাত্রের সাদৃশ্যে একশক্তি বলি তবে চিন্তার তাড়না থেকে আমাদের চিত্ত আপাতবিশ্রাম পায় বটে, কিন্তু জড়শক্তির বিচিত্রলীলার ব্যাখ্যা তাতে হয় না। জড়ের রাজ্য একটা স্বতন্ত্র রাজ্য, সে রাজ্যে নানাশক্তি তার নির্দ্দিষ্ট ঘাত-প্রতিঘাতের লীলায় খেলা কর্‌চে; জড়কে নিতে গেলে তাকে তার এই বিচিত্র শক্তিচক্রের মধ্যেই নিতে হবে। জড়কে একশক্তি ব'লে সঙ্ক্ষেপ করা চলে না কারণ সে হচ্ছে নানা শক্তিপুঞ্জের পরস্পর সম্বন্ধ লীলারাজ্য।

কেহ কেহ মনে করেন যে জীবপর্য্যায়ে যে শক্তির খেলা দেখি সাধারণ জড়শক্তির মতন সেও একটা বিশিষ্ট জড়শক্তি (force)। জড়শক্তি যেমন অবস্থাভেদে বৈদ্যুতিক, চৌম্বক,

মাধ্যাকর্ষণিক প্রভৃতি নানারকমের দেখা যায়, তেম্‌নি জীবকোষের মধ্যেও যে শক্তির ব্যাপার দেখা যায় সেও সেই রকমেরই একটি জড়শক্তি। যেমন বৈদ্যুতিক এবং মাধ্যাকর্ষণিক এই উভয় শক্তিই জড়শক্তি হ'য়েও সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের জড়শক্তি, তেম্‌নি জৈব ব্যবস্থার মধ্যে প্রকাশ ব'লে অন্য জড়শক্তির সহিত প্রকারগত বৈলক্ষণ্য থাক্‌লেও জৈবশক্তিও মূলতঃ একপ্রকার জড়শক্তিই। আবার অপরাপর অনেকে মনে করেন যে জৈবশক্তি জড়শক্তির রূপান্তর বা নামান্তর নয়; এটি একটি স্বতন্ত্র জাতীয় শক্তি এবং কেবলমাত্র জীবস্তরেই এর প্রকাশ, কোনও জড়শক্তির প্রেরণায় বা জড়শক্তির পরিণামে, পরিবর্ত্তনে বা ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে ইহার উৎপত্তি নয়। এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বশক্তি। ইহার স্বগত ব্যাপারে ইহা স্বাধীনভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। জড়শক্তির সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে, জড়শক্তি আপনাকে দেশাবচ্ছেদে বা spatial উপায়েই প্রকাশ করে কিন্তু এই বিশিষ্ট জীবশক্তি দেশাবচ্ছেদে আপনাকে প্রকাশ করে না। ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃসঞ্চারী জীবশক্তি। জড়শক্তি যখন দূরস্থিত দুইটি বস্তুকে আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট করে, বা উত্তাপে ও আলোকের স্পন্দাকারে আপনাকে প্রকাশ করে তখন সেই ক্রিয়াব্যাপারটি একস্থান থেকে অন্যস্থানে সঞ্চারিত হ'তে থাকে। রাসায়নিক ব্যাপারে যে পরমাণুর স্থানবিনিময় ঘটে সেটি স্পন্দাত্মক এবং স্থানসঞ্চারী। এই দেশাবচ্ছেদে কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রান্তরে স্থান সঞ্চারের মধ্যেই জড়শক্তির প্রকাশ। কিন্তু জীবশক্তি স্পন্দাত্মকও নয় স্থানসঞ্চারীও নয়। এ একটি নূতন স্তরের শক্তি, জড়শক্তির ভাষায় একে প্রকাশ করা যায় না; এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রকাশের শক্তি (autonomous agent)। কাজেই এই শক্তি কোথায় থাকে এ প্রশ্নের জবাব নেই। কারণ এ শক্তি কোনও দেশাবচ্ছেদে থাকে

না, কোনও জায়গায় থাকে না। সেই জন্য জড়শক্তির বেলায়ই বলা চলে যে, এ শক্তিটি এইখানে আছে, কিন্তু এ শক্তিটি একটি নূতন স্তরের জীবাত্মক শক্তি। ইহা নিজে কোনও দেশাবচ্ছেদে না থেকেও দেশাবচ্ছেদে অবস্থিত জড়শক্তিকে ও জড়পরমাণুকে নূতনভাবে সংহত ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পারে—"It is immaterial and it is not energy; its function is to suspend and to set free in a regulatory manner pre-existing faculties of inorganic interaction." কিন্তু এইরূপ একটি স্বতন্ত্র জীবশক্তি মান্‌লেই যে জীবপর্য্যায়ের রহস্য ধরা প'ড়ে গেল তা মনে করা যায় না। জীবপর্য্যায়ে যে লীলাচক্র দেখ্‌তে পাই তাকে এক দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে শক্তি বলা যায়, অপর দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে বুদ্ধি বলা যায়, অপর দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে শক্তি ও বুদ্ধির মিলনে ইচ্ছা ব'লে বলা চলে। একটি শরীরের মধ্যে যে অসংখ্য পরস্পরাপেক্ষী ব্যাপার পরস্পরের সামঞ্জস্যে স্রোতের মত ব'য়ে চলেছে, কোথায় নিয়ন্তা জানি না অথচ নিয়মের বাঁধনে, যেন ঠিক জেনে শুনে প্রত্যেকটি শরীর যন্ত্র তার কায ক'রে যাচ্ছে। বৃক্কযন্ত্র (kidney) শরীরের রক্ত থেকে যেটুকু যেটুকু মলভাগ শরীরের অপকারী হবে, ঠিক ঠিক সেই-টুকুকে কি কৌশলে রক্ত থেকে বেছে নিয়ে মূত্র প্রস্তুত ক'রে শরীর যন্ত্রকে শোধন করছে তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। শুধু একটি মূঢ় অলৌকিক জীবশক্তিকে মান্‌লে তার দ্বারা বহুধাবিচিত্র জৈব ব্যাপারকে উপপন্ন করা যায় না। জৈবব্যাপারকে ব্যাখ্যা করতে হ'লে তার বিচিত্র আত্মপ্রকাশকে ব্যাখ্যা করতে হবে, শুধু জড়শক্তির অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র জীবশক্তি মান্‌লে তা চলে না। একজন বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ্ এই মতের প্রতিবাদ কর্‌তে গিয়ে বলেছেন—"In order to guide effectually the exce-

ssively complex physical and chemical phenomena occurring in living material, and at many different parts of a complex organism, the vital principle would apperently require to possess a superhuman knowledge of these processes. Yet the vital principle is assumed to act unconsciously. The very nature of this vitalistic assumption is thus totally unintelligible." আমাদের দেশে প্রাণ সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে, তা মোটামুটি তিন প্রকার। চরক প্রাণকে জড়শক্তি ব'লেই ব্যাখ্যা করেছেন। বেদান্ত প্রাণকে জড়শক্তির একটি স্বতন্ত্র বিকার বা পরিণাম ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন। সাঙ্খ্য প্রাণকে মহৎতত্ত্ব থেকে সমুদ্ভূত ব'লে ধ'রে নিয়ে বুদ্ধি-ব্যাপারেরই অবান্তর ব্যাপার ব'লে মনে করেছেন। এঁদের সকলেরই প্রাণ সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান কালের য়ুরোপীয়দের আলোচনার তুলনায় অতি অল্প এবং অস্ফুট। ফলে দেখা যায় যে জৈব ব্যাপারের রহস্য কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এ রহস্য যখন ব্যাখ্যা করা যায় না তখন শুধু একটি জীবশক্তির ঘাড়ে একে চাপিয়ে দেওয়া চলে না। সেইজন্যই আমার বিবেচনায় শুধু একটি জীবশক্তি স্বীকার না ক'রে জীবলোক ব'লে একটি স্বতন্ত্র লোক, স্বতন্ত্র রাজ্য স্বীকার করাই উচিত। এ রাজ্যের নিয়মপদ্ধতি ব্যবহার সমস্তই এই রাজ্যেরই বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র নিয়ম। জড়লোক নানাবিধ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে আপনাকে চালিত ক'রে চলেছে। এই সমস্ত শক্তিগুলির মধ্যে পরস্পরের সাদৃশ্য থাক্‌লেও এক জড়শক্তির বিচিত্র আত্মপ্রকাশ বোঝা যায় না। অথচ জড়শক্তির এই বিচিত্রতা না বুঝ্‌লে জড়শক্তিকেই বোঝা গেল না। বিভিন্ন জড়শক্তির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত, পরস্পরের বিচিত্র সমাবেশ,

পরস্পরের বিভিন্ন-রূপ, জড়শক্তিকে বুঝ্‌তে গেলে এ সমস্তই বোঝা চাই এবং জড়বিজ্ঞানের সাধকগণ অহোরাত্র জড়শক্তির বহুধা-বিচিত্র প্রকাশকে বিচিত্ররূপে উপলব্ধি কর্‌তে ব্যাপৃত রয়েছেন। জীবলোকও তেম্‌নি একটি শক্তি বা একটি সত্তা নয়, একটি নূতন স্তরের জৈবনিয়ম, জৈবব্যক্তিত্ব, জৈবব্যবহার, জৈবপদ্ধতি, পরস্পরের সহযোগে এবং জড়লোকের শক্তিচক্রের সহযোগে রচিত একটি নূতন লোক। একে শক্তি বলা চলে না কারণ ইহা স্পন্দাত্মক নয় অথচ জড়স্পন্দের নিয়ামক; এর কার্য্যক্ষমতা দেখে যখন একে শক্তি বল্‌তে যাই, তখন বুদ্ধির সাধর্ম্ম দেখে একে বুদ্ধিময় বল্‌তে ইচ্ছা হয়। শুধু যে আমাদের দেশে সাঙ্খ্যদর্শন প্রাণকার্য্যকে বুদ্ধি কার্য্য বলেছেন তা নয়, য়ুরোপেরও অনেক মনীষীরা প্রাণব্যাপারকে একটা objective mindএর ব্যাপার ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু একে শুধু বুদ্ধিময় বলা চলে না, কারণ বুদ্ধি অনুসারে এর প্রবৃত্তি রয়েছে, সেই হিসাবে একে ইচ্ছাময় বল্‌তে ইচ্ছা হয় এবং অনেক য়ুরোপীয়েরা একে blind will ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন, অনেকে বা একে ঈশ্বরের ইচ্ছার গৌণ বিকাশ ব'লে মনে করেছেন। এর স্বচ্ছন্দ সৃষ্টির দিক্ থেকে দেখ্‌লে একে সৃজনী শক্তি ব'লে মনে হয় এবং সেই হিসাবে একে Bergson সৃজনাত্মক স্বচ্ছন্দশক্তি ব'লে (creative elan) ব'লে বর্ণনা করেছেন। নানাদিক্ থেকে এই জীবনলীলাকে নানারূপে সত্য ব'লে মনে হয়, কিন্তু এর কোনও একটিকেই জীবলীলার পরমার্থ সত্য রূপ ব'লে নির্দ্দেশ করা যায় না, অথচ এর প্রত্যেকটিই জীব-লীলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ কর্‌ছে। প্রত্যেকটি জীবকোষের স্বগতবিকাশে ও পরস্পরের সন্নিধানে পরস্পরের আত্মবিকাশে গ্রহণ বর্জ্জন সন্ধারণের সুনিবদ্ধ সামঞ্জস্যে, আপনা থেকে আপনাকে নব নব সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়, নিজের স্বরূপ ও বিরূপ সৃষ্টিতে যে বিচিত্র

সম্বন্ধপরম্পরা ও সত্তাপরম্পরার পরস্পর সমাবেশ দেখ্‌তে পাই তাতে জীবপর্য্যায়ের মধ্যে একটি নূতন রাজ্য একটি নূতন লোকের পরিচয় পাই। এই লোকটি একদিকে যেমন নিজের বিচিত্রতার মধ্যে নিজের লীলাকৌশলে সুষমাময় হ'য়ে রয়েছে, অন্যদিকে তেম্‌নি জড়-জগতের বিচিত্র নিয়মপরম্পরার সঙ্গে আপনাকে বেঁধে রেখেছে এবং জড়শক্তিকে আপন জৈব উপাদানে ব্যবহার ক'রে আপনার ক'রে তুলেছে। জড়রাজ্যের সঙ্গে জীবরাজ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে, আদান প্রদান চল্‌ছে, তথাপি জীবরাজ্য তার নিয়ম পরম্পরা নিয়ে একেবারে স্বতন্ত্র হ'য়ে রয়েছে। পরস্পরের আদান প্রদান রয়েছে ব'লে পরস্পরের সাদৃশ্যও রয়েছে তথাপি তাদের বৈসাদৃশ্য এত বেশী যে পরস্পর যুক্ত থেকেও দুটিতে একে-বারে দুটি বিভিন্ন লোক রচনা ক'রে বিরাজ কর্‌চে।

জীবলোকের সহিত ঠিক্ এই রকমেরই সাম্যবৈষম্যে মনোলোক বা বুদ্ধিলোকের সৃষ্টি। অথচ এই বুদ্ধিলোকের নিয়ম, প্রকার, সংগঠন সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমেব। জড়লোকে দেখেছি রূপের খেলা, জীবলোকে দেখেছি অভিব্যক্তির খেলা, গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্যে আত্মসন্ধারণের লীলা। সে লীলায় কোথাও স্থৈর্য্য নেই, যেটুকু বা স্থৈর্য্য আছে সেটুকু কেবল চাঞ্চল্যের সামঞ্জস্য মাত্র। কিন্তু বুদ্ধিলোকে প্রবেশ ক'রে সর্ব্বপ্রথম দেখ্‌তে পাই জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা ও পরপ্রকাশতা। জ্ঞান কি, জ্ঞানের উৎপত্তিপ্রক্রিয়া কি, এ নিয়ে আমাদের দেশে ও য়ুরোপে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এ আলোচনার মধ্যে যে সমস্যাটি সব চেয়ে কঠিন, সেটি হচ্ছে এই যে, জ্ঞান পদার্থটি অন্য সমস্ত পদার্থের চেয়ে এত বেশী বিভিন্ন যে, কোনও জড়বস্তুর সহিত যে এর কি সত্য সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে তা কল্পনা করা যায় না। বেদান্ত এবং সাংখ্যযোগ এ উভয়ই

জ্ঞানস্বরূপ বা চিৎস্বরূপ পরমার্থ সত্যস্বরূপ কুটস্থ নিত্য ব্রহ্ম ও পুরুষ এই পদার্থটিকে সমস্ত জড়পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ব'লে মেনে নিয়েছেন। তাঁহাদের মতে জড়ের দ্বিবিধ অবস্থা, এক অবস্থায় বাহ্য জড়জগৎ, অপর অবস্থায় অন্তকরণ (বেদান্ত) বা বুদ্ধি (সাঙ্খ্যযোগ)। বেদান্ত মতে অবিদ্যা অনির্ব্বচনীয় ভাব পদার্থ; ইহার একরকম বিকারে বা বিক্ষেপে বাহিরের জড়জগৎ, অন্যরকম বিকারে বা বিক্ষেপে অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ দ্রব্যটি অবিদ্যা-সমুদ্ভূত জড়পদার্থ হ'লেও এটি এমন স্বচ্ছ যে এর উপর মূল চিৎপদার্থের প্রতিবিম্ব প'ড়ে অন্তঃকরণের যে কোনও আকারকে উদ্ভাসিত ক'রে তুল্‌তে পারে। অন্তঃকরণ পদার্থটি যখন দীর্ঘ-প্রভাকারে কোনও বাহ্যবস্তুর উপর পড়ে, তনন অন্তঃকরণটি বৃত্ত্যাকারে সেই বস্তুর উপর প'ড়ে সেই আকার গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতে সেই বস্তুটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং বৃত্তিদ্বারা সংযুক্ত ব'লে অন্তঃকরণেও অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা জীবের সেই বস্তুর প্রমাতা বা জ্ঞাতারূপে জ্ঞান জন্মে, এবং বৃত্তিচৈতন্য বা প্রমাণচৈতন্য, জ্ঞানব্যাপার বা cognitive operation রূপে প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হ'লে সেই বাহ্যবস্তুর যে রূপ বা পরিমাণ, অন্তঃকরণও ঠিক্ সেইরূপ আকার প্রাপ্ত হয় এবং চিৎসম্পর্কে সেই আকারটি যে উদ্ভাসিত হয় তা'রই নাম সেই বস্তুর জ্ঞান হওয়া। সাঙ্খ্যযোগ মতেও ঠিক্ ঐরূপ ভাবেই বুদ্ধি বিষয় সংযুক্ত হয়, এবং বিষয়াকারে আকারিত বুদ্ধি পুরুষের ছায়া সংযুক্ত হ'য়ে চিন্ময়রূপে প্রতিভাত হয়। এ মতে বাহ্যজগতে বিষয়টি প্রকাশিত হয় না, কিন্তু বুদ্ধির রূপটি পুরুষের নিকট প্রদর্শিত হয় এবং এই বুদ্ধির রূপটি পুরুষের নিকট প্রদর্শিত হওয়ায় সেটি জানা হোল এই বোধ জন্মে। সাঙ্খ্যমতে বুদ্ধিতে জ্ঞান প্রথম ক্ষণে অস্ফুট বা নির্ব্বিকল্প থাকে এবং পরক্ষণে স্ফুট হয়।

বাচস্পতি বলেন যে, মনের সঙ্কল্প বিকল্প এই দুই বৃত্তিদ্বারা অস্ফুট জ্ঞান স্ফুটরূপে প্রতিভাত হয়; কিন্তু ভিক্ষু মনের এই ব্যাপার অস্বীকার করেন এবং বুদ্ধি ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া বস্তুতে পতিত হয় ব'লে বুদ্ধির আত্মপ্রদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয়ক্ষণে নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প বোধ জন্মে এই কথা বলেন। বুদ্ধি যে ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়ে বস্তুতে সংক্রান্ত হয় এ বিষয়ে বাচস্পতি ও ভিক্ষুতে ঐকমত্য আছে; কিন্তু বস্তুপ্রত্যক্ষে মনের যে সঙ্কল্প (synthesis) বিকল্প (abstraction) বৃত্তির কথা বাচস্পতি উল্লেখ করেছেন, ভিক্ষু তা অস্বীকার করেন। যদি বুদ্ধি নিজেই ইন্দ্রিয়প্রণালীদ্বারা বস্তুতে সংক্রান্ত হয় ব'লে মানা যায়, তবে মনের স্বতন্ত্র ব্যাপার মান্‌বার কোনও আবশ্যকতা আছে ব'লে মনে করা যায় না। এমন কি ক্ষণ ভেদে নির্ব্বিকল্প সবিকল্প ভেদেরও প্রয়োজন দেখা যায় না।

এই দুই মতেই বাহ্যজগতের রূপ অবিকৃতভাবে বুদ্ধিতে গৃহীত হয় এবং চিত্তের সম্পর্কে, ভিতরে বাহিরে উভয়ে চিৎ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দুই মত সম্বন্ধেই একটা প্রবল আপত্তি এই যে, এই দুই মতেই জ্ঞান জিনিষটাকে শুধু যেন বস্তুর ছবি তোলার মতন ক'রে দেখান হয়েছে। জ্ঞান জিনিষটা যদি শুধু ছবি তোলার মতনই একটা যান্ত্রিক ব্যাপার হোত, তবে সদ্যোজাত শিশুর বস্তুজ্ঞান ও পরিণতবয়স্ক পণ্ডিতের বস্তুজ্ঞান দুইই এক হোত। কিন্তু তা ত নয়। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বে গোড়ায় যে আলোচনার অবতারণা করা গিয়েছিল সেই কথায় ফিরে যাওয়া যেতে পারে। বাহ্যজগতের রূপ যে অন্তর্জগতে বর্ণরূপে ফুটে ওঠে, সেই অস্ফুট ফুটে ওঠা থেকে জ্ঞানরাজ্যের আরম্ভ। বাহ্যজগতের আলোক কম্পন জৈবজগতের নাড়ীরাজ্যে এসে নাড়ীর বিশেষ কম্পন এবং বিচিত্র জৈবপরিবর্ত্তন ও জৈবপরিস্ফুরণে পরিণত হয়। সে পরিবর্ত্তন

জড়রাজ্যের আলোককম্পনের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু তা যতই স্বতন্ত্র হোক্ তা কোনওরূপ জ্ঞানস্ফুরণ নয়। আলোককম্পনের অনুবর্ত্তী জৈবব্যাপারটি যখন কোনও অব্যক্ত বর্ণবোধ রূপে ফুটে ওঠে, তখন সেই ফোটাটি যতই অব্যক্ত হোক্ সেটা একটা স্বতন্ত্র রাজ্যের স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ। কিন্তু যেমন জৈবজগতের প্রথম প্রাণক্রিয়া অস্ফুট অথচ ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণিশরীরে সেই প্রাণক্রিয়ার বহুধা বিচিত্র জটিল লীলাপ্রকাশ দেখা যায়, তেমনি সদ্যোজাত শিশুর অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদির বোধ বিচিত্র জ্ঞানব্যাপারে পরিণত হয়। বাহিরের আলোককম্পনের রূপটি যখন অস্ফুট বর্ণবোধ রূপে পরিণত হয় তখন সে রূপটিকে লালও বলা যায় না, নীলও বলা যায় না। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ, ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসায় অনেকটা অল্প বিস্তর ঐকমত্য দেখা যায়। ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রত্যক্ষ লক্ষণের ব্যাখ্যাবসরে শুধু ইন্দ্রিয়দ্বারা যেটুকুকে পাওয়া যায় সেইটুকুকে ধর্ম্মোত্তর স্বলক্ষণ ব'লে বর্ণনা করেছেন। স্বলক্ষণ কথাটা সোজা কথায় বল্‌তে গেলে এই বোঝায় যে, সেটা একটা বিন্দু বটে, কিন্তু সে বিন্দুটা কি তা বলা যায় না। কারণ তার কোনও পরিচয় নাই। পরিচয় হ'তে গেলেই পূর্ব্ব দৃষ্টের সহিত এক করা চাই। এক করা ব্যাপারটি চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা হয় না, কারণ পূর্ব্বদৃষ্টটি বর্ত্তমানে চোখের সাম্‌নে উপস্থিত নাই। পূর্ব্বদৃষ্টাপরদৃষ্টং চার্থমেকীকুর্ব্বদ বিজ্ঞানম্ অসন্নিহিতবিষয়ম্। পূর্ব্বদৃষ্টস্য অসংনিহিতবিষয়ত্বাৎ। অসন্নিহিতবিষয়ং চার্থনিরপেক্ষম্ ...ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানং তু সন্নিহিতমাত্রগ্রাহিত্বাদর্থসাপেক্ষম্। ইন্দ্রিয়দ্বারা যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু একটা কিছু বটে, কিন্তু কি তা বল্‌বার উপায় নাই। এই কিছু যা ইন্দ্রিয়দ্বারা পাওয়া গেল তাকে যে পূর্ব্বদৃষ্টের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেওয়া ও তার যে একটা লাল বা নীল নাম দেওয়া এটা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নয়, এটা কল্পনার খেলা। এই

কল্পনাটা যে কোথা থেকে আসে, কেমন ক'রে কখন তাকে যথা-যোগ্যভাবে নিবেশ করে সে বিষয়ে ধর্ম্মোত্তর একরূপ নিরুত্তর। ন্যায়বৈশেষিকেও নির্ব্বিকল্প, সবিকল্প এই দ্বিবিধ জ্ঞান মানা হয়েছে। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, বস্তুর প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে তার জাতি ও গুণ প্রভৃতিরও প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু সবিকল্প দশায় নাম সংযুক্ত হয় ব'লে নির্ব্বিকল্প দশায় ঐ বোধটিই নামসংযোগে স্ফুটতর হয়। আমি যখন একটি কমলা দেখি আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় যে তখন কেবলমাত্র কমলাটির রূপ ও সেই বিশিষ্ট কাঠিন্যের সহিত সংযুক্ত থাকে তা নয়, কিন্তু সেই রূপ ও কাঠিন্য যে রূপ ও কাঠিন্য-জাতির সহিত সমবায় সম্বন্ধে সংযুক্ত এবং যে বস্তুটিতে ঐ রূপ ও কাঠিন্য গুণদ্বয় আশ্রয় করিয়া আছে তাহাদের সহিতও সংযুক্ত হয়। প্রথম অবস্থায় এই ইন্দ্রিয়সংস্পর্শে একটা মূঢ় আলোচনা জ্ঞান হয়, এবং তাহার ফলে পূর্ব্বানুভূত স্বাদও তাহার সুখসাধনত্বের স্মরণ হয় এবং তাহার ফলে ঐ ফলটিকে সুখকর ব'লে বোধ জন্মে। কিন্তু এই মনের ব্যাপার থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপারটিকে এই কারণে প্রত্যক্ষ বলা যায় যে, যদিও স্মরণকে এ স্থানে সহকারী বলা যায় তথাপি যেহেতু এ ব্যাপারটি ইন্দ্রিয়স্পর্শ থেকে উৎপন্ন এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়স্পর্শকে অবলম্বন ক'রে এটি গ'ড়ে উঠেছে, সেই জন্য একে প্রত্যক্ষই বলা উচিত। "সুখাদি মনসা বুদ্ধা কপিত্থাদি চ চক্ষুষা। তস্য কারণতা তত্র মনসৈবাবগম্যতে॥" (ন্যায়মঞ্জরী, পৃষ্ঠা ৬৯)। বাচস্পতি তাৎপর্য্যটীকায় ন্যায়মত ব্যাখ্যাবসরে বলেন যে, প্রাথমিক নির্ব্বিকল্পদশায় রূপ, পরিমাণ, জাত্যাদি সমস্তই পাওয়া যায় কিন্তু তথাপি তখন নাম সংযুক্ত হয় না বলিয়া "এইটি একটি কমলা" এরকম বোধ হয় না।

এই অবিকল্প অবস্থায় সেই সেই রূপাদি ব্যক্তি ও রূপসমবেত জাতি এই উভয়েরই জ্ঞান হ'লেও সেই সেই রূপাদির সহিত

জাত্যাদির সহিত সেই সেই বিশিষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। আলোচিত পদার্থটির মধ্যে সামান্য, বিশেষ প্রভৃতি যা কিছু আছে সমস্তই পিণ্ডাকারে গৃহীত হ'লেও সেই সেই বিশিষ্ট সম্বন্ধে সেগুলিকে জানা যায় না। (জাত্যাদিস্বরূপগাহি ন তু জাত্যাদীনাম্ মিথো বিশেষণবিশেষ্যাবগাহীতি যাবৎ তাৎপর্য্যটীকা পৃষ্ঠা ৮২) ন্যায়কন্দলীতে শ্রীধরও বৈশেষিক মতের প্রত্যক্ষ বিচার প্রসঙ্গে এই মতেরই পোষকতায় বলেছেন যে, নির্ব্বিকল্পদশায় সামান্য (universal) এবং বিশেষ (particular) বা স্বগতভিন্নতা এ উভয়ই পরিলক্ষিত হ'লেও তৎকালে অন্য বস্তুর স্মরণ হয় না ব'লে অপেক্ষামূলক তুলনায় যে ভেদ এবং ঐক্যটি প্রকাশ পায় সেইরূপ-ভাবে সামান্যবিশেষের জ্ঞান হয় না (সামান্যং বিশেষম্ উভয়মপি গৃহ্লাতি যদি পরমিদং সামান্যম্ অয়ং বিশেষঃ ইত্যেবং বিবিচ্য ন প্রত্যেতি বস্তুন্ত-রানুসন্ধানবিরহাৎ পিণ্ডান্তরানুবৃত্তিগ্রহণাদ্ধি সামান্যং বিবিচ্যতে ব্যাবৃত্তি-গ্রহণাদ্ বিশেষোয়মিতি বিবেকঃ—ন্যায়কন্দলী পৃষ্ঠা ১৮৯)। এই বিষয়ে বাচস্পতি ও শ্রীধরের মতের প্রধান ভেদ এই যে, শ্রীধর যে তুলনায় কথা তু'লে বলেছিলেন যে অন্যবস্তুর কথা স্মরণ হ'লে তবে তাহার সহিত সমতায় সামান্য বোধ এবং পৃথকতার ভেদ বুদ্ধি জন্মে, বাচস্পতি তা না তু'লে নামসংযোগের ফলেই অবিকল্পদশায় বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মে এই কথাই মাত্র বলেছেন। গঙ্গেশানুবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়ি-কেরা বলেন যে, নির্ব্বিকল্প দশায় কেবলমাত্র বিশেষণের বা গুণাদির জ্ঞান জন্মে, কিন্তু সে অবস্থায় যে বিশেষ্যকে আশ্রয় ক'রে ঐ গুণগুলি রয়েছে তার জ্ঞান হয় না। যদিও এই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারি না তথাপি আমাদের বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের কারণস্বরূপ এইরূপ নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ না মান্‌লে চলে না (বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানম্ প্রতি হি বিশেষণতাবচ্ছেদব প্রকারম্ জ্ঞানম্ কারণম্—তত্ত্বচিন্তামণি পৃষ্ঠা ৮১২)। এই জাত্যাদিযোজনা-

রহিত বৈশিষ্ট্যানবগাহী নিষ্প্রকারক জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়ব্যাপারে প্রত্যক্ষ না হ'লেও, এই নির্ব্বিকল্প জ্ঞানকে আমাদের সবিকল্প জ্ঞানের কারণ ব'লে মান্‌তে হয়। কুমারিল ও প্রভাকরও বলেন যে নির্ব্বিকল্প দশায় সামান্য ও বিশেষ লক্ষিত হ'লেও ঐ অবস্থায় অন্য বস্তুর স্মরণ হয় না ব'লে ঐ সামান্যবিশেষের বোধ "এটি একটি কমলা লেবু" এই বিশিষ্ট বোধরূপে প্রকাশ পায় না। এ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় দার্শনিকদের মতের বিস্তৃত উল্লেখ এই ক্ষুদ্র বক্তৃতায় করা সম্ভব নয়। তবে এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র কাণ্টের উল্লেখ ক'রে বল্‌তে পারি যে, বৌদ্ধেরা যে নির্ব্বিকল্প দশায় কোনও একটা স্বলক্ষণ কিছু দেখা যায় ব'লে মেনেছিলেন, কাণ্ট্ তাও মানেন না। কাণ্ট্ বলেন যে, ইন্দ্রিয়পথে বহির্জগৎ থেকে কিছু একটা আসে কিন্তু সেটা যে কি তা আমরা জানি না। সেই অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়জসামগ্রীকে অবলম্বন ক'রে ইন্দ্রিয়বিকল্প তা'র উপর দিক্‌কালের সৃষ্টি ক'রে তাকে দিক্‌কালে বিশেষিত ক'রে তোলে, এবং তৎপরে মনোবিকল্পে নামজাত্যাদি নানা বিকল্পে বিকল্পিত ক'রে "এটি লাল" "এটি এই বস্তু" ইত্যাদি বিশিষ্ট প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ করেও সেগুলিকে সম্বন্ধরূপে বাক্যাকারনির্দ্দিষ্ট বোধে (judgments) পরিণত করে।

এ বিষয়ে আর বহু মত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যতটুকু বলা হয়েছে তা'তে এটুকু দেখা যায় যে, আমাদের দেখার মধ্যেও ভাবার অংশ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। অস্ফুট বর্ণ বোধটি লাল বা নীল ব'লে পরিচিত হওয়ার পূর্ব্বে তার মধ্যে অনেকখানি পরিমাণে মনোরাজ্যের কাজ চলেছে। বৌদ্ধেরা এই মনোরাজ্যের স্বতন্ত্র ব্যাপারকে বিকল্প ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বিকল্প যে কত রকমের এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি, তারা কেমন ক'রে ইন্দ্রিয়লব্ধ স্বলক্ষণ সামগ্রীকে পরিবর্ত্তিত করে, সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই বলেন নাই। কাণ্ট্ এই বিকল্পের নানাবিধ

বৃত্তির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু এ বিকল্পগুলির মধ্যে কোনও মূলগত ঐক্যের সন্ধান দিতে পারেন নাই। মনের মধ্যে সকলেরই যদি এই বিকল্পবৃত্তিগুলি সমানভাবে কাজ করতে থাকে, তবে সদ্যোজাত ও বৃদ্ধের, মূর্খ ও পণ্ডিতের জ্ঞানবৈষম্য কেন হয় এ প্রশ্নেরও তিনি কোনও উত্তর দিতে পারেন নি। জড়জগৎ হ'তে উপলব্ধ অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়সামগ্রীর উপর কি উপায়ে এই বিকল্পবৃত্তিগুলি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলেন নি। যদি সমস্ত সম্বন্ধই এই বিকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে বহির্লব্ধ ইন্দ্রিয় সামগ্রীর কোনও ভেদ থাকে না, এবং সেগুলি দিক্‌কাল প্রভৃতি কোনও উপাধি বা বিশেষণে বিশেষিত না হ'য়ে বিভিন্ন বিকল্প বৃত্তিদ্বারা কি উপায়ে নানাভাবে বিচিত্রিত হ'তে পারে সে প্রশ্নেরও কোনও সমাধান হয় না। আর একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে, কি ন্যায়-/বৈশেষিক, কি বৌদ্ধ, কি মীমাংসক, কি কাণ্ট্ সকলকেই স্মৃতিশক্তিকে মেনেই নিতে হয়েছে; কিন্তু স্মৃতিটা যে কি ব্যাপার কেহই সে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করেন নাই। অথচ মনোরাজ্যের অধিকাংশ গূঢ় ব্যাপারই এই অতীত স্মৃতির সহিত বর্ত্তমানের আহৃত জ্ঞানসামগ্রীর সহিত সম্বন্ধস্থাপনের উপর নির্ভর করছে। ন্যায়-বৈশেষিক বলেন যে, সামান্য ও বিশেষ এ উভয়ই চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা বহির্জগতেই দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাই যদি হয়, তবে সেগুলির বোধের জন্য স্মৃতির এমন আবশ্যকতা কেন মানি. সেগুলির যদি বোধই না হয় তবে সেগুলিকে অবলম্বন ক'রে স্মৃতিশক্তিদ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুগুলিকে মানসপটে উপস্থাপিত করিয়া তুলনা বৃত্তিই বা কি ক'রে সম্ভব। যেগুলি জানা আছে সেইগুলির মধ্যেই তুলনা সম্ভব। কিন্তু কতকগুলি জানা কতকগুলি না জানা, এদের মধ্যে কি ক'রে তুলনা হ'তে পারে। তা ছাড়া কি ভারতীয় কি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র এর কোনও বিভাগেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞান বিভিন্ন থাকিয়াও কেমন ক'রে

সংশ্লিষ্ট হয়, কেমন ক'রে পূর্ব্বাহৃত জ্ঞানসঞ্চয় পরকালের আহৃত জ্ঞানের প্রকার ও তাৎপর্য্যকে বিশেষিত ও পরিবর্ত্তিত করতে পারে তার কোনও কথাই বলেন নি। ন্যায়বৈশেষিক বলেন যে, কতকগুলি জ্ঞানসামগ্রীর সন্নিবেশে ও সংঘটনে আত্মার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এইরূপে নূতন নূতন সামগ্রীর সন্নিবেশে আত্মায় নূতন নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কথা যদি সত্য হয় তবে এই যে একটি জ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং অপর আর একটি উৎপন্ন হয় এদের মধ্যে কি ক'রে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, স্মরণই বা কি ক'রে সম্ভব হয়। এর উত্তরে হয়ত এ কথা বলা যায় যে, নূতন জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয় তখন পূর্ব্বজ্ঞানটি সংস্কাররূপে আত্মায় থাকে এবং পুনরায় সাদৃশ্য বোধে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞানটি সংস্কারে পরিণত হয় এবং সংস্কার থেকে পুনরায় জ্ঞান হয় এ কথার অর্থ কি, কোনও দার্শনিকই এ প্রশ্নের বিচার করেন নি। সংস্কারাবস্থায় স্থিত অনুদ্বুদ্ধ জ্ঞানের সহিত নির্ব্বিকল্পস্থ মূঢ় জ্ঞানসামগ্রীরই বা কিরূপে সাদৃশ্য বোধ হয় এবং সেই সাদৃশ্যবোধই বা কার হয় এবং কিরূপেই বা এই সাদৃশ্যবোধ থেকে স্মরণ হয়, এসমস্ত প্রশ্নেরই আজ পর্য্যন্ত কোনও তথ্য নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। এই সম্বন্ধে আমাদের দেশে যা কিছু আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে যোগশাস্ত্রের আলোচনাটিই অপেক্ষাকৃত গভীর। যোগশাস্ত্রের মতে জ্ঞানের প্রকারটি বুদ্ধিরই একটি প্রকারভেদ মাত্র। চিদাভাসের দ্বারা এই বুদ্ধির প্রকার ভেদটি জ্ঞানাকারে প্রতিভাত হয় এবং বুদ্ধির অন্য আর একটি প্রকার উত্থাপিত হ'লে বুদ্ধির পূর্ব্ব প্রকারটি তা'র নিজের মধ্যে তিরোহিত হয়। এই তিরোহিত প্রকারটির নাম সংস্কার। বুদ্ধির মধ্যে যে এই সংস্কারের সঞ্চয় হয় এই দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে বুদ্ধিকে চিত্ত বলে। অনাদি জন্মপরম্পরাসঞ্চিত সংস্কারগুলি এই ভাবে চিত্তের মধ্যে সঞ্চিত হয়। বুদ্ধির কোনও তিরোহিত প্রকার

বা সংস্কারটি যখন উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বুদ্ধিতে প্রকট হ'য়ে উঠে তখনই তাকে স্মৃতি বলে। এই ভাবে জ্ঞান থেকে সংস্কার এবং সংস্কার থেকে স্মৃতি এবং স্মৃতি থেকে পুনরায় সংস্কার এইরূপ পরম্পরা সর্ব্বদাই চলেছে। এবং এই জন্য বুদ্ধিরূপে যা কিছু প্রকাশ পেতে পারে তা সংস্কার দ্বারা অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং অপর দিকে বুদ্ধিরূপে যা প্রকাশ পায় তা' নূতন সংস্কারকে উৎপন্ন ক'রে পূর্ব্ব সংস্কারকে পরিবর্ত্তিত করতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যার একটা প্রধান দোষ এই যে, এই মতটিতে বুদ্ধিকে একেবারে জড়বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেইজন্য এই মতের ব্যাখ্যাটি অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান কালের মানসিক ব্যাপারের যে সমস্ত physiological এবং mechanical explanation দেখিতে পাওয়া যায় এ গুলিও অনেকটা সেই রকমের। এ মতে সমস্ত মানসিক ব্যাপারটাই একটা জড়ব্যাপার, কেবলমাত্র বুদ্ধির কোনও একটি বিশেষরূপ যখন পুরুষের চিদা-ভাসযুক্ত হয় তখন সেই রূপটি চেতন হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের চিত্ত যদি অনাদি জন্মপরম্পরাসঞ্চিত সংস্কারে পূর্ণ হয়েই থাকে তবে শিশু ও পরিণতবয়স্কের মধ্যে পার্থক্য কেন দেখা যায়? Physiological ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়েও আজকাল ফ্রয়েড্ শিষ্যেরা sub-conscious mind এর নানা layerএ পূর্ব্বানুভূত বিষয় অভিলাষ প্রীতি অপ্রীতি প্রভৃতি সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয় এ কথা জোর গলায় বলতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু mind জিনিষটি কি একথার ধার দিয়েও তাঁরা যান না, অথচ তাঁরা mindকে জড় ব'লেও স্বীকার করেন না। Mind যদি জড়ই না হয়, তবে তার layer বা পর্দ্দা থাকা কিরূপে সম্ভব হয়, এবং পর্দ্দায় পর্দ্দায় পূর্ব্বানুভূত বিষয় সঞ্চিতই বা কিরূপে হয়। যদি যোগের মত অবলম্বন ক'রে বুদ্ধিকে একান্তই জড় ব'লে স্বীকার করি, তবে

হয়ত বুদ্ধির পর্দ্দায় পর্দ্দায় সংস্কার সঞ্চিত হয় একথা বেশ চল্‌তে পারে ; কিন্তু তা হ'লে বিভিন্ন সংস্কারগুলি ও বুদ্ধির চিদাভাসসম্পন্ন জ্ঞানরূপটি ইহারা প্রত্যেকে পরস্পর দৈশিক বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন। এই ভাবে দৈশিক বিচ্ছেদ মান্‌তে গেলে কোনও জ্ঞানের মধ্যেই কোনও সংস্কারকে পাওয়ার উপায় নেই, এবং সেই জন্য কোনও জ্ঞানের মধ্যেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রভাব থাকা উচিত নয় ; অথচ আমরা প্রতি পদেই দেখ্‌তে পাই যে, আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং অনুভূত বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুসারে আমাদের প্রত্যেকটি জ্ঞানের যে শুধু একটি প্রকারের বৈশিষ্ট্য ঘটে তা নয়, প্রত্যেকটি জ্ঞানের সঙ্গে সেই জ্ঞানকে ছাড়িয়ে তার নানামুখী তাৎপর্য্য (যাকে ইংরেজী পরিভাষায় meaning বলা যায়) হীরকের প্রভার ন্যায় তার চারিদিকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে ; এই তাৎপর্য্য ছাড়া শুধু জ্ঞান মূক ; এই তাৎপর্য্যের বিশেষত্ব এই যে. এতে আমাদের প্রত্যেকটি জ্ঞান সমস্ত পূর্ব্বানুভূত বোধ শরীরের মধ্যে ঠিক কি ভাবে গ্রথিত হচ্ছে সেইটি ইঙ্গিত ক'রে সূচনা করে। একজন উদ্ভিদ্বিৎ একটা গাছকে, কি একজন চিত্রী একটি চিত্রকে যে ভাবে দেখে সে দেখা একজন সাধারণ লোকের দেখা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। উদ্ভিদ্বিৎ বা চিত্রীর যে উদ্ভিদ বা চিত্র দেখে নানাকথা মনে পড়ে, সেই জন্য যে তার দেখার সঙ্গে অন্যের দেখার তফাৎ তা নয়, কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা স্পষ্ট ভাবে স্মরণ না হ'য়েও তাদের যে কোনও দেখাটিই তার সমস্ত জীবনব্যাপী দেখা ও জানার ইতিহাসের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত এবং সেই জড়ানর জন্য এমন একটি বিশিষ্টভাবে বিশেষিত ও এমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সঙ্কেত, ইঙ্গিত বা তাৎপর্য্যের দ্বারা উদ্ভাসিত যে, সেই দেখাটির মধ্যে সমস্ত জীবনের দেখা জানার ইতিহাসের একটি বিশেষ রকমের ছোপ লেগে

থাকে। এই যে প্রত্যেক দেখার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের দেখা-জানার ইতিহাসের একটা মণি-বিচ্ছুরণ, একটা তাৎপর্য্য ইঙ্গিত অনুষক্ত থাকে এটাকে স্মরণ বলা চলে না, সংস্কার বলা চলে না, অথচ এইটির দ্বারা সেই দেখাটির যথার্থ বিশিষ্টতাটুকু প্রকাশ পায়। মনোরাজ্যের ব্যাপার এত জটিল এত বিস্তৃত যে, তার একটা মোটামুটি রকমের বিশ্লেষণ করতে গেলেও একটা বিরাট্ গ্রন্থ লেখবার আবশ্যক, এতটুকু ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কখনও সে কাজ করা চলে না। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, জীবরাজ্যের ব্যাপারের চেয়েও মনোরাজ্যের ব্যাপার আরও জটিল, আরও অনেক বিচিত্র, আরও গূঢ় ও দুষ্প্রবেশ্য। Psychology ও Epistemology এই দুই দিক্ দিয়ে মনোরাজ্যের ব্যাপার গুলি বুঝ্‌বার জন্য যথেস্ট চেষ্টা চলেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত Mind জিনিষটা যে কি তা আমরা একরকম কিছুই জানিনা, এবং মনোরাজ্যের ব্যাপারগুলির যতটুকু আমাদের কাছে ধরা পড়েছে তার অনেক বেশীগুণ জিনিষ আমাদের অজ্ঞাত রয়েছে। একটুখানি অস্ফুট ইন্দ্রিয়সামগ্রী থেকে একটু অস্ফুট বর্ণবোধ, স্পর্শবোধ বা শব্দবোধ; এবং সেই থেকেই মনোরাজ্যের ব্যাপারের আরম্ভ; আর তারপর বরাবর এর নিগূঢ় রহস্যের বিচিত্র লীলাময় ব্যাপার। মানসিক ব্যাপারগুলি শরীর ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব'লেই আমরা অনুভব করি এবং এই স্বাতন্ত্র্য ও পৃথকত্ব এত বহুল পরিমাণে সর্ব্বজনস্বীকৃত ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে (Psycology) সুগৃহীত যে, কোনও মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা করতে গেলে শরীর প্রক্রিয়া দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা চলে না। হয়ত প্রত্যেক মানস ব্যাপারের অন্তরালে আমাদের মস্তিষ্কের মস্তুলুঙ্গের মধ্যে তদনুপাতী নাড়ীপদার্থের মধ্যে নানারূপ আশ্লেষ বিশ্লেষের কাজ চলেছে, কিন্তু তাই ব'লে আমাদের কোন দার্শনিক চিন্তা বা

অন্যবিধ তত্ত্বচিন্তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি কেউ বলে যে ঐ চিন্তাটির মূল্য আর কিছুই নয়, এ কেবলমাত্র মস্তিষ্কের কোনও অংশের মস্তুলুঙ্গ পদার্থের অর্দ্ধ আউন্সের ঈষৎ স্থান সম্বরণ বা আশ্লেষণ বিশ্লেষণ মাত্র, তবে সে ব্যাখ্যাটি কি নিতান্তই বাতুলের মত হবে না। প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত মস্তুলুঙ্গ পদার্থের কোনও না কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণরূপেই জৈব পরিবর্ত্তন; সে পরিবর্ত্তনে শুধু এইটুকুমাত্র বুঝা যায় যে, জৈব ব্যাপারের সঙ্গে মনোব্যাপারের একটা অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হ'ক তাতে কখনই মনোব্যাপারের স্বরূপকে বা পদ্ধতিকে কোনও রূপে স্পষ্টতরভাবে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে পারে না। যেমন জৈবব্যাপারের পিছনে সর্ব্বদাই নানারকম মতব্যাপার কাজ করছে, এবং এক হিসাবে যদিও জৈবশক্তিকে জড়শক্তিরই বিকার ব'লে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু তথাপি জৈব ব্যাপার জড়ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্, তেমনি মনোব্যাপার ও জৈবব্যাপারের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকলেও জৈব ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং জৈব ব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যাতেই মনোব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। কারণ এ দুটি রাজ্যের ব্যাপার পরস্পর এতই পৃথক্ যে, জৈব ব্যাপারের যতই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা যাক্ না কেন, জৈব ও মনোব্যাপারের পরস্পরানুপাতিত্ব নির্দ্ধারণ করতে যতই চেষ্টা করি না কেন, মনোব্যাপারের প্রকৃতি জৈব ব্যাপারের প্রকৃতি থেকে এতই সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন যে মনোরাজ্যের সমস্ত ব্যাপারগুলি তদনুপাতী জৈব ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ একটা স্বতন্ত্র রাজ্যের। আধুনিককালে Russell, Watson প্রভৃতি মনোব্যাপারগুলিকে জৈবব্যবহারের উপমায় ব্যাখ্যা করতে অনেক চেষ্টা করেছেন এবং প্রাচীনকালেও স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য এই সাদৃশ্য

লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ। যথা হি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞান প্রতিকূলে জাতে ততোনিবর্ত্তন্তে, অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে। যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হন্তুময়ম্ ইচ্ছতি ইতি পলায়িতুমারভ্যন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তংপ্রত্যভিমুখা ভবন্তি। এবং পুরুষা-অপিব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টান্ আক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততোনিবর্ত্তন্তে, তদ্বিপরীতান্ প্রতি প্রবর্ত্তন্তে অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ। পশ্বাদীনাং চ প্রসিদ্ধোঽবিবেকপুরঃসরঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ। তৎসামান্যদর্শনাৎ ব্যুৎপত্তিমতামপি প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্তৎকালঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে।" কিন্তু যদিও আমাদের অনেক বাহ্যব্যবহারের সঙ্গে পশু ব্যবহারের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মনোব্যাপারের অনেক-গুলিই এমন যে, সে গুলিকে কিছুতেই পশুব্যবহারের সাদৃশ্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এবং Russell প্রভৃতিরা অনেক চেষ্টা করিয়াও যে সমস্ত সাদৃশ্য দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, সেটুকু মনো-ব্যাপারের অতি অল্প স্থানই অধিকার করে। এই ব্যবহারিক দিগের (Behaviourist) মতে যেটুকু সত্যতা আছে তাতে শুধু এইটুকু প্রমাণ হয় যে, যেমন জড়ব্যাপারের খানিকটা অংশ জৈবব্যাপারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে রয়েছে তেমনি জৈবব্যাপারেরও খানিকটা অংশ মনোব্যাপারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে রয়েছে। উঁচু উঁচু ধাপের প্রাণিবর্গের মধ্যে যেমন দেখা যায় যে তারা তাদের প্রয়োজন অনুসারে অর্দ্ধমূঢ়ভাবে জীবনযাত্রার অনুকূল কার্য্যে তৎপরতা দেখায় এবং প্রতিকূল কার্য্য থেকে নিবৃত্ত হয়, মানুষের মধ্যেও তা অনেক পরিমাণে দেখা যায়, কারণ মানুষও একটি প্রাণিবিশেষ; কিন্তু মানুষের মধ্যে জৈবকার্য্যের বা জীবন-যাত্রাকার্য্যের সহিত সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্টও অনেক এমন ব্যাপার

দেখা যায় যাকে কিছুতেই জৈব ব্যাপারের অন্তর্গত ব'লে মনে করা যেতে পারে না। এইটিই হচ্ছে যথার্থভাবে মনোরাজ্যের অধিকার। Russell বলেছেন, "Man has developed out of the animals, and there is no serious gap between him and the amoeba. Something closely analogous to knowledge and desire as regards its effects on behaviour exists among animals even where what we call 'consciousness' is hard to believe in; something equally analogous exists in ourselves in cases where no trace of 'consciousness' can be found. It is therefore natural to suppose that, whatever may be the correct definitions of consciousness, consciousness is not the essence of life or mind.. কিন্তু এই কথা প্রমাণ করতে গিয়ে Russell তাঁর Analysis of Mindএ যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন তার অধিকাংশই হচ্ছে মানুষের জীবনের সেই দিক্‌টা দিয়ে যে দিক্‌টায় সে জৈবযাত্রার প্রয়োজনের সহিত সম্বদ্ধ বা যে দিক্‌টায় মানুষ জড়প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু আমাদের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে এবং গোটা মনোব্যাপারের আত্মগতি, আত্মনিয়ম, আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতনরাজ্যের নূতন নূতন নিয়মপদ্ধতি দেখ্‌তে পাই যেগুলিকে কিছুতেই জৈবব্যাপারের কোঠায় ফেলা যায় না। কেমন ক'রে একটা অস্ফুট বর্ণবোধ ক্রমশঃ সঞ্চিত হ'য়ে স্ফুট লাল বা নীল বোধে পরিণত হয়, কেমন ক'রে বোধের মধ্যে বোধ সঞ্চিত থেকে স্মৃতিরূপে প্রকাশ পায় এবং সংস্কাররূপে থেকে জ্ঞানের প্রকারকে তাৎপর্য্যসমন্বিত করে, কেমন ক'রে বিশেষ বা concrete থেকে

সামান্য বা universalsএর নানা সম্পর্ক বিচার ক'রে সেই প্রণালীতে বিশ্বের নানা তথ্যকে জ্ঞানের জালের মধ্যে ধ'রে রাখে, কেমন ক'রে নানা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারা, ইচ্ছাধারা, সুখ দুঃখ, প্রীতি অপ্রীতি, কুশলাকুশলের বিচিত্র বিভিন্নধারার মধ্য দিয়া মনোজীবনের ঐক্যটি নির্ব্বাহিত হয়, তা কোনও রূপেই ব্যাখ্যা করা যায় না বা তার কারণ নির্দ্দেশ করাও সম্ভবপর নয়।

তাহা হইলে স্থূল কথা দাঁড়িয়েছে এই যে, জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য এই তিনটি রাজ্য পরস্পরসম্বদ্ধ হ'য়ে রয়েছে—জড়-রাজ্য জীবরাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং জীবরাজ্য মনোরাজ্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, অথচ প্রত্যেকটি রাজ্যের সমস্ত ব্যাপারেই তার নিজের বিশিষ্ট নিয়মে চালিত হয় এবং কোনও রাজ্যের নিয়মের দ্বারা কোনও রাজ্যের ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা চলে না। প্রত্যেকটি রাজ্যের নানা ব্যাপারের মধ্যে যে একটি ঐক্য আছে সে ঐক্যটির অর্থ সামঞ্জস্য অর্থাৎ তাহার কোনও ব্যাপারটি অপর ব্যাপারগুলিকে অতিবর্ত্তন বা অতিক্রম করে না এবং পরস্পর পরস্পরের সহযোগে চলে এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরে গ্রথিত হ'য়ে যে ইতিহাস রচনা করে সেই ইতিহাসের আনুগত্যে প্রত্যেকটি ব্যাপারের পদ্ধতি ও প্রণালী নিরূপিত হয়। এম্‌নি ক'রে প্রত্যেকটির নিজ নিজ রকমের স্বাতন্ত্র্য থেকেও সমগ্রের নিয়মের দ্বারা প্রত্যেকটি সমগ্রের অনুকূল ব্যবহারে নিয়ন্ত্রিত থাকে। কিন্তু তিনটি রাজ্যের মধ্যে পরস্পরের যে ঐক্য সে ঠিক এ জাতীয় ঐক্য নয়। সে ঐক্যের অর্থ তদর্থযোগিতা, অর্থাৎ একটি যে অপরটির কাজে লাগ্‌তে পারে, এ সেই জাতীয় ঐক্য। এই ঐক্যের নিয়মে জড়বস্তু জীবোপযোগী কার্য্যে ব্যবহৃত হ'য়ে জীবের সহায়ক হয়, আবার জৈব ব্যাপারগুলি মনোব্যাপারের সাহায্যে লেগে

মনোরাজ্যের কাজে লাগে। এই ঐক্যের তিনটি রাজ্যের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চ'লে প্রত্যেকটি রাজ্যকে গৌণমুখ্যভাবে অপর দুইটি রাজ্যের সহায়তায় নিযুক্ত করে। বিশ্বময় আমরা এই তিনটি রাজ্যের আদান প্রদানের পালায় নূতন নূতন সৃষ্টিপরম্পরা দেখ্‌তে পাই। এক দিকে দেখ্‌তে পাই যে জৈব শক্তি চক্রের সহিত জড়শক্তি চক্রের পরস্পরের অনুযোগিতায় ও সঙ্ঘর্ষে ও এই অনুযোগিতা ও সঙ্ঘর্ষের বিবিধবৈচিত্রে নানা জীব পরম্পরা গ'ড়ে উঠ্‌ছে। Struggle for existence or law of natural selection এ দুইটিই এই জীবজড় সংঙ্ঘর্ষের নামান্তরমাত্র, আবার. law of accidental, variation, law of mutation প্রভৃতি নানাবিধ বৈষম্যের মধ্যে জড়ের যে জীবানুযোগিতা আছে ও জৈবশক্তিচক্রের যে জড়জগৎ হইতে আহরণ করিবার ক্ষমতা আছে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। আবার অপর দিকে জৈবরাজ্যের ঠিক কোন্ স্থান থেকে মনোরাজ্যের বিচ্ছুরণ আরম্ভ হয়েছে তা বলা কঠিন। মনুষ্য পর্য্যন্ত পৌঁছবার পূর্ব্বে অনেকদূর পর্য্যন্ত উচ্চতর প্রাণিজীবনে দেখ্‌তে পাই যে, মনোরাজ্যের আত্মপ্রকাশ অনেকখানি পরিমাণে জৈবরাজ্যের সঙ্ঘর্ষে ঘৃষ্ট হ'য়ে জৈবব্যাপারের দ্বারা কবলিত হয়ে instinctive habit বা behaviour রূপে প্রকাশ পায়। মানুষের মধ্যে এসে দেখি যে, জৈবশক্তির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মনোরাজ্যের শক্তিও স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তথাপি একটু অনুধাবন কর্‌লেই দেখা যায় যে, মনোব্যাপারের যতখানিকে আমরা নিচক মনোব্যাপারেরই অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করি ঠিক ততখানিই যে খাঁটি মনোরাজ্যের ব্যাপার তা নয়। জৈবশক্তির অনেকখানি পরিমাণে মনোব্যাপারের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে মনঃশক্তিরূপে প্রকাশ

পায়, আবার মনঃশক্তিরও অনেকখানি জৈবশক্তিদ্বারা অভিভূত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারে না। শুধু তাই নয়, সুখ দুঃখ প্রীতি বিষাদ প্রভৃতি যে গুলিকে আমরা খাঁটি মনোনুভূতি ব'লে মনে করি সেগুলিও অন্তত খানিকটা পরিমাণে জৈবক্ষুধা বা জৈব আকর্ষণ প্রভৃতির প্রতিবিম্ব মাত্র। আর এই জৈবপ্রয়োজন সিদ্ধির দাবী জৈব অর্থ অর্থির দাবী মনোব্যাপারের মধ্যে সংক্রান্ত হয়ে মনোব্যাপারের নানাপ্রকার সৃষ্টিরও নিয়ামক হ'য়ে ওঠে। একেও প্রকারান্তরে এক রকমের voluntarism বলা যায়। বৌদ্ধ ও যোগমতের বাসনাবাদে শঙ্করাচার্য্যের অর্থ অর্থির দাবী স্বীকারের মধ্যেও বৌদ্ধদের অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদের মধ্যে এই শ্রেণীর voluntarismএর পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালের pragmatism বা behaviourismএর মধ্যেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত মতবাদের অনেকগুলির মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে, কিন্তু এঁদের ভ্রান্ততা এইখানে যে এঁরা একপেশে ভাবে কেবল তাদের দিক্ থেকেই সমস্ত জিনিষটা দেখ্‌তে চেয়েছেন। সত্য দর্শনশাস্ত্র তাকেই বলা যাবে যেটিতে সব দিক থেকে সত্য নির্দ্ধারণ করবার চেষ্টা থাক্‌বে। কোনও একদিকে প্রবল ক'রে দেখে যাঁরা অন্যদিক্‌গুলিকে খাট ক'রে দিতে চান বা উড়িয়ে দিতে চান, তাঁদের দৃষ্টি একদেশী এবং তাঁদের দর্শনও একদেশী। কিন্তু শুধু যে জৈব ও মনোব্যাপারের মধ্যে দান প্রতিদান উপযোগিতা ও বিরোধিতা চলেছে তা নয়, প্রতি কেন্দ্রে প্রতি মানুষে যে মনোব্যাপার চলেছে, ভাষার মধ্য দিয়ে মুখ, চক্ষু, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে অনবরত তাদের পরস্পরের যে বিনিময় চলেছে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্য গঠনে তার স্থান বড় কম নয়। বস্তুত জৈবরাজ্যের কবল থেকে মানুষের মধ্যে যে একটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্য গ'ড়ে উঠ্‌তে পেরেছে তার

সর্ব্বপ্রধান কারণই হচ্ছে মনে মনে আদান প্রদান। জৈব জগতে যেমন দেখা যায় যে, বিভিন্ন জীবকোষের সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যেই উচ্চতর প্রাণীর জীবনে, প্রত্যেক জীবকোষের জীবনে একটি অভূতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এনে দেয়, আবার সেই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জীবকোষ সমষ্টির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জন্মে এবং জীব-কোষসমষ্টির বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রত্যেক জীবকোষের আবার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জন্মে, এখানেও তেম্‌নি নানা মনের সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যে প্রত্যেকটি মন তার নিজের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং প্রত্যেক মনের এই বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতার দ্বারা মনঃসমষ্টি ব'লে একটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্যের সত্তা উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, এবং এই মনোরাজ্যের বিশিষ্ট প্রকৃতির দ্বারা আবার প্রত্যেকটি মন অনুভাবিত হ'য়ে ওঠে। মানুষ যদি মানুষের মধ্যে সমাজের মধ্যে বেড়ে না উঠ্‌ত, তবে মানুষের মন তার জৈব প্রকৃতি থেকে কখনই নিজেকে উপরে তার নিজের যথার্থ রাজ্যের মধ্যে ভাসিয়ে তুল্‌তে পার্‌ত না। Trans-subjective ও intra-subjective intercourse এর যদি অবসর মানুষ না পেত তবে মানুষের মন কখনই তার চিন্ময় ও চিন্তামযরূপে বেড়ে উঠ্‌তে পার্‌ত না।

এতক্ষণ যা কিছু বলা হ'ল তার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, মন ব'লে কোন একটি স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি নেই, কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যাপার-পরম্পরা ও নিয়মপরম্পরাকে সংক্ষিপ্তভাবে বোঝাবার জন্য মন শব্দটি ব্যবহার কর্‌ছি। যেমন জড়রাজ্য জৈবরাজ্য, তেম্‌নি মন বল্‌তেও একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বোঝা যায়। এই রাজ্যের ব্যাপার-পরম্পরা ও নিয়মপরম্পরার কোথায় সামঞ্জস্য, কোথায় তাদের বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব, কি তাদের প্রকারপরম্পরা এ আলোচনা এ

প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। এখন শুধু এই কথা বলতে চাই যে জৈব রাজ্যকে আশ্রয় ক'রে স্তরে স্তরে অস্ফুট থেকে স্ফুটতরভাবে এই মনোরাজ্য তার বিচিত্র ব্যাপারপরম্পরা ও নিয়মপরম্পরার মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ ক'রে তুলেছে। জৈবরাজ্যের প্রত্যেকটি জীব-কোষের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য দেখ্‌তে পাই, সে ব্যক্তিত্ব মূঢ়, সে ব্যক্তিত্বের মূল হচ্ছে জৈবব্যাপারের নিয়মকেন্দ্র, সামঞ্জস্যকেন্দ্র; তার প্রত্যেকটি ব্যাপার যে তার অন্য ব্যাপারগুলিকে অপেক্ষা ক'রে চলে, এবং প্রত্যেকটি ব্যাপার যে অন্য ব্যাপারগুলির আনুকূল্যে আপনাকে ব্যক্ত করতে চায়, কোনও সম্বন্ধটিই যে স্থির হ'য়ে না থেকে অপর সম্বন্ধগুলির সহিত স্বতই আবর্ত্তিত হ'তে থাকে, এই খানেই জীবকোষের ব্যক্তিত্বের মূল। কিন্তু মনোরাজ্যের ব্যক্তিত্বটিকে আমরা self ব'লে আত্মা ব'লে অনুভব ক'রে থাকি। কিন্তু আমি এতক্ষণ যা বলেছি তাতে আত্মা ব'লে কোনও স্থায়ী বস্তুর কথা বলিনি। এখনও বলিতে চাই নে। যা চাই সে হচ্ছে, এই আত্মপ্রত্যয়ের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া। আত্মা কাকে বলে এ কথা নিয়ে আমাদের দর্শনশাস্ত্রে খুব বিচার হয়েছে; বৌদ্ধেরা বলেছেন যে আত্মা ব'লে কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নেই; রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধ বা বিবিধ psychological entitiesএর সমষ্টি ছাড়া কোনও স্বতন্ত্র আত্মা নেই। বেদান্ত বলেছেন যে, বিশুদ্ধ চিৎপ্রকাশের নামই আত্মা, কিন্তু আমি বল্‌তে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে এই অসীম চিৎপ্রকাশের একটা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন মিথ্যা রূপ। ন্যায় বলেছেন যে, আত্মা হচ্ছে জড়বৎ একটি বস্তু, সে বস্তুকে আমাদের এই জন্য মান্‌তে হয় যে তা না হ'লে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণগুলির ত কোনও একটা থাক্‌বার আশ্রয় চাই, কারণ গুণমাত্রকেই কোনও বস্তুকে আশ্রয় ক'রে থাক্‌তে হবে, অথচ আমাদের

জানা এমন আর কোনও বস্তু নেই যাকে জ্ঞানের আশ্রয় বলা যায়। এর কোনও মতের সহিতই আমি সায় দিতে পারি নে। চিৎপ্রকাশ ব'লে স্বতন্ত্র একটি পদার্থ কেন মানি নে সে কথা সংক্ষেপে পূর্ব্বেই বলেছি। ন্যায়ের আত্মা প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত নয় ব'লে তারও কোন বিচার করা প্রয়োজন মনে করি নে। বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে, প্রতিমুহূর্ত্তের ক্ষণধ্বংসী স্কন্ধসমষ্টি ছাড়া তাঁরা কোনও স্থায়ী আত্মা স্বীকার করেন না। অথচ আমরা আত্মা বা self বল্‌তে যা বুঝি সেটা শুধু চিৎপ্রকাশও নয় বা মুহূর্ত্তের চিন্তা ভাব প্রভৃতির সমষ্টিও নয়। আত্মা বা self বল্‌তে যা বুঝি সেটা হচ্ছে একটা জীবনের সমস্ত অনুভূতির সমস্ত experienceএর একটা সঞ্চিত ইতিহাসের অভিব্যক্তি। জৈবরাজ্যের সঙ্গে মনোরাজ্যের পরস্পরের সঙ্ঘর্ষ ও আদান প্রদানে, বিভিন্ন মনের পরস্পরের আদান প্রদানে, জৈব সংযোগের মধ্য দিয়ে জড়রাজ্যের সহিত আদান প্রদানে, জৈবপ্রয়োজনের অর্থার্থির ব্যবহারে, মনোরাজ্যের নানা ব্যাপারের সংযমন নিয়মনে যা কিছু মনে ভেসে উঠ্‌ছে এবং ডুবে যাচ্ছে, তার সবগুলিই একটা বিশিষ্ট নিয়মে পরস্পর অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে গ্রথিত হচ্ছে, এবং এই সঞ্চয় ও গ্রন্থনের প্রাচুর্য্য ও বৈশিষ্ট্যের ইতিহাসের মধ্যে আমরা আমাদের আত্মবোধ বা অহম্‌বোধকে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারি। এই হিসাবে দেখ্‌তে গেলে আত্মা ব'লে যা বুঝি সেটি একটি concrete entity, অথচ সে entityটি একটি স্থির পদার্থ নয়; অথচ ক্রমধারারূপে সেটি প্রতিভাত হয় না; আমাদের যা কিছু অনুভূতি যা কিছু experience হয়েছে সেগুলি পরস্পরের মধ্যে পরস্পরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হ'য়ে হ'য়ে একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয়েছে; সে সত্তার মধ্যে অনুভূতির ক্রম নাই, আছে পূর্ব্বাপরের ক্রমাতীত অখণ্ড সত্তা। যত নূতন নূতন অনুভূতি

ক্রিয়া, ইচ্ছা, সুখদুঃখাদি নানা ভাবসম্বিৎ নূতন নূতন সঞ্চিত হ'তে থাকে সেগুলি সেই পূর্ব্বসঞ্চয়ের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে সেই অখণ্ড সত্তাটিকে স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য দ্বারা নূতন নূতন ভাবে অভিব্যক্ত ক'রে তুল্‌তে থাকে। আমার ছেলেবেলা আমাকে আমি বল্‌তে যা বুঝতাম্‌ তার অধিকাংশই খেলাধূলা ভোজনেচ্ছা প্রভৃতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে ব'লে একটা জৈববোধের মধ্যেই অনেকখানি আবদ্ধ। ক্রমশঃ নূতন অনেক দেখি শুনি, অনেক চিন্তা করি, অনেক নূতন কাজে প্রবৃত্ত হই, অনেক রকমের সুখদুঃখের আস্বাদ পাই, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমার আমিত্বও বাড়তে থাকে। সত্য বটে আমাকে আমি ব'লে যখন আমি বলি, তখন কোনও একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অনুভূতি আমাদের কাছে আসে না, আসে যেটা সেটা হচ্ছে একটা অব্যক্ত অনুভূতি, অথচ সে অব্যক্ত অনুভূতির এমন একটি বিশিষ্টতা আছে, যে বিশিষ্টতাটুকুর একটা অদৃশ্যরূপ, একটা অস্পৃশ্য স্পর্শ এমন আছে যা কখনও ভুল হওয়ার নয়। এখনকার আমি যে কি তা আমি ব'লে বোঝাতে পারি না, কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি বলতে আমার মধ্যে যে সাড়া পেতাম তার চেয়ে যে এটি অনেকাংশে ভিন্ন এ কথা আমি বেশ বুঝতে পারি। এর কারণই হচ্ছে এই যে, আমি বল্‌তে আমি যা বুঝি সেটি হচ্ছে আমার অন্তর্জ্জীবনের সমস্ত অনুভূতির একটি অখণ্ড দীর্ঘ ইতিহাস ; অখণ্ড ব'লেই সেই ইতিহাসটি সকল সময়েই আমার সাম্‌নে জাগরূক, সেটি একটি ইতিহাস ব'লেই তার কোনও ধরা ছোঁয়া যায় এমন রূপ নেই ; এবং ক্রমাতীত অখণ্ড ইতিহাস ব'লেই মনোরাজ্যের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে সমস্ত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এই আমির মধ্যে এমন একটি ঐক্য আছে যে ঐক্যটি তার সমস্ত ইতিহাসকে একটি অখণ্ড পদার্থের ন্যায় ব্যবহার কর্‌তে পারে ; এবং তার মধ্যে যে শক্তিটি ধৃত হ'য়ে রয়েছে তাকে নিমন্ত্রিত কর্‌তে পারে, প্রয়োগ কর্‌তে পারে। কোনও আমিই

তার ইতিহাসের পিণ্ডীকৃত প্রত্যয়সঞ্চয়কে অস্বীকার কর্‌তে পারে না। আমি প্রত্যয়ের মধ্যে সমস্ত প্রত্যয়সঞ্চয় এমন ক'রে পিণ্ডীকৃত হয় যে তার ভিতর থেকে কোনও একটি প্রত্যয়কে হয়ত সব সময়ে পৃথক ক'রে স্মরণ কর্‌তে পারে না, কিন্তু পৃথক কর্‌তে পারে না ব'লেই এই ইতিহাসের সঞ্চয়টি এত ঘন এবং অখণ্ড। অথচ এই আমিত্ববোধের মধ্যে সমস্ত মনোরাজ্যটি ধৃত হ'য়ে রয়েছে ব'লে এই অখণ্ড বোধটির মধ্যে মনের সমস্ত ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে। যখন এই আমি কোনও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তার মানে হচ্ছে যে সমস্ত মনটি তার অখণ্ড অতীত ইতিহাস নিয়ে তার জমাট্ শক্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সমস্ত মনের ইতিহাস আমির মধ্যে আছে ব'লে আমি এক্‌টা বিচিত্রতাময় complex unity বা entity এবং সেই জন্যই এর মধ্যে শারীর অনুভূতির অংশ কি জৈব অনুভূতির অংশগুলিও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এই আমিটি স্থির না হ'য়েও স্থির, স্থির হ'য়েও সর্ব্বদাই বর্দ্ধনশীল পরিবর্ত্তনশীল। তা হ'লে ফল কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে মানুষ বল্‌তে আমরা যা বুঝি সেটি জড়, জীব ও মন এই তিন রাজ্যের সংঘাতে উৎপন্ন এবং এই তিন রাজ্যের সংঘাতে যে উপাদান প্রস্তুত হ'তে থাকে তারই উপাদানসঞ্চারে ক্রমবর্দ্ধনশীল। জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য এ তিনটি যেমন সত্য, এই তিনটির পরস্পর সংঘাতে বা পরস্পরের উপযোগিতায় যা উৎপন্ন হয় তাও তেমনি সত্য, ; সেইজন্য মানুষও মিথ্যা নয়, তার আমিত্বও মিথ্যা নয়, তারা উভয়েই সত্য। এ সংসার আদান প্রদানের সংসার, গ্রহণ বর্জ্জনের সংসার, পরস্পরোপযোগিতার সংসার ; এবং এই দৃষ্টিই হচ্ছে এর তত্ত্বদৃষ্টি। এই চাঞ্চল্যের মধ্যে না দেখে যদি অন্তদৃষ্টিতে একে দেখ্‌তে যাওয়া যায় তবে একে দেখা যাবে না। সব জিনিষই সত্য যদি যে দিক্ থেকে তাকে দেখ্‌তে হবে সেই দিক্ থেকে তাকে দেখা যায়, আবার সব জিনিষই

কিন্তু মিথ্যা যদি যে দিক্ থেকে তাকে দেখ্তে হবে সে দিক্ থেকে তাকে না দেখা যায়।

কিন্তু শুধু জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য নিয়ে আলোচনা কর্লেই গোটা মানুষটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। যেমন জীবরাজ্যকে আশ্রয় ক'রে মনোরাজ্য আত্ম প্রকাশ করে, তেম্নি মনোরাজ্যকে অবলম্বন ক'রে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরাজ্য বা আনন্দরাজ্য প্রকাশ পায়। এই রাজ্যের প্রকাশের উপরই মানুষের চরম উৎকর্ষ নির্ভর করে। মানুষ যে শুধু বাঁচে, কি চিন্তা করে তা নয়, মানুষের মধ্যে একটা সত্যলিপ্সা, মঙ্গলেচ্ছা সৌন্দর্য্যলিপ্সা, একটা ভক্তিলিপ্সা ও কাজ করে। মনোরাজ্যটি অনেকখানি পরিমাণে জৈবভাবের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট এবং প্রয়োজন সম্বন্ধের সহিত যুক্ত, কিন্তু এই বিজ্ঞানানন্দ রাজ্যটি একেবারে প্রয়োজন-সম্পর্করহিত। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি রাজ্যের মধ্যে যেমন নানাবিধ জটিলতা দেখ্তে পাওয়া যায় এতে তা নেই, এ যেন একটি ছায়ালোক; এই ছায়ালোকের দীপ্তিতে মানুষের মনোজীবন যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন যেন সে এক নবীন জীবন লাভ করে। আমরা যত রকমের কাজ করি আর যত রকমের কাজ করি না, এর মধ্যে নিরন্তর একটা তুলনা উঠ্তে থাকে, এই কাজটা ভাল কি ঐ কাজটা ভাল, এটা উচিৎ কি ঐটা উচিৎ; এই যে ঔচিত্য অনৌচিত্যের তুলনা, ভাল মন্দের তুলনা, এটা ঠিক সুবিধা অসুবিধার তুলনা নয়। সুবিধা অসুবিধার তুলনা প্রয়োজনসিদ্ধির তারতম্যের তুলনা, জৈবব্যাপারের স্বতঃপ্রবৃত্তির মধ্য দিয়েই সেটা সুসম্পন্ন হ'তে পারে। কিন্তু ইএ ভাল মন্দের তুলনা সুবিধা অসুবিধার তুলনা নয়, হয়ত যেটা আপাতত নিতান্ত অসুবিধার সেইটাকেই ভাল এবং উচিৎ ব'লে প্রতিভাত হয়। এই যে ঔচিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ, ভালর মূল্য নির্দ্ধারণ, এটা আমাদের সমস্ত জৈবপ্রবৃত্তির উপরে দাঁড়িয়ে জৈবপ্রবৃত্তিকে দমন

কর্‌তে চায় অথচ আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময়েই জৈবপ্রবৃত্তির প্রতিকূলে প্রয়োজনসিদ্ধির প্রতিকূলে আমাদের প্রণোদিত করে। জৈবপ্রবৃত্তির অনুকূলে প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল যেটা সেইটাকেই ভাল ব'লে, মূল্যবান ব'লে, করণীয় ব'লে গ্রহণ করা সর্ব্বপ্রাণিসাধারণের বৃত্তি, এবং এই বৃত্তি অনুসরণ ক'রেই জীবজগতে নূতন নূতন স্তরের প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যারা এই বৃত্তিটিকে যত বেশী ক'রে পালন করতে পেরেছে তারা এবং তাদের সন্তানসন্ততিরাই জীবনযুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আত্মরক্ষা ক'রে বেঁচে রয়েছে। তাই জৈব ও মনোব্যাপারের সমস্ত কাঠামটার মধ্যে এই অর্থ-অর্থির সম্বন্ধ ও এই প্রয়োজনসিদ্ধির দাবীটি আপনাকে ব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে। অতিমূঢ় অবস্থা থেকে অতিনীচ বস্তুর থেকে জীব এই প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুসন্ধান ক'রে নিজকে জীবন যুদ্ধে জয়ী ক'রে রাখতে পেরেছে, তাই এই বোধটা তার শরীরের প্রত্যেক জীবকোষের মধ্যে এবং তার চিন্তাজালের শততন্তুর মধ্যে তাকে ব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে। এর অভিভাবকতা স্বীকার না কর্‌লে জীবজগৎ চলে না। অথচ উন্নত মানুষের জীবনে যে একটা এমন বৃত্তি জন্মে যার দ্বারা সমস্ত জীবজগতের নিয়ম উল্লঙ্ঘন ক'রে একটা নূতন মূল্য নির্দ্ধারণের সূত্র আবিষ্কার ক'রে প্রয়োজনসিদ্ধির চেয়ে প্রয়োজন বিসর্জ্জনের দাবীকে বড় ক'রে তোলে, সমস্ত জীবজগতের ইতিহাসে এটি একটি অভিনব ব্যাপার। এই যে প্রয়োজনসিদ্ধির বাহিরে শ্রেয়ঃসিদ্ধির একটা স্বতন্ত্র দাবী মানুষের মধ্যে কাজ করে, একথা উপনিষদের যুগ থেকেই আমাদের দেশে স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। কঠ উপনিষদ্ বল্‌ছেন, 'অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।' অর্থাৎ শ্রেয় এবং প্রেয়ের বাঁধন দুই দিক্ থেকে মানুষকে বাঁধে। ব্যাসভাষ্য এই কথাই অন্য ভাষায় বলেছেন, 'চিত্তনদী খলু উভয়তোবাহিনী বহতি পাপায় বহতি

কল্যাণায়।' সাঙ্খ্যযোগ মতে সমস্ত প্রকৃতি মানুষকে দুই দিক্ দিয়ে আকর্ষণ করে, একদিকে ভোগের দিকে, প্রয়োজনসিদ্ধির দিকে, অপরদিকে প্রয়োজনবর্জ্জনের দিকে, অপবর্গের দিকে। য়ুরোপে কাণ্ট্ একে বলেছেন rational willএর বাণী, তাঁর মতে এ বাণী নিত্যবাণী, এই নিত্যবাণী মানুষকে যেদিকে টানে তার মধ্যে প্রয়োজনের দাবীর গন্ধমাত্রও নেই। সকলের মধ্যে সমানভাবে এই অজর অমর অক্ষয় বাণী ধ্বনিত হ'য়ে প্রয়োজনসিদ্ধির গণ্ডী থেকে বহু ঊর্দ্ধে মানুষকে টেনে তুল্‌তে চায়। কাণ্টের সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য এই যে, আমি এ বাণীকে নিত্য ব'লে মনে করি না ; প্রয়োজন-সিদ্ধির গণ্ডীর মধ্য থেকে ধীরে ধীরে এই বাণী ঊর্দ্ধে স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে, এবং উন্নতির বিভিন্ন স্তরে ক্রমশঃ স্ফুটতর ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। মনোরাজ্যটি যে ভাবে জীবরাজ্য থেকে মণিবিচ্ছুরণের ন্যায় বিচ্ছুরিত হয়েছে, পুষ্পবৃক্ষের মুকুলসম্ভারের ন্যায় পুষ্পিত হয়েছে, এ রাজ্যটিও ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে মনোরাজ্যের শীর্ষদেশ থেকে পুষ্পিত হ'য়ে উঠেছে। মনোরাজ্যটি সাগরমধ্যস্থ দ্বীপখণ্ডের ন্যায় ধীরে ধীরে যেমন জীবরাজ্যের মধ্য থেকে উত্থিত হয়, এবং এই উত্থানের অনেকদূর পর্য্যন্ত জৈবরাজ্যের অভিষেকে অভিষিক্ত থাকে, এই বিজ্ঞানানন্দরাজ্যটিও ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে মনোরাজ্যের মধ্য থেকে উত্থিত হয় এবং সেইজন্য নিত্য নয় কিন্তু উদ্ভবনশীল, এক নয় কিন্তু বিচিত্র প্রকাশে প্রকাশময়। এই জন্যই দেশভেদে, জাতিভেদে, শিক্ষাভেদে, মানুষভেদে এই বিনাপ্রয়োজনের প্রয়োজনবিসর্জ্জনের আত্মত্যাগের বাণীটি নানা আকারে আপনাকে প্রকাশ করে। এম্‌নি ক'রে নূতন রাজ্যের মধ্যে মনোভূমির প্রান্তভাগে যুগে যুগে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে স্তরে নূতন নূতন মূল্য-সৃষ্টি চলেছে এবং এই অলৌকিক মূল্য-সৃষ্টির প্রভাবে আমাদের সমস্ত কাজের ভালমন্দ নির্দ্ধারিত হচ্ছে এবং

এরই অলৌকিক নিয়ন্ত্রণের ফলে মানুষ ভোগের আকর্ষণ থেকে ত্যাগের বহ্নিতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জগতের কল্যাণে ব্রতী হ'তে পারছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসাও এই লোকেরই বাণী। কঠ উপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যানে পাই যে, নচিকেতা সমস্ত প্রলোভন প্রত্যাখ্যান ক'রে বলেছিলেন যে তিনি কিছুই চান না কেবল জান্‌তে চান মৃত্যুর পর কি হয়। উপনিষদের ঋষিরা এই তত্ত্বলোকের একটু স্পর্শ পেয়ে ব্রহ্মানন্দে অধীর হ'য়ে উঠ্‌তেন—এ যে আনন্দময় লোক, মনোরাজ্যের সমস্ত বন্ধন এখানে ছিন্ন হ'য়ে গেছে—'যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো না বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং তদ্বা অস্য এতদাপ্তকামম্ আত্মকামং রূপং শোকান্তরম্। অত্র পিতা অপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদা অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহা অভ্রূণহা চাণ্ডালো অচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসঃ অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন তীর্ণোহি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি।' মানুষ যখন তার কামনার রাজ্য থেকে প্রয়োজনের রাজ্য থেকে ঊর্দ্ধে আপনাকে তুল্‌তে পারে, তখনই এই ব্রহ্মলোকের স্পর্শ লাভ কর্‌তে পারে—'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

এই লোকের উপলব্ধির জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে বুদ্ধ বলেছিলেন, "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং বিলয়ং চ যাতু। অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥ সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের জিজ্ঞাসার মূলে এই আনন্দলোকের এই বিজ্ঞানলোকের একটি স্পর্শ রয়েছে। ঋষি যিনি, যোগী যিনি, ব্রহ্মবিৎ যিনি, তিনি এই লোকের স্পর্শে ডুবে যেতে চান। "স

যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃকৃৎস্নো রসঘনঃ এবৈবং বা অরেয়মাত্মা অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনয় এব”। বিভিন্নদেশের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন সাধকের নিকট এর স্পর্শের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে, কিন্তু সকল দেশের সকল সাধকই এর একটা রসাস্বাদ পেয়েছেন। দাদু দয়াল্ এই উপলব্ধিকেই লক্ষ্য ক'রে বলেছেন :—

জ্ঞান লহর্ জহা থৈ উঠৈ বাণীকা পরকাস্
অনভৈ জহাঁ থৈ উপজৈ সবদৈ কিয়া নিবাস
সো ঘর সদা বিচার কা তহাঁ নিরংজন বাস
তহাঁ তু দাদু খোজিস লে ব্রহ্ম জীবকেপাস ॥
জহাঁ তন্ মনকা মূলহৈ উপজৈ ওঁকার
অনহদ সেঝা সবদ্ কা আতম্ করৈ বিচার
ভাবপ্রগতি লৈ উপজৈ সো ঠাহর নিজ সার্
তহঁ দাদু নিধি পাইয়ে নিরংতর নির্ধার ॥

জালালুদ্দিন রুমি এই তত্ত্বকেই লাভ ক'রে বলেছিলেন,—

I have put duality away, I have seen that the
two worlds are one ;

One I seek, one I know, one I see, one I call.
I am intoxicated with love's cup, the two
worlds have passed out of my ken ;

আবার

In my heart thou dwellest else with blood I'll drench it ;
In mine eye thou glowest else with tears I'll quench it.
Only to be one with thee my soul desireth—
Else from out of my body, hook or crook, I'llwrenchit .

আবার

O my soul, I searched from end to end; I saw in thee naught save the Beloved; call me not infidel, O my soul, if I say that thou thyself art He.

রামানন্দ রায় যখন শ্রীচৈতন্যের মনোভাব স্পর্শ করে পরতত্ত্ব-বর্ণন প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

ন সো রমণ ন হমে রমণী
দুঁহু মনোভব কোশল জানি।

তখনও তিনি এই তত্ত্বেরই আস্বাদ বর্ণন করতে চেষ্টা করেছিলেন। এম্‌নি ক'রে নানাদেশের নানাকালের সাধকেরা এই তত্ত্বের নানা আস্বাদ তাঁদের বাণীতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই সমস্ত আস্বাদের মধ্যে প্রকৃতিগত নানা বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু এই নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি কথা ফুটে উঠ্‌ছে যে এ যে-লোকের স্পর্শ তাকে মনোরাজ্যের চিন্তার জালে ধরা যায় না, একে কথায় বোঝা যায় না, একে খালি অলৌকিক স্পর্শে পাওয়া যায়।

এই অলৌকিক রাজ্যের স্পর্শ যে শুধু কর্ম্মসাধক বা ধর্ম্মসাধকের জীবনেই ধরা পড়ে তা নয়, যিনি সৌন্দর্য্যের সাধক তাঁরও অনুপ্রাণন এই লোক থেকেই আসে; এই লোকেরই একটু স্পর্শ তিনি বর্ণের ছন্দে কিম্বা কথার ছন্দে ধরতে চেষ্টা করেন; এই অলৌকিক রাজ্যের স্পর্শেই যে আমাদের জীবন সৌন্দর্য্যময় রাগময় হ'য়ে ওঠে সে কথা shelley তাঁর একটি কবিতায় বোঝাতে চেষ্টা ক'রে বলেছেন :—

The awful shadow of some unseen power
Floats though unseen among us—visiting
This various world with as inconstant wing
As summer winds that weep from flower to flower,
Like moon beams that behind some
piny mountain shower,

It visits with inconstant glance
Each human heart and countenance ;
Like hues and harmonies of evening,
Like clouds in starlight widely spread,
Like memory of music fled,
Like aught that for its grace may be
Dear, and yet dearer for its mystery,

I vowed that I would dedicate my powers
To thee and thine—have I not kept the vow
With beating heart and streaming eyes, even now
I call the phantoms of a thousand hours
Each from his voiceless grave, they have in
visioned bowers

Of studions zeal or love's delight
Outwatched with me the envious night
They know that never joy illumined my brow
Unlinked with hope that thou wouldst free
This world from its dark slavery,

That thou—O awful loveliness

Wouldst give whate'er these words cannot express.

রবীন্দ্রনাথ এই স্পর্শকেই তাঁর কাব্যের উৎস ব'লে বর্ণনা ক'রে লিখেছেন :—

একি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীত স্রোতে কূল নাই পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনিতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত।

তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাষায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।

সে মায়ামূরতি কি কহিছে বাণী
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।

এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর বিদারণ।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।

যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝিনা জাগে সেই ব্যথা,
জানিনা এসেছে কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার,—
দেখে তুমি হাস বুঝি ?
কেগো তুমি কোথা রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি।

এম্‌নি ক'রে এই অলৌকিক একটি রাজ্য আমাদের মনোরাজ্যের ঊর্দ্ধে থেকে কখনও বা মনোরাজ্যের মধ্যে তার আলোক রশ্মি ফেলে তাকে উদ্ভাসিত ক'রে তুল্‌ছে, কখনও বা তার অলৌকিক শক্তির দাবীতে মনোরাজ্যের এবং জৈবরাজ্যের সমস্ত দাবীকে ক্ষুদ্রতায় হীন ক'রে দিয়ে আপনার অসীম গৌরব ও বৈভবকে প্রকাশ করে। মনোরাজ্যের মধ্যে এ রাজ্যের সত্ত্বার আভাস মাত্র পাই, কিন্তু এ রাজ্যের সম্পদ্‌কে মনোরাজ্যের নিয়মের দ্বারা ধরবার কোনও উপায় নেই। যে সমস্ত সাধকেরা এ রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে চেয়েছেন তাঁরা বলেছেন যে মনোরাজ্যের বিধ্বংস না হ'লে এ রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। কিন্তু যদি মনোরাজ্যের ধ্বংস ঘটে তবে এ রাজ্যে প্রবেশ হ'লে তার অনুভূতি যে কি হবে সে কথা মনোরাজ্যের ভাষায় বলা যায় না। এইখানেই mysticদের রহস্য। যে দার্শনিক তাঁর দর্শনবিচারে এই রাজ্যের অনুভূতিকে তাঁর তথ্যবিচারের মধ্যে গ্রহণ করেন নি সে দর্শনশাস্ত্র অতি দীন। কারণ এই রাজ্যের স্পর্শেই মানুষের মনুষ্যত্ব। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের বিচারের মধ্যে সমস্ত অনুভূতি সমস্ত তথ্য স্থান পাওয়া উচিত, সেইজন্য যে দর্শনশাস্ত্র শুধু এই পরতত্ত্বকেই স্বীকার ক'রে পরিদৃশ্যমান আর সমস্তকেই মিথ্যা মায়া ব'লে এক পাশে সরিয়ে রাখ্‌তে চান, দর্শনশাস্ত্র হিসাবে সে দর্শন অতি সঙ্কীর্ণ।

বিভিন্ন রকমের বিশেষত্ব নিয়ে আমাদের চোখের সাম্‌নে এই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও আনন্দময় চারটি রাজ্য পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে প্রকাশ ক'রে তুল্‌ছে, এই চারটি রাজ্যই সমান ভাবে সত্য এবং চারটি রাজ্যের পরস্পরের আদান প্রদানে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তাও ঠিক সেই ভাবেই সমান সত্য। এ পর্য্যন্ত দর্শনশাস্ত্রে যত প্রচেষ্টা হয়েছে তার কোনোটাতে চারটি রাজ্যের কোনওটির তথ্য অপর কোনোটির নিয়মের দ্বারা বা ব্যাখ্যার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। যদি কোনো একটি এমন তত্ত্ব পাওয়া যেত যার দ্বারা এই চারটিরই ব্যাপার ব্যাখ্যা করা চল্‌ত তাদের বৈচিত্র্যের উপপত্তি করা সম্ভব হোত তবে সেরকম অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা যেতে পার্‌ত। এই চারটি জগতের যে পরস্পরাপেক্ষি বৈচিত্র্য এই নিয়েই হচ্ছে জগতের ও মানুষের জীবন; এ বৈচিত্র্যকে না মান্‌লে জীবনকেই মানা হয় না। ঐক্য আমরা খুঁজি বটে, কিন্তু বিচিত্রকে না মান্‌লে ঐক্যকেই মানা হয় না।—সমস্তকে হারিয়ে সমস্তকে মিথ্যা ব'লে সরিয়ে দিয়ে যে ঐক্য পাওয়া যায় সে ঐক্য রিক্ততার ঐক্য, মুক্তির ঐক্য নয়।

"রাত্রিঘেরা স্বপ্নমাঝে গর্ব্বে ছিনু ভরি,
আপনাকে শূন্য দেখে মুক্ত মনে করি।
এখন মনে হয়
আপনারে রিক্ত করা মুক্ত করা নয়"॥

চারটি বিচিত্র জগতের ঐক্যের ও সামঞ্জস্যের ছন্দটি যে মানুষের মধ্যে ধরা পড়েছে এবং এই চারটি জগৎ যে মানুষের মধ্যে আত্ম প্রকাশ ক'রে তুল্‌ছে এবং তাদের চরম সার্থকতারূপে মানুষকে সৃষ্টি ক'রে তুলেছে, তাদের যে বিচিত্র স্বরসঙ্ঘাত মিলিত হ'য়ে অখণ্ড একটি মানুষের স্বরে নিরন্তর ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ছে এই দৃষ্টিই দর্শনের দৃষ্টি, এই দৃষ্টিই মুক্তির দৃষ্টি।
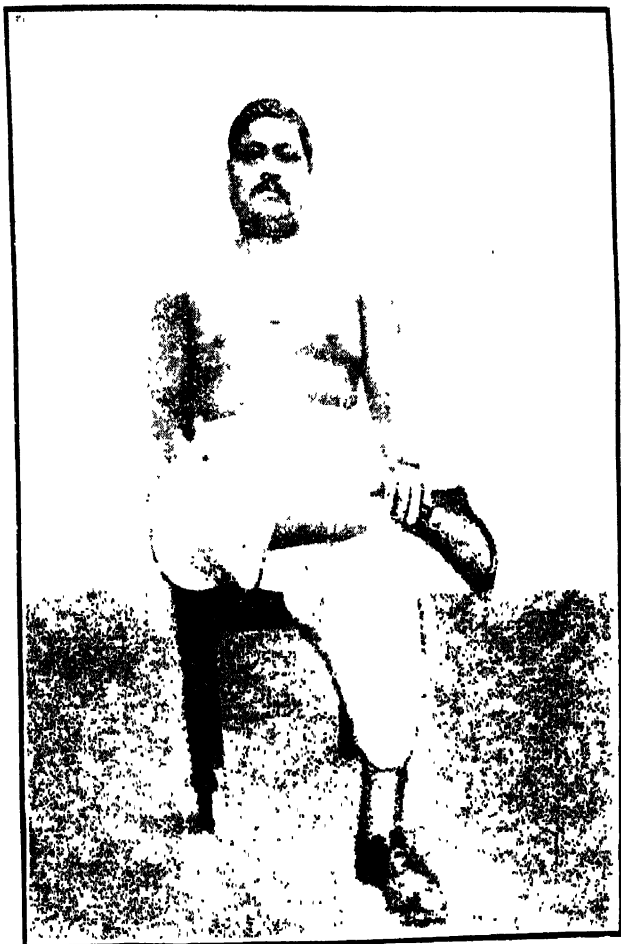
বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-ডি, এম্-এস্-সি, এফ্-জেড-এস্

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি—

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌-ডি, এম্‌-এস্‌-সি, এফ-জেড-এস্‌।

মহাশয়ের অভিভাষণ।

বাংলার প্রাণিসঙ্ঘ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

ভদ্রমহোদয়গণ !

আজ আপনারা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিকে যে স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। আজ আমি আমার পরমবন্ধু হেমেন্দ্রবাবুর স্থলে এই বিজ্ঞানশাখার সভাপতিরূপে আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই স্থল অধিকার করিবার আমার ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে করি না ; কেবল এই সম্মিলনের কর্ম্মীগণের প্ররোচনায় আমি সন্তরণে অপটু হইয়াও জলে ঝাঁপ দিয়াছি। তাহার উপর হেমেন্দ্রবাবু যে অসুস্থতার দরুণ এই গুরুভার লইতে অক্ষম হইলেন, তজ্জন্য আমি ক্ষোভে আরও হীনবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং এই গুরুভার বহনে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা জানি না। অধিকন্তু আমার মত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দুই দিনে গঠিত ক্ষুদ্র অভিভাষণ আপনাদের কতদূর প্রীতিকর হইবে, তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

আমি বহুদিন হইতে প্রাণী লইয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছি। আজ আমি বাংলার প্রাণিসঙ্ঘ বা প্রাণিসমষ্টি (Fauna) সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিব।

কোন দেশে বা প্রদেশে যে সমুদয় প্রাণী দৃষ্ট হয়, তাহাদের সমষ্টির নাম প্রাণিসঙ্ঘ। বঙ্গদেশে বহুবিধ প্রাণী দৃষ্ট হয় এবং তৎসম্বন্ধে অনেক জানা আছে এবং জানিবারও আছে। আমরা ঐই বিষয় লইয়া কিছু আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক আমাদের নিজেদের সাহিত্যে ইহাদের বিষয় কি জানিতে পারি। অতি প্রাচীনকাল হইতে আমরা বহু প্রাণির নাম লিপিবদ্ধ দেখিয়া আসিতেছি। চারি বেদ, ব্রাহ্মণাদি, উপনিষদ্‌, রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ, কাব্য, অভিধান ও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে বহু প্রাণির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাকৃত এবং বঙ্গভাষায় ঐ সকল প্রাণির নামের অপভ্রংশ এবং অন্যান্য নূতন নামও আমরা দেখিতে পাই। আমরা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বহু পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উভচর, মৎস্য, পর্ব্বপদীর অন্তর্ভুক্ত অনেক প্রাণী, কীট ও ক্রিমির নাম জানিতে পারি। কিন্তু কোনও গ্রন্থে তাহাদের পরিচয়ের জন্য কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ, চক্ষে দেখিয়া বংশানুক্রমে বহু প্রাণির পরিচয় হইয়া আসিতেছে, ইহার ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, বহু প্রাণির নাম মাত্র পাওয়া যায় কিন্তু তাহাদের পরিচয়ের কোন উপায় নাই ; এইরূপে আমাদের প্রাণিসম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের অনেক হ্রাস হইয়াছে। যে প্রাণিগুলি নানাকারণে মানবের সহিত সংবদ্ধ (যেমন যে সকল পশু, পক্ষী ও মৎস্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যাহারা নানা উদ্দেশ্যে গৃহে পালিত হয়, যে সকল প্রাণী সচরাচর বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হয় অথবা যাহারা নানাপ্রকারে ক্ষতিসাধন করে), সেগুলি আমাদের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। আমরা অভিধান হইতে প্রাণি-পরিচয়ের সাহায্য পাই। অভিধানকারগণ একটা প্রাণির বহু নাম সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ; ঐ সকল নামের অর্থ

পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা প্রাণিটির আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিশেষত্ব সম্বন্ধে অনেক জানিতে পারি। ঐ সকল লক্ষণ একত্রে প্রাণিটির পরিচয়ে অনেক সহায়তা করে। এইসকল লিপিবদ্ধ নাম ভিন্ন আমরা প্রাণির অনেক দেশীয় নাম লোকমুখে শুনিতে পাই; পুনশ্চ, এক প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এইরূপে এক মৎস্যের বহু নাম পাওয়া যায়। এই সকল দেশীয় নাম বহুস্থলে সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত কথার অপভ্রংশ হইলেও তাহাদের অনেকগুলি নূতন গঠিত বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু বহু প্রাণী অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি; আরও বহু প্রাণী আছে যাহাদিগকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সকল প্রাণির বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি; আমাদের আদি সাহিত্যে তাহাদের উল্লেখ থাকাও সম্ভবপর নহে। আমরা আধুনিককালে অভিধান এবং আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দেশীয় প্রাণিগণের উল্লেখ এবং যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া থাকি। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বেদাদি গ্রন্থে বহু প্রাণির নাম এবং কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়; পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ তাহা লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছেন। আমিও ঐ বিষয় লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছি; ইহা প্রবন্ধাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হইল, তাহা হইতে বাংলার, কেবল বাংলা কেন, সমুদয় ভারতের প্রাণিসঙ্ঘের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতে আগমনপূর্ব্বক এদেশের প্রাণিগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক নাম সঙ্কলন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা যে কেবল এই কার্য্যে রত হইয়া ক্ষান্ত রহিলেন তাহা নহে। তাঁহারা ভারতের নানাস্থান হইতে নানা প্রাণী

সংগ্রহ করতঃ তাহাদের মৃতদেহ সুরা প্রভৃতি দ্রব পদার্থে রক্ষিত করিয়া ইউরোপে পাঠাইতে লাগিলেন। ইউরোপের নানা সাময়িক পত্রে ঐ সকল প্রেরিত প্রাণিগণের বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিনিয়াস্ নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত তাঁহার প্রকাশিত প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থে ভারতীয় অনেক পশু, পক্ষী ও মৎস্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যে সমুদয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আমাদের দেশে আগমনপূর্ব্বক বাংলার প্রাণিগণের পরিচয়ের উন্নতিকল্পে মনযোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে হামিল্‌টন-বুকানন সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বঙ্গদেশের বহু পশু, পক্ষী এবং মৎস্যের রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করাইয়া তাহাদের সঙ্গে দেশীয় এবং বৈজ্ঞানিক নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল চিত্রের কতকগুলি নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বহু মৎস্য এবং পক্ষীর রঞ্জিত চিত্র Asiatic Society of Bengalএর গ্রন্থাগারে বক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি যাদুঘরের গ্রন্থাগারের জন্য মৎস্যগুলির চিত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করান হইয়াছে। হামিল্‌টন সাহেব Fishes of the Ganges নামে একখানি গাঙ্গেয় মৎস্যের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন; গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য হইলেও অনেক গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার এক বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি দেশীয় নামগুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন এবং যথাসম্ভব ঐ নামগুলি তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গঠিত বৈজ্ঞানিক নামগুলিতে অনেক মৎস্যের দেশীয় নাম রক্ষিত হইয়াছে। আমরা সকলে জানি যে, কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লাটিন ভাষায় লিখিত হয়। একটি নাম দুই শব্দে গঠিত—প্রথম শব্দটি গণের (genus) নাম এবং দ্বিতীয়টি জাতীয় নাম (name of the species)। দুইটিতে মিলিয়া নামকরণ হইল। যেমন রুইমাছের বৈজ্ঞানিক

নাম Cyprinus ruhu ; এস্থলে Cyprinus কথাটি গণের নাম (রুই প্রভৃতি মাছ যে গণের অন্তর্ভুক্ত)।[১] দ্বিতীয় শব্দটি জাতীয় নাম এবং এস্থলে দেশীয় নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। হামিল্টন সাহেবের নামকরণের এই রীতির জন্য আমাদের অনেক দেশীয় নাম রক্ষিত হইয়া গিয়াছে, নচেৎ অনেক নাম লোপ পাইত। আজকাল পক্ষীদিগের বহু অন্তর্জাতি (subspecies) নির্ণীত হওয়ায় তিনটি শব্দযুক্ত বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহৃত হইতেছে—প্রথম শব্দটি গণের দ্বিতীয়টি জাতীয় এবং তৃতীয়টি অন্তর্জাতীয়। ক্রমশঃ অন্যান্য প্রাণিগণের নামও এইরূপে গঠিত হইতে থাকিবে। যাহা হউক, হামিল্টন-বুকাননের গঠিত নামগুলির অনেক পরিবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ জাতীয় নামগুলি চলিত আছে, এবং তাঁহার নাম এ সম্পর্কে চিরদিন বিরাজমান থাকিবে। তাঁহার পদানুসরণ করিয়া রাসেল, ফ্রেয়ার, ডে, জর্ডান প্রভৃতি বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতীয় প্রাণিগণের বিবরণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারাও অনেকস্থলে জাতীয় নামের জন্য দেশীয় নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন ও ঐসঙ্গে দেশীয় নামগুলিও লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু ভারতীয় (তৎসঙ্গে বঙ্গদেশীয়) পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, পতঙ্গ, লৌতেয় প্রভৃতির বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই কার্য্যে বহু অগ্রসর হইলে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় Fauna of the British India নামক পুস্তক ধারাবাহিকরূপে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই পুস্তকে ভারতবর্ষ, লঙ্কাদ্বীপ এবং ব্রহ্মদেশের প্রাণিগণের বিবরণ এবং যথাসম্ভব প্রকৃতি লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। আজিও পুস্তকখানি প্রকাশিত হইতেছে এবং এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহাতে খণ্ডে খণ্ডে ভারতীয় পশু, পক্ষী (ইহার দ্বিতীয় বর্দ্ধিত এবং পরিশোধিত সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে), সরীসৃপ

ও উভচর, মৎস্য, কোমলাঙ্গী, কয়েক বর্গান্তর্গত পতঙ্গ, লৌতেয়, স্পঞ্জ, পুরুভুজ এবং সঙ্ঘপ্রাণি, জলৌকা প্রভৃতির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও বহুপ্রাণির বিবরণ প্রকাশিত হইতে বাকি আছে। আমরা এস্থলে আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পুস্তকখানি বঙ্গদেশে মৎস্যের চাষ সম্পর্কে প্রকাশিত হয়। মিঃ কে, সি, দে, আই-সি-এস্ মহাশয় বঙ্গদেশীয় মৎস্যের চাষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি লিখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া পুস্তকখানি সম্পাদন করেন। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বৈজ্ঞানিক নামের সহিত অনেক স্থানীয় নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। যদিও মৎস্যের চাষ বঙ্গদেশে স্থায়ী হইল না, তথাপি দেশীয় মৎস্যের নাম রক্ষার দিক্ হইতে দেখিলে পুস্তকখানি দেশের হিতসাধন করিয়াছে। আমরা এজন্য গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আজকাল Zoological Survey of Indiaর সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের প্রকাশিত Records of the Indian Museum নামক সাময়িক পত্রে ক্রমশঃ বহুপ্রাণির বিবরণ প্রকাশিত করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় Nelson Annandale সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পূর্ব্বেও যাদুঘরের অধ্যক্ষ এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীরূপে বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতে আগমন করিয়া বহু ভারতীয় প্রাণিসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে Neville, Anderson, Finn, Alcock প্রভৃতি সাহেবগণ বিশেষভাবে পরিচিত। Alcock সাহেব অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত ভারতীয় দশপদী খোলকীর বিবরণ তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। আজকাল বিদেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যতীত কয়েকজন বঙ্গবাসী বঙ্গের প্রাণীতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। তন্মধ্যে এই নগণ্য

অভিভাষণকারী ভিন্ন ডাঃ বি, কে, দাস, শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহাদের অধীন গবেষণাকারী ছাত্র মিঃ ভাদুড়ীর নাম উল্লেখ-যোগ্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রায় সকল দেশেই প্রাণিসঙ্ঘের বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতে উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।

তৃতীয়তঃ, প্রাণিসমষ্টি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ভারতীয় প্রাণীসঙ্ঘ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, অবশ্য তাহাতে বঙ্গীয় প্রাণিসঙ্ঘ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আমরা প্রাণিগণের শ্রেণীবিভাগ ধরিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করিতে থাকিব।

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর প্রাণিগুলি আত্মপ্রাণী (Protozoa) নামে অভিহিত। সাধারণতঃ ইহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—Sarcoda বা উপপাদিক, Mastigophora বা প্রতোদী, Ciliophora বা লোমাঙ্গী এবং Sporozoa বা রেণুজ প্রাণী। ইহারা জলে, জলসিক্ত স্থলে এবং অন্য প্রাণির দেহ মধ্যেও বাস করে। আত্মপ্রাণিগণ বহুসংখ্যায় দৃষ্ট হয়। বঙ্গীয় আত্মপ্রাণিগণের বিবরণ যৎসামান্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমি দ্বিতীয় শ্রেণী ভিন্ন বাকি তিনটির অন্তর্গত অনেকগুলি প্রাণির বিবরণ নানা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। বহু বৎসর পূর্ব্বে Asiatic Society of Bengal এর সাময়িক পত্রে কতকগুলি প্রতোদির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। রায় বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরান্তঃবাসী প্রতোদী লইয়া আলোচনা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় আত্মপ্রাণিগণের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় আত্মপ্রাণিগণের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক এবং তাহার প্রণয়নে বহু কর্ম্মীরও প্রয়োজন।

অতঃপর আমরা ছিদ্রালদেহী (porifera) এবং সুষিরান্ত্রী নামক; দুইটি বিভাগের (phyla) প্রাণিগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। স্বর্গীয় Annandale সাহেব Fauna of the British Indiaতে এ সম্বন্ধে একখণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ছিদ্রালদেহিকে চলিত কথায় স্পঞ্জ বলা হয়, তবে কথাটি বিদেশীয়। আমরা পুকুরে Spongilla জাতীয় কয়েক প্রকার স্পঞ্জ দেখিতে পাই। এই বিভাগের প্রায় সমুদয় প্রাণী সমুদ্রবাসী হইলেও একটিমাত্র বংশ (Spongillidae) স্বাদু জলে জন্মিয়া থাকে; আমাদের পুকুরের স্পঞ্জ এই বংশের অন্তর্গত। পুকুরের স্পঞ্জগুলি কখন কখন সবুজবর্ণ এবং কখনও মলিন শ্বেতবর্ণ। ইহা কোন জলমগ্ন পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং প্রায়ই বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করে। ইহা দেখিতে গোলাকার অথবা দীর্ঘাকার।

সুষিরান্ত্রী বিভাগের অন্তর্গত Hydra নামক এক প্রাণী আমাদের দেশে পুকুরে দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বস্থলে দেখা যায়। ইহা দেখিতে একটি $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি লম্বা সরু কাঠির মত; একদিকে কোন পদার্থে সংলগ্ন থাকে, অপর দিকে সরু চুলের মত কয়েকটি শুণ্ড সংলগ্ন থাকে। ইহার বর্ণ শ্বেত। Hydra জাতীয় আর একপ্রকার প্রাণী লবণাক্ত জলে দৃষ্ট হয়; বাদার খালে সময়ে সময়ে ইহা বহুসংখ্যায় দৃষ্ট হয়। ইহার নাম Irene ceylonensis। এই প্রাণির জীবনে দুইটি অবস্থা লক্ষিত হয়। প্রথম অবস্থায় ইহা দেখিতে অনেকটা Hydraর মত, ইহাদের অনেকগুলি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া একত্র বাস করে। ইহার গাত্র হইতে মুকুলের মত প্রবর্দ্ধন উত্থিত হয় এবং তাহা হইতে একটি প্রাণী জন্মায়। প্রাণিটি পূর্ণাবস্থা

প্রাপ্ত হইলে উহার গাত্র হইতে স্খলিত হয় এবং জলে স্বাধীনভাবে জীবিত থাকে। এই প্রাণী দেখিতে উন্মুক্ত ছত্রের ন্যায় এবং ইহাকে Medusa বা ছত্রকপ্রাণী বলা হয়। ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা। ছত্রক-প্রাণির স্ত্রী ও পুরুষভেদ লক্ষিত হয়। তাহাদের দেহাভ্যন্তরে ডিম্বাণু এবং শুক্রকীটাণু জন্মিয়া পরে জলে ক্ষরিত হয়; তাহারা জলে একত্র হইয়া ক্রমশঃ একটি Hydraর মত প্রাণিতে পরিণত হয়। সুষিরান্ত্রী বিভাগের অন্তর্গত আরও অনেক প্রাণী দৃষ্ট হয়, যাহারা সমুদ্রের জলে বাস করে। ইহারা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে দৃষ্ট হয়। প্রবাল ইহাদের মধ্যে সুপরিচিত; ইহাদের কঙ্কাল দেখিতে অতি সুন্দর এবং নানাপ্রকার আকৃতি ধারণ করে। এই সকল সুষিরান্ত্রী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ যাদুঘর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা পুরী গিয়াছেন, তাঁহারা সমুদ্রের ধারে এইরূপ বহু প্রাণী দেখিয়া থাকিবেন।

আমরা এক্ষণে চিপিট কৃমি (Platyhelminthes) সম্বন্ধে দেখিব। আমাদের-ফিতা কৃমি, পাতার ন্যায় কৃমি, প্রভৃতি চেপ্টা কৃমিগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহাদের অধিকাংশ অন্যান্য প্রাণির দেহাভ্যন্তরে বাস করে: কিন্তু একজাতীয় চিপিট কৃমি (Turbellaria) জলে বাস করে। পুকুরের জলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মানবের দেহে যে সকল ফিতা-কৃমি ও পত্র-কৃমি (flukes) দৃষ্ট হয় তাহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যে সকল ফিতা ও পত্র-কৃমি মানুষের দেহে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আমাদের জানা আছে। কিন্তু অধিকাংশ মেরুদণ্ডীর অন্ত্র এবং দেহ-গহ্বরে ফিতা-কৃমি ও পত্র-কৃমি পাওয়া যায়। বাংলায় যে সকল মৎস্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাদের দেহে নানাপ্রকার ফিতা-কৃমি দেখা গিয়াছে। আমাদের সাধারণ ভেক, গৃহগোধিকা,

নানাজাতীয় সর্প, কচ্ছপ; অনেক প্রকার পক্ষী এবং গৃহপালিত পশুর অন্ত্রাভ্যন্তরে নানাজাতীয় ফিতা-কৃমি পাওয়া গিয়াছে। এই গুলি শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। পত্র-কৃমিও ঐরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ভেড়ার পিত্তনালীতে একপ্রকার পত্র-কৃমি দেখা যায়।

আর এক বিভাগের কৃমি দৃষ্ট হয়, যাহাদিগকে বর্ত্তুল কৃমি বলে (Nemathelminthes)। আমাদের ছেলেদের মলদ্বারের ছোট কৃমি, বয়স্ক ব্যক্তিগণের অন্ত্রস্থ বড় কৃমি, প্রভৃতি এই বিভাগের অন্তর্গত; Ankylostoma duodenalis এবং Filaria medicinensis নামক দুই প্রকার কৃমিও বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। ইহাদের প্রথমোক্ত কৃমিটি এক প্রকার রক্তাল্পতা রোগ উৎপাদন করে। দ্বিতীয় কৃমি দ্বারা এক প্রকার নালী ঘা উৎপন্ন হয়; অথর্ব্ব বেদ এবং কৌশিক সূত্রে ইহার উল্লেখ আছে। মানুষের অন্ত্র এবং রক্তে বহুপ্রকার বর্ত্তুল কৃমি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি আমাদের সব জানা আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রাণির অন্ত্রে এইরূপ কৃমি দৃষ্ট হয়। সাধারণ আরসুলা, টিকটিকি, ভেক, গিনিপিগ্‌ প্রভৃতির অন্ত্রে বহু প্রকার বর্ত্তুল ক্রিমি পাওয়া যায়। পুনশ্চ বহু প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুল কৃমি ভিজা মাটিতে বাস করে। এই-গুলি দেখিতে শিশুদিগের মলদ্বারের ছোট কৃমির ন্যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পানরে পোকার যে হুজুক উঠিয়াছিল, তাহাতে এই কৃমিগুলিকে পানের পোকা বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহারা মাটিতে বাস করে এবং পানের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

কণ্টকশুণ্ডী (Acanthocephala) নামক এক প্রকার কৃমি জাতীয় বিভাগের প্রাণিগুলির সম্বন্ধে এদেশে কিছুই শিক্ষা দেওয়া

হয় নাই। আমি সাধারণ কোলাবেঙের দেহাভ্যন্তরে এই জাতীয় কৃমি দেখিয়াছি।

কোমলাঙ্গী বা পিণ্ডালদেহী (Mollusca) নামক বিভাগের অন্তর্গত শামুক, গুগ্‌লি, ঝিনুক প্রভৃতি প্রাণী বঙ্গদেশে বহু-সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। Fauna of the British India এবং Records of the Indian Museumএ এই বিভাগের বহু প্রাণির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসামের আবর প্রদেশ হইতে বহুবিধ প্রাণী সংগৃহীত হইয়াছিল তন্মধ্যে কতক-গুলি খোলাবিহীন শামুকজাতীয় প্রাণী পাওয়া যায়; ঐ প্রাণিগুলির বিবরণ লিখিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করা হয়। Records of the Indian Museumএ ঐগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।

চক্রবাহী (Rotifera) নামক বিভাগের অন্তর্গত বহুপ্রাণী বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। এইগুলি আণুবীক্ষণিক। ইহারা সচরাচর জলের ভিতর গাছে সংলগ্ন থাকে এবং কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহারা দেখিতে এত সুন্দর যে বহু সাধারণ ব্যক্তি সখ করিয়া ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন। Hudson এবং Gosse সাহেবের Rotifera নামক পুস্তক জগদ্বিখ্যাত। Asiatic Society of Bengal হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রে বহু দিন পূর্ব্বে কয়েকটি চক্রবাহীপ্রাণির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ইহাদের আলোচনা, গবেষণার এক নূতন পথরূপে এখনও উন্মুক্ত রহিয়াছে।

এক্ষণে আমরা পর্ব্বিত কীট সম্বন্ধে (Annelida) দেখিব। কেঁচুয়া এবং জোঁক এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহাদের বহু

আলোচনা হইয়া গিয়াছে। Michaelson নামক একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতবর্ষ এবং লঙ্কাদ্বীপের কেঁচুয়া জাতীয় পর্ব্বিত কীটগুলির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তীকালে Stevenson নামক আর একজন সাহেব ঐ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন; ইনি Fauna of the British Indiaতে কেঁচুয়া জাতীয় পর্ব্বিত কীটগুলির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। অল্প দিন হইল, ভারতীয় জলৌকাগুলির বিবরণ Fauna of the British Indiaতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুশ্রুত সংহিতায় কয়েক প্রকার সবিষ ও নির্বিষ জলৌকার উল্লেখ এবং অতি সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। আমি সেই পুস্তকের সাহায্যে ঐ জলৌকাকয়টির পরিচয় এবং বৈজ্ঞানিক নাম নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। Asiatic Society of Bengalএর মাসিক অধিবেশনে ঐ প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছে, এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আর এক জাতীয় পর্ব্বিত কীট (Polychaeta) লবণাক্ত জলে দৃষ্ট হয়। সুন্দরবন বাদার জলে এইরূপ কয়েক জাতীয় কীট পাওয়া যায়; সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই।

আমরা এক্ষণে পর্ব্বপদী (Arthropoda) নামক এক বৃহৎ বিভাগে উপনীত হইলাম। অসংখ্য প্রাণী এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। খোলকী (crustacea) (যেমন চিংড়ী, বিছাচিংড়ী, কাঁকড়া) পতঙ্গ বা ষট্-পদী (Insecta) (যেমন আরসুলা, প্রজাপতি, মাছি, ফড়িঙ্), লৌতেয় (Arachnida) (যেমন মাঁকড়সা, কাঁকড়াবিছা, এঁটুলি), শতপাদিক (Chilognatha) (তেঁতুলিয়া-বিছা), দ্বিযুগ্মপদী (Diplopoda) (কেন্নুই) এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহাদের সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচনা হইয়াছে, তথাপি

বহু গবেষণার আবশ্যক। Fauna of the British Indiaতে কয়েক বর্গীয় পতঙ্গ এবং লৌতেয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। Alcock সাহেবের পুস্তকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ দশপদী খোলকীর বিবরণ পাওয়া যায়। যাদুঘর হইতে প্রকাশিত পত্রিকা-খানিতে Kemp সাহেব অনেকগুলি খোলকীর বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এখনও অনেক করিবার আছে। আমাদের পুকুরে বহুবিধ ক্ষুদ্রাকার খোলকা দৃষ্ট হয়; সেগুলির বিবরণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের কাদা চিংড়ি (Mysidacea) এক বর্গের খোলকীর অন্তর্গত। পর্ব্বপদী বিভাগের অন্তর্গত আদ্য-পর্ব্বপদী নামে একটা শ্রেণী আছে, যাহার অন্তর্গত প্রাণিগুলি দেখিতে কীটের ন্যায়। এই শ্রেণীর প্রাণিগুলিকে পর্ব্বদেহী এবং পর্ব্বপদীর মধ্যবর্ত্তী মনে করা হয়। আরব হইতে এই জাতীয় অনেকগুলি প্রাণী সংগৃহীত হইয়াছিল। Kemp সাহেব ইহাদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

শৈলজ বা সঙ্ঘ-প্রাণী (Polyzoa) নামে এক বিভাগে অনেকগুলি প্রাণী দৃষ্ট হয়। অনেকগুলি প্রাণী একত্র সংবদ্ধ হইয়া বাস করে। বঙ্গদেশে কয়েক প্রকার সঙ্ঘপ্রাণী দৃষ্ট হয়। ইহারা পুকুরের জলে গাছের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া বাস করে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়, কলিকাতার পুকুরে বহুবার এই জাতীয় প্রাণী দেখা গিয়াছে।

মন্দগামী (Tardigrada) নামক কয়েকটি আণুবীক্ষণিক প্রাণী আছে, যাহারা দেখিতে ঠিক ভালুকের মত। এদেশে এ প্রাণির কোন আলোচনা হয় নাই। বহুদিন হইল, আমি গাছের টবের মাটিতে এই প্রাণী দেখিয়াছিলাম। সুতরাং ইহারা যে বঙ্গে দৃষ্ট হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কণ্টকচর্ম্মী (Echinodermata) নামে এক বিভাগে তারা মৎস্য, ভঙ্গপ্রবণ তারা, জল-কণ্টকী, জল-কুষ্মাণ্ড নামে বহু প্রাণী দৃষ্ট হয়। ইহারা সমুদ্রের তলায় বাস করে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এই সকল প্রাণী দৃষ্ট হয়। যাদুঘর হইতে ইহাদের সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

অবশেষে আমরা মেরুদণ্ডী প্রাণিগুলির নিকট উপস্থিত হইলাম। কয়েক জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী ভিন্ন মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও পশু এই বিভাগের অন্তর্গত।

মৎস্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। Hamilton সাহেবের Fishes of the Ganges প্রকাশিত হইবার পর Day সাহেব Fishes of India নামক এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন; ইনিই আবার Fauna of the British Indiaতে ভারতীয় মৎস্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার পর আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ বি, এল্ চৌধুরী মহাশয় বহুদিন যাবৎ মৎস্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন; তিনি বহু অজ্ঞাত মৎস্য আবিষ্কার এবং তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন। ইঁনি অবসর গ্রহণ করিলে ডাঃ সুন্দরলাল হোরা মহাশয় এখনও মৎস্যের চর্চ্চা করিতেছেন। সম্প্রতি আমি বঙ্গভাষায় বাংলার মৎস্যপরিচয় নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকৃতি নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে যতদূর সম্ভব মৎস্যগুলির দেশীয় নাম লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

ভারতীয় উভচর এবং সরীসৃপগুলির বিবরণ Fauna of the British Indiaতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের ভেক

উভচর শ্রেণীর অন্তর্গত। সরট্, সর্প, কুমীর ও কচ্ছপ সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত। Fayrer নামক সাহেব ভারতীয় বিষধর সর্প এবং তাহাদের বিষ সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পদিন হইল Wall নামক এক সাহেব Poisonous Terrestrial Snakes of India নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থে বঙ্গদেশের সর্পের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অন্যান্য বঙ্গীয় সরীসৃপ সম্বন্ধে আর কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

Fauna of the British Indiaতে দুই সংস্করণে ভারতীয় পক্ষীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; পক্ষীদের বিবরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বঙ্গদেশে ডাঃ শ্রীসত্যচরণ লাহা মহাশয় বহুদিন হইতে পক্ষী সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতেছেন এবং কয়েকখানি পুস্তকও সঙ্কলন করিয়াছেন।

পশু সম্বন্ধেও আমরা Fauna of the British Indiaর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে পারি। ইহার পর সময়ে সময়ে নানা পত্রিকায় পশু সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে।

অবশেষে আমি এই সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জ্ঞাপন করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। আমরা বিভিন্ন বিভাগের প্রাণিদিগের সম্বন্ধে আলোচনায় দেখিতে পাইলাম যে, বঙ্গদেশের, বঙ্গদেশ কেন, সমুদয় ভারতবর্ষের প্রাণিসঙ্ঘের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এখনও অতিশয় অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আমরা যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রতি দৃক্‌পাত করি তখন দেখিতে পাই—সকল দেশেরই প্রাণিসমষ্টি সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কেবল ভারতবর্ষ অন্যান্য বহু

বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও অনেক পিছাইয়া পড়িয়া আছে। ইহা আমাদের পক্ষে কম দুঃখ এবং লজ্জার কথা নহে। আজকাল যেমন এদেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, প্রাণিবিজ্ঞানের আলোচনা যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রাণিবিজ্ঞানের এইদিক্ —প্রাণিসঙ্ঘ—কেন অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে? যাহাতে বঙ্গের প্রাণিসঙ্ঘের জ্ঞান শীঘ্রই সম্পূর্ণতা লাভ করে, তদ্বিষয়ে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনযোগী হউন, ইহাই আমার প্রার্থনা। এতদিন বিদেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আমাদের দেশে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, আজ যেন আমাদের স্বদেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেই কার্য্যে ব্রতী হন, ইহা আমার ঐকান্তিক বাসনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—নাজু

শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

অষ্টাদশ অধিবেশন

মাজু—হাওড়া

বঙ্গাব্দ ১৩৩৫

কার্য্য-বিবরণী

প্রথম দিবস—১৬ই চৈত্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ইং ৩০এ মার্চ্চ, ১৯২৯, শনিবার, বেলা ২ ঘটিকা।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতিগণ, সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদক, সহকারী সম্পাদকগণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ এবং প্রতিনিধিগণ ও সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক প্রভৃতি সভা-মণ্ডপে সমবেত হইলে পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, দক্ত্যের এস্ লেতার্ (পারী) বেদান্ততীর্থ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মান্না মহাশয়ের নেতৃত্বে 'জুজারসাহা কন্‌সার্ট পার্টি' কর্ত্তৃক ঐক্যতান বাদন হয়।

১। প্রথম প্রস্তাব—মঙ্গলাচরণ

(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপদ কাব্যতীর্থ মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া সম্মিলনের মঙ্গলাচরণ করেন।

(পরিশিষ্ট—ক)

(খ) অধ্যাপক কাব্যব্যাকরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থোপাধিক শ্রীযুক্ত রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা উপস্থিত সভ্য মণ্ডলীকে সম্বর্দ্ধনা করেন। (পরিশিষ্ট—খ)

(গ) মাজু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বিদ্যারত্ন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতাদ্বারা মঙ্গলাচরণ করেন। (পরিশিষ্ট—গ)

২। **সভাপতি-বরণ**—অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি সরকার এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির পক্ষে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি-আই-ই, আই-এস্-ও, এম্-বি, এফ্-সি-এস্ বাহাদুরের সমর্থনে, মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষৎ শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল, ও হাওড়া গোবর্দ্ধন সঙ্গীত-সমাজের পক্ষে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস মহাশয়দ্বয়ের অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত মহাশয়গণ সম্মিলনের মূল সভাপতি, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

(ক) **মূল সভাপতি**—ডক্টর শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি-এ, ডি লিট্, কবিশেখর।

(খ) **সাহিত্য-শাখার সভাপতি**—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) **ইতিহাস-শাখার সভাপতি**—শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশ-চন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এচ্ ডি।

(ঘ) **দর্শন-শাখার সভাপতি**—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এম্-এ, পি-এচ্ ডি।

(ঙ) **বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি**—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্র-নাথ ঘোষ এম-ডি, এম্-এস্‌সি, এফ্-জেড্-এস্।

৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি মহাশয়গণকে ধান্য দুর্ব্বাদি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলে পর চন্দনাদি দান করিলেন এবং কুমারী শ্রীমতী অশোকাবতী বসু শঙ্খধ্বনি করিয়া সভাপতি মহাশয়গণকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন। সভামণ্ডপ ধূপ ধূনাদি দ্বারা আমোদিত হইল।

৪। সভাপতি বরণের পর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর রচিত "জননী বঙ্গ ভারতী" সঙ্গীত আন্দুলনিবাসী সুগায়ক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা কুমারী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর দ্বারা গীত হইল। (পরিশিষ্ট—ঘ)

৫। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, দক্ত্যের এস্ লেতার্ (পারী) বেদান্ততীর্থ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

৬। সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম ও পঞ্চদশ অধিবেশনের সভাপতি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এবং সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, ডি লিট, সি-আই-ই মহাশয়ের "সম্বোধন" নামক পত্র এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের প্রেরিত পত্র পাঠ করিলেন। (পরিশিষ্ট—ঙ ও চ)

৭। মূল সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি-এ, ডি-লিট্, কবিশেখর মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

৮। মৌলবী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়-রচিত 'ভারতচন্দ্র' নামক কবিতা শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার মহাশয় পাঠ করেন। (পরিশিষ্ট—ছ)

৯। নাট্যাচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়-রচিত 'ভারতচন্দ্র' কবিতাটি সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন। (পরিশিষ্ট—জ)

১০। কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ, মহাশয় স্বরচিত 'ভারতচন্দ্র' কবিতা পাঠ করেন। (পরিশিষ্ট—ঝ)

১১। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়-স্বরচিত "মহাকবি ভারতচন্দ্র" কবিতাটি পাঠ করেন। (পরিশিষ্ট—ঞ)

১২। মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষৎ শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল্ মহাশয় স্বরচিত "ভারতচন্দ্র" কবিতাটি পাঠ করেন। (পরিশিষ্ট—ট)

১৩। সাধারণ সভামণ্ডপে দর্শন-শাখার সভাপতি অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এচ ডি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৪। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠনের পর সাধারণ সভার কার্য্য অদ্যকার মত সমাপ্ত হয়।

১৫। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস রচিত "অভিনন্দিত করি জয় হে" সঙ্গীতটি শ্রীমতী লীলা সরকার কর্ত্তৃক গীত হইলে পর সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় সভাভঙ্গ হয়। (পরিশিষ্ট-ঠ)

১৬। তৎপরে "কলিকাতা রেডিও কোম্পানী" বেতার যন্ত্র সাহায্যে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করান।

১৭। রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত চিত্ত-রঞ্জন গোস্বামী মহাশয় কৌতুকাভিনয় করিয়া সমবেত প্রতিনিধিগণকে মোহিত করেন।

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি

দ্বিতীয় দিবস প্রাতে ৭॥০ ঘটিকার সময় মাজু স্কুল হোষ্টেল গৃহে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হয়।

দ্বিতীয় দিবস

১৭ই চৈত্র, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ইং ৩১এ মার্চ্চ ১৯২৯, রবিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা।

"জুজারসাহা কন্‌সার্ট পার্টি" কর্ত্তৃক ঐক্যতান বাদন হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর রচিত "আজি জয় তব জয়" সঙ্গীতটি কুমারী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর দ্বারা এবং শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস রচিত "নূতন তোমায় নেব আমি" সঙ্গীতটি শ্রীমতী লীলা সরকার কর্ত্তৃক গীত হইল। (পরিশিষ্ট—ড ও ঢ)

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডক্‌টর রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, বি-এ, ডি- লিট্, কবিশেখর আসন গ্রহণ করিলে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১। **প্রথম প্রস্তাব**—মঙ্গলাচরণ।

২। **দ্বিতীয় প্রস্তাব**—সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এফ্ সি এস্, (লণ্ডন) মহাশয় বিগত সপ্তদশ অধিবেশনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত মৃত নিম্নলিখিত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-বন্ধুগণের নাম পাঠ করিলেন এবং তাঁহাদের বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে গভীর শোক প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন—

(ক) সাহিত্য-সেবী

১। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি।
২। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

৩। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্-এ, বি-এল্।

৪। ডাঃ নলিনীকান্ত দত্ত এম্-এ, পি-এচ্ ডি।

৫। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, এফ্-আর-হিষ্ট্-এস্।

৬। রামপ্রাণ গুপ্ত বি এল্।

৭। কেদারনাথ মজুমদার।

৮। মহেন্দ্রনাথ করণ।

৯। অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্।

১০। শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এফ্-আর-জি-এস্।

১১। হরগোপাল দাস কুণ্ডু।

১২। হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি-এ।

১৩। রাজেশ্বর গুপ্ত।

১৪। রায় অবিনাশচন্দ্র বসু মল্লিক বাহাদুর এম্-এ, পি আর-এস

১৫। রায় বিপিনবিহারী গুপ্ত বাহাদুর এম্-এ।

১৬। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী এম্-এ।

১৭। কবিরাজ যামিনীভূষণ সেন এম্-এ।

১৮। কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন।

১৯। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্চী এম্-এ।

২০। রসময় লাহা।

২১। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

২২। যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি-এ।

২৩। হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

২৪। বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।

২৫। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ।

২৬। শশাঙ্কমোহন সেন এম্-এ, বি-এল

২৭। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য!

২৮। রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী।

২৯। গীষ্পতি কাব্যতীর্থ।

৩০। ডাঃ পশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল, পিএচ্ ডি,।

৩১। রায় সুরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর এম্-এ।

৩২। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

৩৩। প্রকাশচন্দ্র দত্ত।

৩৪। বিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

৩৫। গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল।

৩৬। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ।

৩৭। স্বামী সারদানন্দ।

৩৮। খান্ বাহাদুর তস্‌লিমুদ্দিন আহম্মদ বি-এল।

৩৯। পুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ।

৪০। রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম্-এ, বি-এল।

৪১। পীযূষকান্তি ঘোষ।

৪২। সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) সাহিত্য-বন্ধু

১। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

২। সতীশরঞ্জন দাশ এম্-এ, ব্যারিষ্টার।

৩। মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

৪। স্যর কৈলাসচন্দ্র বসু সি-আই-ই।

৫। রায় রামচরণ মিত্র বাহাদুর এম্-এ, বি-এল, সি-আই-ই।

৬। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-এল।

৭। রায় উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এম্-এ, এফ্-এস্ এল্।

৮। রায় নলিনীনাথ শেঠ বাহাদুর বি-এ।

৯। রায় বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর বি-এ।

১০। নিত্যধন মুখোপাধ্যায় বি-এল্

১১। ডাঃ সরোজিনীনাথ বর্দ্ধন এল্-এম্-এস্।

১২। চিন্তামণি ঘোষ।

১৩। যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্।

১৪। যোগেনচন্দ্র দত্ত এম্-এ, বি-এল্, এটর্ণি।

সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল মৃত সাহিত্য-

সেবী ও সাহিত্য-বন্ধুর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে পর তাঁহাদের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(৩) শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত মহাশয় সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া যাঁহারা পত্র দিয়াছেন তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন।

১। মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে-সি-আই-ই।

২। শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-এ, এল্‌-এল্‌-ডি,-সি-আই-ই

৩। শ্রীযুক্ত স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে-সি-আই-ই।

৪। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্‌-এ।

৫। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মোদক, ডিষ্ট্রিক্ট জজ, হাওড়া।

৬। ,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি-এল্‌, সি-আই-ই।

৭। ,, তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এল্‌-সি।

৮। ,, শশধর রায় এম্‌-এ, বি-এল্‌।

৯। ,, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

১০। ,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

১১। ,, রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি-এ।

১২। ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

(৪) সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ, এফ্‌-সি-এস্‌ (লণ্ডন) মহাশয় গত সপ্তদশ (বীরভূমে অনুষ্ঠিত) অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ উপস্থাপিত করিয়া উহা গ্রহণের প্রস্তাব করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম্‌-এ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত **তৃতীয় প্রস্তাব** উপস্থাপিত করিলেন।

এই বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, যথাসম্ভব

ক্ষিপ্রতার সহিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হউক এবং নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া এতদর্থে একটি সমিতি গঠিত করা হউক। অনধিক তিন বৎসরের মধ্যে যাহাতে এই জীবনী ও গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক এবং এই সম্বন্ধে অর্থ সংগ্রহাদি যাবতীয় কার্য্যের ভার সমিতিকে দেওয়া হউক। সমিতি দুই মাসের মধ্যে লোক নিযুক্ত করিবেন এবং কার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহাদের কার্য্য-বিবরণ সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির নিকট প্রেরণ করিবেন। আবশ্যক বোধ হইলে সমিতি নিজ সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া (ক) কার্য্যকরী-সমিতি ও (খ) সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠিত হইল,—

(ক) কার্য্যকরী-সমিতি—

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্—সম্পাদক।
,, হরলাল মজুমদার—সহকারী সম্পাদক।
,, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কোষাধ্যক্ষ।
,, অনিলকুমার সরকার এম্-এ।
,, ফণিভূষণ দত্ত এম্-এ।
,, প্রভাকর মুখোপাধ্যায়।
,, রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী।

(খ) সম্পাদক-সঙ্ঘ—

শ্রীযুক্ত ডাঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর।
,, ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
,, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
,, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
,, রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী।

(গ) এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবার পর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাব পঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে—

শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর	.	...	১০০৲
,, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	...	১০০৲
,, মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য ও রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য	...	...	১০০৲
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	...	...	২০০৲
,, ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	...	১৫০৲
,, হরলাল মজুমদার	...	...	৫০৲
,, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন	...	...	৫০৲
গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ	...	...	৫০৲
শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায়	...	.	৪৫৲
,, মহাদেবচন্দ্র চন্দ্র	...	...	২৫৲
,, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার	...	...	২৫৲
,, সুধামাধব পাঠক	...	...	২০৲
,, ডাঃ সহায়রাম বসু	...	..	১৫৲
,, ফণিভূষণ দত্ত	...	...	১০৲
,, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১০৲
,, ফণিভূষণ বসু	...	...	১০৲
,, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি	...	...	১০৲
,, হারীতকৃষ্ণ দেব	...	...	১০৲
,, নবগোপাল বসু	...	...	১০৲
,, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	...	১০৲
,, সারস্বত সংঙ্ঘ	...	...	১০৲
প্রভাসচন্দ্র সেন	...	...	৫৲

শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	...	...	৫৲
,, কানাইলাল দাস	...	...	৫৲
,, অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য	..	...	৫৲
,, সুকুমাররঞ্জন দাশ	...	...	৫৲
,, নিরাপদ চট্টোপাধ্যায়	...	...	৫৲
,, গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী	...	...	৫৲
,, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য	...	...	৫৲
ফ্রেণ্ডস্ ইউনাইটেড্ লাইব্রেরী ...		...	৫৲
			মোট টাকা—১০৫৫৲

এই প্রসঙ্গে আরও স্থির হইল যে, সম্মিলনের অধিবেশন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলানের পর যদি কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা এই ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে।

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণকল্পে সমস্ত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) রাধানগরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের স্মৃতি-মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য সাহায্য করিতে সমগ্র ভারতবাসী সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী এবং স্বর্গীয় মহাত্মার গুণমুগ্ধ ও অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রকেই এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

(গ) কাঁটালপাড়ায় "বঙ্কিম-ভবনে" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক এবং তজ্জন্য একটি সমিতি গঠিত হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব—

হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস, প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তথ্যাদিপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমনভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও প্রচারণ পাঠাগার (circulating library) স্থাপন করিবার জন্য সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডকে এবং ইংরাজী স্কুল ও কলেজ সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত সংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

সপ্তম প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি উচ্চ, কি নিম্ন, সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত করা আবশ্যক।

(ক) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন—এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(খ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাই-বার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(গ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থপ্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী, পার্শী ও ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঙ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধার সাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত।

উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট প্রেরিত হউক

অষ্টম প্রস্তাব—

এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, বাঙ্গালা দেশে কৃষিবিষয়ক পত্রিকা অধিক পরিমাণে সাধারণের বোধগম্য রূপে যাহাতে প্রচারিত হয় এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও মৌলিক

গবেষণা করিয়া পুস্তকাদি প্রচার করা হয়, তদ্বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

নবম প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, কৃষি-কথা, ব্রতকথা, উপকথা প্রভৃতি, বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক। হাওড়া জেলায় এই কার্য্য করিবার জন্য হাওড়াবাসীকে অনুরোধ করা হউক এবং প্রতি বৎসর সম্মিলনের অধিবেশনে এই সমিতিগুলিকে তাহাদের কার্য্যবিবরণ উপস্থাপিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

দশম প্রস্তাব—

প্রত্যেক জেলায় ঐতিহাসিক তথ্য, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য জেলা বোর্ডগুলি শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহায্য (grant) হইতে অথবা আবশ্যক হইলে এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ হইতে প্রতি বৎসর কতক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখুন। এই কার্য্যে শিক্ষা দিবার জন্য অন্ততঃ প্রতি বৎসর দশজন করিয়া ছাত্র ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিভাগের নির্দ্দেশমত যাহাতে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। এতদ্ব্যতীত ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হউক, যেন তাঁহারা স্ব স্ব জেলার প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্-তত্ত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন ও সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

একাদশ প্রস্তাব—

বঙ্গদেশে যে সকল মেডিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করা হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব—

সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে একটি স্থায়ী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সমিতি গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। এই শাখা-সমিতি প্রতি মাসে যে সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাঁহাদিগের মন্তব্য সহ প্রতি বার্ষিক অধিবেশনে সেই নির্ঘণ্ট আলোচনার জন্য উপস্থিত করিবেন।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব—

সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং বিষয়ান্তরের আলোচনাকারীদিগের আলোচনার সুবিধার জন্য প্রতি বর্ষে বাঙ্গালার সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালা অথবা অন্য ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ
র এক একটি তালিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক। সম্ভবপর হইলে এই তালিকা প্রতি বৎসর সম্মিলনে উপস্থাপিত করা হইবে। পরিচালন-সমিতি এই কার্য্যের জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়া দিবেন। এই সমিতির সভ্যগণের মধ্যে এক বা অধিক ব্যক্তিকে এক এক বিষয়ের তালিকা সংগ্রহের ভার দেওয়া হউক।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হউক।

সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি

কলিকাতা—

১। শ্রীযুক্ত ডাঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি-এ, ডি লিট্—সভাপতি
২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, ডি-লিট্, সি-আই-ই।
৩। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল্ বেদান্তরত্ন।
৪। শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, সি-আই-ই, আই-এস্-ও, এম্-বি, এফ্-সি-এস্।
৫। ,, ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সি-আই-ই, এম্-এ, এল্-এল্-ডি।
৬। ,, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি-আই-ই, ডি-এস্-সি, পি-এচ্-ডি।
৭। ,, রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি।
৯। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।
১০। মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে-সি-আই-ই।
১১। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি-এস্-সি (এডিন) এফ্-আর-এস্-ই।
১২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ,।
১৩। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।
১৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।
১৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-ডি, এম্-এস্-সি, এফ্-জেড্-এস্।
১৬। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।
১৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-লিট্।

১৮। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্-এ।

১৯। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্-এ, বি-এল্।

২০। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্-এ।

২১। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

২২। শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্-এ, বি-এল্, পি-এচ্-ডি।

২৩। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

২৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

২৫। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়।

২৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পি-এচ্-ডি।

২৭। শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম্-এ, বি-এল্।

২৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্রেয় এম্-বি।

২৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী।

৩০। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্-এ।

৩১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্।

৩২। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি-এ।

৩৩। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ।

৩৪। শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ বাহাদুর।

৩৫। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

৩৬। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৩৭। শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, ভাষাতত্ত্বনিধি।

৩৮। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, এফ্-সি-এস্।

৩৯। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

৪০। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

৪১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ।

৪২। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

৪৩। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এম্-এ, পি-এচ্-ডি।

৪৪। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এস্ সি।

৪৫। শ্রীযুক্ত অমল চন্দ্র হোম

৪৬। শ্রীযুক্ত রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ, বাহাদুর।
৪৭। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।
৪৮। শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর।
৪৯। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ।
৫০। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী বি-এ।

নদীয়া—

১। মৌলবী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ।
২। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম্-এ।

হুগলী—

৩। কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।

খুলনা—

৪। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র এম্-এ।
৫। শ্রীযুক্ত গোলাম মুস্তাফা

বরিশাল—

৬। শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সেন বি-এল্ বিদ্যাভূষণ।
৭। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী।

ফরিদপুর—

৮। মৌলভী মোহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
৯। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম্-এ, কাব্যতীর্থ।

হাওড়া—

১০। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্।
১১। শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার।

ঢাকা—

১২। শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এচ্ ডি।
১৩। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

২৪ পরগণা—

১৪। শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী,এম্-এ, বি-এল্।

বীরভূম—

১৫। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন।

১৬। শ্রীযুক্ত রায় নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর।

বর্দ্ধমান—

১৭। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ।

বাঁকুড়া—

১৮। শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এম্-এ, বিদ্যানিধি।

মেদিনীপুর—

১৯। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল্।

মুর্শিদাবাদ—

২০। শ্রীযুক্ত মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম্-এ।

২১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়।

রংপুর—

২২। শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী বাহাদুর।

২৩। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ।

দিনাজপুর—

২৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল্।

২৫। শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদীশনাথ রায় বাহাদুর।

পাবনা—

২৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়।

২৭। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরী।

রাজসাহী—

২৮। শ্রীযুক্ত কুমারশরৎ কুমার রায় এম্-এ।

শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকার।

মালদহ—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী।

বগুড়া—

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল্।

জলপাইগুড়ি—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সান্যাল।

ত্রিপুরা—

শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চট্টগ্রাম—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী।

মৌলবী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।

দার্জ্জিলিং—

শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্-এ।

নোয়াখালী—

শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ এম্-এল্-সি।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্-এ, বি-এল্।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা হইতে—

শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে—মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালনা।

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এল্—কৃষ্ণনগর।

শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ রায় এম্-এ, বি-এল্—ভাগলপুর।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র পাল বি-এ—মীরাট।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়—বারাণসী।

সাধারণ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ, ডি-লিট্ কবিশেখর মহাশয় এই সম্মিলনের বিভাগীয় সভাপতিগণকে, সম্পাদকগণকে, প্রবন্ধ-লেখক ও প্রবন্ধ-পাঠকদিগকে, উদ্যোক্তা, সাহায্যদাতা এবং স্বেচ্ছাসেবক-গণকে ধন্যবাদাদি জ্ঞাপন করিলেন। পরিশেষে মাজুগ্রামের অননুকরণীয় আতিথেয়তার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতিকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং অভ্যর্থনা-সমিতিকে ধন্যবাদ দিলেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য মূল-সভাপতিকে, শাখা-সভাপতিগণকে, প্রতিনিধিগণকে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার এই সম্মিলনের অধিবেশনার্থ স্থান দান করিবার জন্য মাজু উচ্চ ইংরাজী স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর বার্ণ ও মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর স্বত্তাধিকারী শ্রীযুক্ত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে-সি-আই-ই মহাশয়কে এই সম্মিলনে ৫০০৲ টাকা সাহায্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। জল সরবরাহের জন্য হাওড়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডকে এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য হাওড়া-আমতা রেলের এজেন্টস্ মার্টিন এণ্ড কোম্পানীকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ রচিত "বিদায় দানিতে কণ্ঠ যে রোধে" সঙ্গীত শ্রীমতী প্রতিভা দেবী কর্ত্তৃক গীত হইল। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস-রচিত "কি পেলে আজ বলে যেয়ো" সঙ্গীতটি শ্রীমতী লীলা সরকার কর্ত্তৃক গীত হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

(পরিশিষ্ট ণ ও ত)

সাহিত্য-শাখার অধিবেশন।

১৭ই চৈত্র ১৩৩৫, ৩১এ মার্চ্চ ১৯২৯, রবিবার,

স্থান—সম্মিলন-মণ্ডপ ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্-এ, ডি-এল্

সাহিত্য-শাখার নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত হইতে অক্ষমতা জানাইয়া যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা বিজ্ঞাপিত হইলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্-এ, ডি-এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

সাহিত্য-শাখার পাঠের জন্য ৬টি কবিতা এবং ৯টি প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত কবিতা এবং প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল—

(ক) কবিতা—

১। ভারতচন্দ্র—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন্ সেন গুপ্ত।

২। বন্দনা-গীতি—শ্রীযুক্ত দেবশঙ্কর দত্ত।

৩। বঙ্গ গৌরব—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

৪। সুন্দরে চির সুন্দর—শ্রীযুক্ত উমাপদ মুখোপাধ্যায়।

৫। ডোমের ব্যথা—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সরকার কবিশেখর বি-এল্।
পাঠক—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। বাণীবিলাপ—শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায়।

(খ) প্রবন্ধ—

১। আমাদের সমাজ ও সাহিত্য—শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত।

২। মেঘদূতে নারীর প্রভাব—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।

৩। সীতারামের স্ত্রী—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

৪। রবি-মণ্ডল—শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত।

৫। শিল্প-কলা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রসন্নকুমার আচার্য্য, এম্-এ, পি-এচ্ ডি, ডি-লিট, আই-ই-এস্।

৬। বাউল গান—শ্রীযুক্ত মহম্মদ মনসুর উদ্দিন এম্-এ।

৭। প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের একপৃষ্ঠা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ভিষগ্-রত্ন।

৮। প্যারীচাঁদ মিত্র—শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার।

৯। পাতিহালের কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্বন্ধে মূল সভাপতি কিছু বলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে, সম্পাদকগণকে প্রবন্ধলেখক ও পাঠকগণকে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হয়।

ইতিহাস-শাখার অধিবেশন

১৭ই চৈত্র ১৩৩৫, ৩১এ মার্চ্চ ১৯২৯, রবিবার

স্থান—সম্মিলন মণ্ডপ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পি-এচ্ ডি।

শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

এই শাখার পাঠের জন্য ১০টি প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭টি পঠিত হয় এবং ৩টি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

(ক) নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল—

১। ভারতবর্ষে পারস্যাভিযান—শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব এম্-এ।

২। পালরাজগণের রাজধানী—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল্।

৩। বহির্জগতে ভারতের দান—শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী এম-এ, ডি-লিট্।

৪। প্রাচীন ভারতে পরিব্রাজকগণ—শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্-এ, বি-এল্, পি-এচ্ ডি।

৫। বঙ্গ কোন্ দেশ—শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এম্-এ, পি-এচ্ ডি।

৬। বঙ্গদেশীয় স্বাধীন ভৌমিকগণ—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ

৭। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বিদ্যারত্ন।

(গ) নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল—

১। প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এ।

২। প্রাচীন বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা—শ্রীযুক্ত তমোনাশ দাশ গুপ্ত এম্-এ।

৩। বঙ্গ দেশের আধুনিক ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ, পি-এচ ডি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে, সম্পাদকগণকে, প্রবন্ধ-লেখকগণকে ও প্রবন্ধ-পাঠকগণকে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

দর্শন-শাখার অধিবেশন

১৭ই চৈত্র ১৩৩৫, ৩১এ মার্চ্চ ১৯২৯, রবিবার

স্থান—মাজু-উচ্চ-ইংরাজী-স্কুলগৃহ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, দক্তোর এস্ লেতর্ (পারী) বেদান্ততীর্থ শাস্ত্রী।

দর্শন-শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এম্-এ, পি-এচ্ ডি মহাশয় তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ-সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য অদ্য এই সভায় উপস্থিত হইতে অক্ষম হওয়ায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার স্থানে দর্শন-শাখার সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

দর্শন-শাখায় পাঠের জন্য ১০টি প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। কিন্তু সময়ের অল্পতা বশতঃ ৯টি প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইয়া উঠিল না। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধগুলির নাম পাঠ করিলেন। একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

১। স্বর্গভোগ রহস্য—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

২। জৈন দর্শনে ঈশ্বর—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল

৩। দর্শনের লক্ষণ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। সাংখ্যে ঈশ্বর—শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য।

৫। অন্তর্ব্যাপ্তি—শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়।

৬। দুঃখবাদ ও জীবনের লক্ষ্য—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৭। জ্যোতিঃ দর্শন—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ।

৮। অদ্বৈতবাদ ও বহুদেববাদ—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

৯। হিন্দুদর্শনে বেদান্ত—শ্রীযুক্ত দাশরথি ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ।

১০। বেদান্ত দর্শনে উপাসনা-তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম্-এ, বি-এল্,।

"স্বর্গভোগ-রহস্য" প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় পাঠ করিয়াছিলেন। বাকি ৯টি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

দর্শন-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাণধন ঘোষাল এম্. এ. মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে এবং প্রবন্ধ-লেখক ও প্রবন্ধ-পাঠকগণকে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন

১৭ই চৈত্র ১৩৩৫, ৩১এ মার্চ্চ ১৯২৯, রবিবার

স্থান—মাজু-স্কুল-হোষ্টেল-গৃহ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌ ডি,

এম্‌এস্‌-সি, এফ্‌-জেড্‌-এস্‌।

উপস্থিতি— শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ্‌-জি-এস্‌।

শ্রীযুক্ত ডাঃ স্নেহময় দত্ত এম্‌ এ, ডি এস্‌-সি (লণ্ডন)।

শ্রীযুক্ত ডাঃ সহায়রাম বসু এম্‌ এ, ডি এস্‌-সি, ।

এফ্‌-আর-এস্‌-ই।

শ্রীযুক্ত ডাঃ সিদ্ধেশ্বর মজুমদার এম্‌-এ, পি-এচ্‌ ডি।

শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্‌ এ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ-সি-এস্‌।

বিজ্ঞান-শাখার গত অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌-এ, এফ্‌-জি-এস্‌ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

১। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান অধিবেশনের জন্য নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন এম্‌ এ, ডি এস্‌-সি মহাশয় অধিবেশনের মাত্র চারি দিন পূর্ব্বে অসুস্থ হওয়ায় তিনি ও বিজ্ঞান-শাখার সম্পাদক মহাশয় পরামর্শ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌ ডি, এম্‌ এস্‌-সি মহাশয়কে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, এবং শ্রীযুক্ত একেন্দ্র বাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক এত অল্প সময় সত্বেও এই পদ গ্রহণে স্বীকৃত হওয়ায় আজ এই বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন সম্ভব হইয়াছে। অতঃপর শ্রীযুক্ত একেন্দ্র বাবু যথারীতি সভাপতি-পদে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত

হইলে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ও "বাঙ্গালার প্রাণি-সঙ্ঘ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'' নামক প্রবন্ধ তাঁহার অভিভাষণরূপে পাঠ করিলেন।

এই শাখায় পাঠের জন্য ৯টি প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭টি পঠিত হয় এবং ২টি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

২। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল—

১। ইলেকট্রন তরঙ্গ—শ্রীযুক্ত ডাঃ স্নেহময় দত্ত এম্ এ, ডি-এস্-সি।

২। ভক্ষ্য ছাতু ও বিষাক্ত ছাতুর (চলিত কথায় 'ব্যাঙের ছাতা') প্রভেদ চিনিবার উপায়—শ্রীযুক্ত ডাঃ সহায়রাম বসু এম্-এ, ডি এস্-সি, এফ্ আর-এস।

৩। ভারতে মানবের প্রাচীণত্ব—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্-এ, এফ্-জি-এস।

৪। একটি প্রশ্ন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ, এফ্-জি-এস।

৫। অনেক বর্ণ সংজ্ঞা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।

৬। ঋগ্বেদের অশ্বদেবতা—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-ডি, এম্ এস্-সি।

৭। বংশানুক্রমে গুণনীয়ক প্রভাব সমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction of factors in inheritance)—শ্রীযুক্ত ডাঃ স্বর্ণকুমার মিত্র এম্-এ, পি-এচ্ ডি।

(লেখকের অনুপস্থিতিতে সম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধ পাঠ করেন)

৩। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল—

১। ডোমৎসিয়া (Domatia) বৃক্ষপত্রে কীট গৃহ—শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাস এম্-এ।

২। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য স্থপতি প্রণালী—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

৪। তৎপরে বিজ্ঞান-শাখার গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌-এ, এফ্‌-জি-এস্‌ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্‌ এ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন এম্‌ এ, ডি এস্‌-সি মহাশয় আগামী সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি কয়েক বৎসর যাবত সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন এবং তিনি এই পদে নিযুক্ত থাকিতে একবারেই অনিচ্ছুক। সেই জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, আগামী সম্মিলনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্‌-এ, মহাশয় বিজ্ঞান-শাখার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হউন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবু আগামী সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

৭। শ্রীযুক্ত ডাঃ সহায়রাম বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

৮। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বৎসর যাবত বিজ্ঞান-শাখার সম্পাদকের কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া এইবার অবসর গ্রহণ করিতেছেন। এই জন্য বিজ্ঞান-শাখার পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে সভাভঙ্গ হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতির

কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা

পৃষ্ঠপোষক—রায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম্-এ, বি-এল্।

রায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু বাহাদুর বি-এল্, চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, হাওড়া।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন্ বি-এল্, চেয়ারম্যান, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী।

শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ নন্দী এম্-ডি

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় এম্-এ, বি-এল্, ভাইস-চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, হাওড়া।

শ্রীবিনোদবিহারী হালদার এম্-এ,

শ্রীখগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্, এম্-এল্-সি

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র, বি-এ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, দক্তোর এস্ লেতর্ (পারি), বেদান্ততীর্থ, শাস্ত্রী।

সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী (পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা)।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বি-এ, ভাইস-চেয়ারম্যান, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী।

শ্রীপ্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়, জমিদার, শিবপুর

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি এল্

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার

সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত শরদিন্দু গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ

শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সুকুমার ভট্টাচার্য্য

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

হিসাব-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মজুমদার

সম্পাদকগণ—অভ্যর্থনা বিভাগ

শ্রীযুক্ত রণধীর চট্টোপাধ্যায় বি-এ

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায়

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত বি-এ

শ্রীযুক্ত রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য বেদান্ততীর্থ

শ্রীযুক্ত অনুরূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত পান্নালাল সিংহ বি-এ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল

সম্পাদকগণ—স্বাস্থ্য বিভাগ

শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রেমতোষ বসু এম্-বি

শ্রীযুক্ত ডাঃ অখিলচন্দ্র দত্ত এম্-বি, ডি-টি-এম্

সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুধীরকুমার সরকার, এম্-বি

শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ মণ্ডল, এল্-এম্-পি

সম্পাদক—আমোদপ্রমোদ বিভাগ

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী।

সম্পাদক—খাদ্য বিভাগ

শ্রীযুক্ত রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য বেদান্ততীর্থ

সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক—মণ্ডপ বিভাগ

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, এন্‌জিনিয়ার

সম্পাদক—যানবাহনাদি বিভাগ

শ্রীযুক্ত নীরাপদ চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত দামোদর ঘোষাল

সম্পাদক—স্বেচ্ছাসেবক বিভাগ

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদক—বাসস্থান বিভাগ

শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী এম্-এ

সম্পাদক অধিবেশন বিভাগ

শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বিদ্যারত্ন

সম্পাদক—সাজসরঞ্জাম বিভাগ

শ্রীযুক্ত নবগোপাল মুখোপাধ্যায

সম্পাদকগণ—সাহিত্য-বিভাগ

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত, এম্-এ

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকগণ—ইতিহাস-বিভাগ

শ্রীকিরণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্,

শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সরকার এম্-এ

সম্পাদকগণ—দর্শনবিভাগ

শ্রীযুক্ত রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

শ্রীযুক্ত প্রাণধন ঘোষাল এম্-এ, বি-এল্

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি সরকার এম্-এ, বি-এল্

সম্পাদক—বিজ্ঞান বিভাগ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের এই অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য-রূপে এবং সাহায্যকারিরূপে যাঁহারা যে চাঁদা বা সাহায্যদান করিয়াছেন তাঁহাদের নাম এবং তাঁহাদের প্রদত্ত চাঁদার বা সাহায্যের পরিমাণ এই তালিকায় প্রকাশিত হইল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ

মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোং লিঃ	হাওড়া	...	৫০০৲
শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		...	২০০৲
			৭০০৲

জের—			৭০০৲
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	নিজবেলিয়া	...	১০৫৲
,, আশুতোষ মান্না	জুজারসাহা	...	৬০৲
,, বিভূতিভূষণ মণ্ডল		...	৬০৲
,, খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মাঃ	শালকিয়া	...	৫২৲
জনৈক সাহায্যকারী		...	৫১৲
শ্রীযুক্ত রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য		...	৫০৲
,, শশধর গায়েন		...	৫০৲
,, হীরালাল পাত্র	খড়েলা	...	৫০৲
ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, হাওড়া		...	৪৫৲
শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রেমতোষ বসু		...	৩০৲
,, অনুরূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	শিবপুর	...	২৫৲
,, অমূল্যচরণ চরিত	নিজবেলিয়া	...	২০৲
,, প্রবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	...	২০৲
,, মহাবুব ইলাহী	কলিকাতা	.	২০৲
,, হরকুমার দে	হাওড়া	...	২০৲
,; হরিশঙ্কর পাল	শিবপুর	...	২০৲
,, পশুপতি মুখোপাধ্যায়	নলদা	...	১৭।০
,, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	...	১৫৲
,, নবগোপাল মুখোপাধ্যায়	নলদা	..	১৫৲
,, বিষ্ণুপদ দে	রামপাড়া	...	১৫৲
,, মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য		..	১৫৲
,, হরলাল মজুমদার		...	১৫৲
,, শীতলচন্দ্র পাল	নলদা	...	১২।০
,, ভদ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়		...	১২৲
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র মাঃ	জগরামপুর	...	১০৸/০
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত	ভবানীপুর	...	১০৲
			১৫১৫৸/০

জের—			১৫১৫৸৴০
শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র পাল	শাঁখরাইল	...	১০৲
,, অবনিনাথ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	...	১০৲
,, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	হাওড়া	...	১০৲
,, চারুচন্দ্র পাল	রাজগঞ্জ	...	১০৲
,, তিনকড়ি ঘোষ	বল্লভবাটী	...	১০৲
,, নবগোপাল বসু		...	১০৲
,, প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়	শিবপুর	...	১০৲
,, বনবিহারী কুণ্ড চৌধুরী	মহিয়াড়ী	...	১০৲
,, বসন্তকুমার বেরা	যমুনাবেলিয়া	...	১০৲
,, বিজনবিহারী কুণ্ড চৌধুরী	মহিয়াড়ী	...	১০৲
,, বিনোদবিহারী হালদার	শিবপুর	..	১০৲
,, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়		...	১০৲
কুমার ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	...	১০৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		...	১০৲
,, জানকীনাথ ঘোষ	পূরাশ	...	৮॥০
,, পান্নালাল মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	...	৮৲
,, সুকুমার ভট্টাচার্য্য		...	৮৲
,, অক্ষয়কুমার পাল	রামপাড়া	...	৭৲
,, ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়		...	৭৲
,, নগেন্দ্রনাথ পাচাল	মলদা	...	৬॥০
,, রজনীকান্ত মল্লিক	নাইকুলি	...	৬॥০
,, সুবলচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	...	৬৲
,, ডাঃ অখিলচন্দ্র দত্ত	মুন্সীরহাট	...	৫৲
,, অচ্যুতানন্দ মিশ্র	কটক	...	৫৲
,, অতুলচন্দ্র নস্কর	বামুপুর	...	৫৲
,, অনাথনাথ মিত্র	হাওড়া	...	৫৲
			১৭৩৩৴০

জের—				১৭৩৩।৶৹
শ্রীযুক্ত	অনাথমোহন ঘোষ			৫৲
,,	অনাদিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	...	৫৲
,,	অনিলকুমার সরকার	শিবপুর	...	৫৲
,,	অনিলকৃষ্ণ রায়	শিবপুর	...	৫৲
,,	অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়			৫৲
,,	রায় সাহেব অনুকুলচন্দ্র চন্দ্র	শিবপুর	...	৫৲
,,	অনুকুলচন্দ্র মান্না	নিজবেলিয়া	...	৫৲
,,	অমরেন্দ্রনাথ রায়	আমতা	...	৫৲
,,	অমৃতলাল বিদ্যারত্ন	শান্তিপুর	...	৫৲
,,	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়		...	৫৲
,,	আবদুল রউফ	বাঁকড়া	...	৫৲
মিঃ	এস্, ডি, মুখার্জ্জি	কলিকাতা	..	৫৲
শ্রীযুক্ত	কমলকৃষ্ণ মণ্ডল	ঐ	...	৫৲
,,	কমলসিং দুধোরিয়া	ঐ	...	৫৲
,,	কাৰ্ত্তিকচন্দ্র বিশ্বাস	হাওড়া	...	৫৲
,,	কানাইলাল মান্না	নিজবেলিয়া	...	৫৲
,,	কানাইলাল মুন্সী		...	৫৲
,,	কালিপদ কোলে	কুরীট	...	৫৲
,,	কালিপদ খাঁ		...	৫৲
,,	কিরণচন্দ্র দত্ত	কলিকাতা	...	৫৲
,,	কিরণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	...	৫৲
,,	ডাঃ গোপীকৃষ্ণ মণ্ডল	ঝিখিরা	...	৫৲
,,	গোপীধন মান্না	নিজবেলিয়া	...	৫৲
,,	গোবৰ্দ্ধন চক্রবর্ত্তী	নলদা	...	৫৲
,,	গৌরমোহন পাইন		...	৫৲
,,	চন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী	নস্করপুর	...	৫৲
				১৮৬৩।৶৹

জের—			১৮৬৩।৵০
শ্রীযুক্ত ডাঃ চুনীলাল কর	সাদতপুর	...	৫৲
,, ডাঃ চুনীলাল বসু	কলিকাতা	...	৫৲
,, তারাপদ চট্টোপাধ্যায়	রামকৃষ্ণপুর	...	৫৲
,, তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়	নিজবেলিয়া	...	৫৲
,, ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ	ঝোড়হাট	...	৫৲
,, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	নলদা	...	৫৲
,, তিনকড়ি সরকার	পানপুর	...	৫৲
,, ত্রিপুরাচরণ রায়	শালকিয়া	...	৫৲
,, দামোদর ঘোষাল		...	৫৲
,, দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়		...	৫৲
,, দ্বিজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	শালকিয়া	...	৫৲
,, দীনবন্ধু সরকার	হাওড়া	...	৫৲
,, দুর্গাদাস লাহিড়ী	হাওড়া	...	৫৲
,, দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়		..	৫৲
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু	আমতা	...	৫৲
,, দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল	রাজগঞ্জ	...	৫৲
,, ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	সন্তোষবাটী	...	৫৲
,, ধীরেন্দ্রনাথ পাল	কলিকাতা	...	৫৲
,, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়	ঝাঁ্যাটরা	...	৫৲
,, ননীলাল ঘোষ	হরিরামপুর	..	৫৲
,, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়	বালি	...	৫৲
,, নলিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়	ভবানীপুর	...	৫৲
,, নগেন্দ্রনাথ শাঁপুই	কলিকাতা	...	৫৲
,, নারায়ণচন্দ্র মজুমদার		...	৫৲
,, নীরাপদ চট্টোপাধ্যায়	নলদা	...	৫৲
,, নীরাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়		...	৫৲
			১৯৯৩।৵

জের— ১৯৯৩।৶০

যুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী	নরেন্দ্রপুর	...	৫৲
,, পঞ্চানন দত্ত	মুগকল্যাণ	...	৫৲
,, পান্নালাল মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	...	৫৲
,, পান্নালাল সিংহ	রামকৃষ্ণপুর	...	৫৲
,, প্রাণধন ঘোষাল		...	৫৲
,, প্রবোধনাথ মুখোপাধ্যায়	শিবপুর	...	৫৲
,, প্রফুল্লকুমার ঘোষ		...	৫৲
,, ফণিভূষণ দত্ত	ব্রাহ্মণপাড়া	...	৫৲
,, ফণীন্দ্রনাথ পাল	কলিকাতা	...	৫৲
,, ফণীন্দ্রনাথ বসু	রামকৃষ্ণপুর	...	৫৲
,, বটকৃষ্ণ ঘোষ	কলিকাতা	...	৫৲
,, বলাইচন্দ্র শেঠ	রামচন্দ্রপুর	...	৫৲
,, বলাইলাল মুন্সী		...	৫৲
,, বসন্তকুমার চৌধুরী	কলিকাতা	...	৫৲
,, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		...	৫৲
,, বাহাদুর সিং শেঠিয়া	কলিকাতা	...	৫৲
,, বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	শিবপুর	...	৫৲
,, বিধুভূষণ রায়	পেঁড়ো	...	৫৲
,, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য	আন্দুল	...	৫৲
,, বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		...	৫৲
,, ব্রহ্মগোপাল দত্ত	কলিকাতা	...	৫৲
,, বিহারীলাল দলুই		...	৫৲
,, ডাঃ বুধেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায়	ঝোড়হাট	...	৫৲
,, বেণীচরণ দত্ত	শিবপুর	...	৫৲
,, ভুবনমোহন সোম	শিবপুর	...	৫৲
,, ভোলানাথ দত্ত	আমতা	...	৫৲

২১২৩।৶০

জের—			২১২৩।৶৹
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দে	যাদববাটী	...	৫৲
,, মনোজমোহন সোম	শিবপুর	...	৫৲
,, মনোহর চক্রবর্ত্তী	ব্যাঁটরা	...	৫৲
,, মন্মথনাথ মান্না	জুজারসাহা	...	৫৲
,, মানবেন্দ্র মোহন কুণ্ড চৌধুরী	মহিয়াড়ী	...	৫৲
,, ডাঃ যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী	হাওড়া	...	৫৲
,, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ	ব্যাঁটরা	...	৫৲
,, যামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী		...	৫৲
,, ডাঃ যামিনীজীবন বসু	শাঁখরাইল	...	৫৲
,, যোগেন্দ্রনাথ দাস	সোমেশ্বর	...	৫৲
,, যশোদানন্দন মুখোপাধ্যায়		...	৫৲
,, রণধীর চট্টোপাধ্যায়		...	৫৲
,, রামকালী মাইতি		...	৫৲
,, রামদাস মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	...	৫৲
,, রাজেন্দ্রনাথ দে		...	৫৲
,, ললিতমোহন দত্ত	কলিকাতা	...	৫৲
,, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবপুর	...	৫৲
,, লালবিহারী দাস	হাওড়া	...	৫৲
,, শনৎকুমার দত্ত	হরিশদাদপুর	...	৫৲
,, শরৎচন্দ্র আচার্য্য	ঘোষালবাটী	...	৫৲
,, শরৎচন্দ্র রায়	কলিকাতা	...	৫৲
,, শরদিন্দু গঙ্গোপাধ্যায়	হাওড়া	...	৫৲
,, শশাঙ্কশেখর মজুমদার	পাতিহাল	...	৫৲
,, শশিভূষণ দত্ত	পাতিহাল	...	৫৲
,, শ্যামাদাস রায়চৌধুরী	ব্যাঁটরা	...	৫৲
,, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	...	৫৲
			২২৫৩।৶৹

জের—			২২৫৩।৵০
শ্রীযুক্ত সত্যসাধন দাস		...	৫৲
,, সন্তোষকুমার বসু	খড়িয়প	...	৫৲
,, সাধুচরণ দে	সাকরাহাটি	...	৫৲
,, সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	ইলাহিপুর	...	৫৲
,, ডাঃ সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়	মাকড়দহ	...	৫৲
,, ডাঃ সুধীরকুমার সরকার	ব্রাহ্মণপাড়া	...	৫৲
,, সুধাকর ভট্টাচার্য্য		...	৫৲
,, হেমচন্দ্র দত্ত		...	৫৲
শ্রীযুক্তা হেমনলিনী সরকার	বাসুপুর	...	৫৲
সম্পাদক—সাধনা লাইব্রেরী	সোমেশ্বর	...	৫৲
সম্পাদক—মাজু পাবলিক লাইব্রেরী		...	৫।১০
			২৩০৮॥৵১০

প্রতিনিধিগণ

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দাস	বাটান	...	২৲
,, অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		...	২৲
,, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রজনীকান্ত লাইব্রেরী		২৲
,, অশ্বিনীকুমার মণ্ডল	হাওড়া	...	২৲
,, অমূল্যকৃষ্ণ বসু		...	২৲
,, আশুতোষ চৌধুরী	চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষৎ		২৲
,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ		২৲
সম্পাদক—ইউনাইটেড্ লাইব্রেরী	কলিকাতা	...	২৲
শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন	শান্তিপুর	...	২৲
,, উপেন্দ্র নাথ করাতি	জগাছা	...	২৲
মেসার্স এন, এল্, রায় এণ্ড কোং		...	২৲

২২৲

নাম	স্থান	
জের—		২২৲
মিঃ এস্‌, বি, বিশ্বাস	বালিগঞ্জ ...	
শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষ	...	২৲
,, কানাইলাল শি	শিবপুর ...	২৲
,, কিরণশঙ্কর সিংহ	ভাস্তাড়া ...	২৲
,, কুঞ্জবিহারী ঘোষাল	...	২৲
,, কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়	রূপপুর ...	২৲
,, গণেশচন্দ্র মজুমদার	আমতা ...	২৲
,, গোপাল চন্দ্র ঘোষ	ভবানীপুর সাহিত্য সম্মিলন	২৲
,, গৌরীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৲
,, চণ্ডীচরণ মিত্র	প্যারিমোহন লাইব্রেরী	২৲
,, চারুচন্দ্র মিত্র	কলিকাতা ...	·
,, রায় জলধর সেন বাহাদুর	নদীয়া ...	:
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাঁ	...	·
,, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	...	২৲
মিঃ জে, বি, চাটার্জ্জি	সম্পাদক, বন্দীপুর পাঠাগার	২৲
শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	ভবানীপুর সাহিত্য সম্মিলন	:
,, ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন	কলিকাতা ...	২৲
,, দীনেশরঞ্জন সেন	কলিকাতা ...	২৲
,, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	রজনীকান্ত লাইব্রেরী	২৲
,, নগেন্দ্রনাথ কড়ুরি	কলিকাতা ...	২৲
,, নগেন্দ্রনাথ সোম	,, ...	২৲
,, নরেন্দ্র দেব	,, ...	২৲
,, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা	কলিকাতা ...	২৲
,, ননীগোপাল ঘোষ	,, ...	২৲
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	বেলেঘাটা লাইব্রেরী	২৲
,, নিবারণচন্দ্র রায়	কলিকাতা ...	২৲
		৭৪৲

জের :— ৭৪৲

শ্রীযুক্ত নীলরতন চৌধুরী	শিবপুর	...	২৲
,, নীহারকুমার পাল চে	বঁ্যাটরা	...	২৲
,, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ	শিবপুর	...	২৲
,, পঞ্চানন নিয়োগী	কলিকাতা	...	২৲
,, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	হুগলী	...	২৲
,, প্রণয়চন্দ্র সেন	কলিকাতা	...	২৲
,, প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী	বরাহনগর	...	২৲
,, প্রভাকর মুখোপাধ্যায়	শিবপুর	...	২৲
,, প্রভাতচন্দ্র সেন	বগুড়া	...	২৲
,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	...	২৲
,, ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		...	২৲
,, ডাঃ বটকৃষ্ণ শূর	হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার		২৲
,, বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ		২৲
,, বঙ্কিমচন্দ্র দাস	কলিকাতা ইউনিভারসিটি		২৲
,, বঙ্কিমচন্দ্র মণ্ডল	সরস্বতী ইনস্‌টিটিউট্		২৲
,, বামনপদ রক্ষিত	কলিকাতা	...	২৲
,, বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়	গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ		২৲
,, বিশ্বপতি চৌধুরী	কলিকাতা	...	২৲
,, ব্রজমোহন দাস	গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ		২৲
,, ডাঃ বিভূতিভূষণ সামন্ত	বঁ্যাটরা	...	২৲
,, ভূপতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	রজনীকান্তলাইব্রেরী		২৲
,, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	...	২৲
কুমার মণিন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয়	বাঁশবেড়িয়া, হুগলী ...		২৲
যুক্ত মণিমোহন বসু	রজনীকান্ত লাইব্রেরী		২৲
মনীষিনাথ বসু	মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষৎ		২৲
মাখনলাল ঘোষ			

১২৬৲

জের—			১২৬৲
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার লাহা		...	২৲
,, যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	রজনীকান্ত লাইব্রেরী	...	২৲
,, যতীন্দ্রনাথ বসু	কলিকাতা	...	২৲
,, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ	হাওড়া	...	২৲
,, রাধানাথ ধামালী		...	২৲
শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত	কলিকাতা	...	২৲
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	কান্দী	...	২৲
,, রামচন্দ্র দত্ত		...	২৲
,, রামলাল বর্ম্মণ	হাওড়া	...	২৲
,, রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন...		২৲
,, ললিতমোহন দাস	গোবর্দ্ধন সঙ্গীত-সমাজ...		২৲
,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া সারস্বত -সম্মিলন		২৲
,, ললিতমোহন সেনগুপ্ত	গোবর্দ্ধন সঙ্গীত-সমাজ...		২৲
,, শরৎচন্দ্র ঘোষ	দৌলতপুর	...	২৲
,, শরৎচন্দ্র রায়	শিবপুর	...	২৲
,, শশিভূষণ বিশ্বাস		...	২৲
,, শিশিরকুমার মিত্র	কলিকাতা ইউনিভারসিটি		২৲
,, শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়	হাওড়া	...	২৲
,, শীতলপ্রসাদ ঘোষ	শিবপুর	...	২৲
,, শীতলচন্দ্র বসু	বাজে শিবপুর	...	২৲
,, শৈলশেখর আইচ	শিবপুর	...	২৲
,, শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়		...	২৲
,, ষষ্ঠীচরণ গুপ্ত	রজনীকান্ত লাইব্রেরী		২৲
,, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী		...	২৲
,, সতীশচন্দ্র মিত্র	খুলনা	...	২৲
,, সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়		...	২৲
			১৭৮৲

জের—			১৭৮৲
শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ দাস	ঝোড়হাট	...	২৲
,, সত্যেন্দ্রনাথ নিয়োগী		...	২৲
,, সন্ন্যাসিচরণ চন্দ্র	বসিরহাট	...	২৲
,, সাতকড়ি সিংহ	সরস্বতী-ইন্‌সটিটিউট্		২৲
,, সুকুমাররঞ্জন দাস	ঢাকা	...	২৲
,, সুরেন্দ্রনাথ রায়	কলিকাতা	...	২৲
,, সুরেন্দ্রনাথ সাধুখাঁ		...	২৲
,, সুরেশচন্দ্র বসু	শিবপুর	...	২৲
,, সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়		...	২৲
,, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		...	২৲
,, সূর্য্যকুমার পাল	রমাপ্রসাদ লাইব্রেরী	...	২৲
,, হরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া সাহিত্য-সম্মিলন		২৲
,, হরনাথ ঘোষ	বসুমতী সাহিত্য-মন্দির	...	২৲
,, হারাধন টাট		...	২৲
,, হেমচন্দ্র ঘোষ		...	২৲
,, হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত		...	২৲
,, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলন		২৲
,, ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়	শিবপুর	...	২৲
			২১৪৲

সাহায্যকারিগণ

,, অমলাকান্ত গুপ্ত	রামপুর	...	১৲
,, অন্নদাপ্রসাদ খাঁড়া	মুন্সীরহাট	...	১৲
,, অনন্তরাম মোদক	ঐ	...	১৲
,, অমরেন্দ্রনাথ দে	কলিকাতা	...	১৲
			৪৲

জের—			৪৲
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		...	১৲
,, অক্ষয়কুমার বসু		...	১৲
,, অক্ষয়কুমার সরকার	শিবপুর	...	১৲
,, অনাদিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পাতিহাল	...	১৲
,, অম্বিকাচরণ বসু মজুমদার	মৃজাপুর	...	১৲
,, অনিলচন্দ্র দে	কলিকাতা	...	১৲
,, অখিলচন্দ্র শেঠ	ঐ	...	১৲
,, অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবপুর	...	১৲
,, অনাদিনাথ মান্না	পাতিহাল স্কুল	...	৷৷০
,, অরুণচন্দ্র রায়	শিবপুর	...	১৲
,, অনুকূলচন্দ্র সাহা	পাতিহাল	...	১৲
,, আবদুল মন্তাকিন	পাতিহাল স্কুল	...	৷৷০
,, অমূল্যধন ঘোষ	হাওড়া	...	১৲
,, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়		...	৩৲
,, আশুতোষ দত্ত	হাওড়া	...	১৲
,, আশুতোষ দোয়ারী		...	১৲
,, আশুতোষ মজুমদার	রামকৃষ্ণপুর	...	১৲
,, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ইস্‌লামপুর	...	১৲
,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ	খসা	...	১৲
,, উপেন্দ্রনাথ রায়	ঘোষালবাটী	...	১৲
,, উপেন্দ্রনাথ মাইতি	আমতা	...	১৲
,, উপেন্দ্রনাথ হালদার	পাতিহাল স্কুল	...	৷৷০
,, উমেশচন্দ্র মণ্ডল		...	১৲
মিঃ এন্, মেথুস্	কলিকাতা	...	১৲
মিঃ এল্, এম, দে		...	১৲
শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ ঘোষ	নিজবেলিয়া	...	১৲
			৩০৷৷০

জের— ৩০॥০

শ্রীযুক্ত করুণাময় ভট্টাচার্য্য	মক্তিয়াড়ী	...	১৲
,, কানাইলাল ঘোষ		...	১৲
,, কান্তিকচন্দ্র বসু	শিবপুর	...	১৲
,, কার্ত্তিকচন্দ্র সামন্ত	ফুটিকগাছি	...	১৲
,, কানাইলাল চক্রবর্ত্তী	আমতা	...	১৲
,, কালিদাস মুখোপাধ্যায়		...	১৲
,, কৃপানাথ সাহা		...	১৲
,, কৃষ্ণচন্দ্র লাহা	বাঁাটবা	...	৩৲
,, কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী	ঘোষালবাটী	...	১৲
,, গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী	খড়িয়প	...	১৲
,, গজেন্দ্রনাথ ঘোষ	শিবপুর	...	১৲
,, গিরিজাভূষণ বিশ্বাস	ইস্‌লামপুর	...	১৲
,, গিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	আকনা	...	১৲
,, গোবর্দ্ধন চট্টোপাধ্যায়	মুন্সীরহাট	...	১৲
,, গোবর্দ্ধন মান্না	ফুটিকগাছি	...	১৲
,, গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী	আন্দুল	...	১৲
,, গোষ্ঠবিহারী পাল	মুন্সীরহাট	...	১৲
,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		...	১৲
,, চারুকুমার বর্ম্মণ	ঝিখিরা	...	১৲
,, জয়কালী বন্দোপাধ্যায়		...	১৲
মিঃ জি, বসু		...	১৲
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন দত্ত	শিবপুর	...	১৲
,, জিতেন্দ্রলাল বাকুলী	কোতলপুর	...	১৲
,, জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	রূপপুর	...	১৲
,, তারকদাস চট্টোপাধ্যায়	শিবপুর	...	১৲
,, তারকনাথ নাগ	গোবরডাঙ্গা	...	১৲

৫৮॥০

জের—			৫৮॥০
শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ	বল্লভবাটী	...	৩৲
,, তারাপদ ঘোষাল	ঝিখিরা	...	১৲
,, তারাপদ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	...	১৲
,, তিনকড়ি কাব্যতীর্থ		...	১৲
,, তিনকড়ি শিট	পুরাশ	...	২।০
,, তীর্থপদ নন্দী	পাতিহাল স্কুল	...	॥০
,, ত্রৈলোক্যনাথ জানা	আমতা	...	১৲
,, তোষিণী ঘোষাল	পাতিহাল স্কুল	...	॥০
,, দক্ষিণারঞ্জন সেন	শিবপুর	...	১৲
,, দাশরথি চক্রবর্ত্তী		...	১৲
,, দাশরথি চট্টোপাধ্যায়	মুন্সীরহাট	...	১৲
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শিবপুর	...	১৲
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	ঐ	...	১৲
,, দীননাথ বেরা	যমুনাবেলিয়া	...	২॥০
,, দুর্গাপদ পাল	মুন্সীরহাট	...	১৲
,, দুলালচন্দ্র সাহা		...	১৲
,, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		...	১৲
,, দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী		...	১৲
,, ধরণীধর জানা	ফুটিকগাছি	...	১৲
,, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়		...	১৲
,, ধীরেন্দ্রনাথ দে		...	১৲
,, ডাঃ নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	রূপপুর	...	১৲
,, নগেন্দ্রনাথ কুঁকুড়ী	বাঁকুল	..	৩৲
,, নরেন্দ্রনাথ দাস	শিবপুর	...	১৲
,, নরেন্দ্র নাথ দে		...	১৲
,, নিত্যানন্দ চিনে	যমুনাবেলিয়া	...	১৲
			৯০।০

জের —			৯০।০
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু রায়	গঙ্গাধরপুর	...	১৲
,, নিরোদকুমার মিত্র	নাইকুলি	...	১৲
,, নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		...	১৲
,, নীলমণি সামন্ত	কলিকাতা	...	১৲
,, নীলমাধব দে		...	১৲
মৌলভী নুরআলি	বাণীবন	...	১৲
শ্রীযুক্ত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়	বল্লভবাটী	...	১৲
,, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়	হাওড়া	...	১৲
,, পশুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	শিবপুর	...	১৲
,, প্রমথনাথ দত্ত	হরিশদাদপুর	...	১৲
,, প্রভাতচন্দ্র দে	কলিকাতা	...	১৲
,, প্রসাদচন্দ্র মেটে	মল্লিকপুর	...	১৲
মিঃ পি, বসু	হাওড়া	...	১৲
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়	মহিয়াড়ী	...	১৲
,, পীযুশকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবপুর	...	১৲
,, প্রিয়রঞ্জন সেন	উত্তরপাড়া	...	১৲
,, পুলীনচন্দ্র দে	কলিকাতা	...	১৲
,, পূর্ণচন্দ্র সাসমল	গোবিন্দপুর	...	১৲
,, বলাইকৃষ্ণ মজুমদার		...	৩৲
,, বসন্তকুমার সামন্ত	হাওড়া	...	১৲
মেসার্স বসু, মিত্র এণ্ড কোং		...	১৲
শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী রায়	পেঁড়ো	...	১৲
,, বাদলচন্দ্র সাউ	আমতা	...	১৲
,, বামাপদ সরকার	কলিকাতা	...	১৲
,, বিজয়কৃষ্ণ কর্ম্মকার	পারগুন্তে	...	১৲
,, বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডল	পাইকপাড়া	...	১৲
			১১৮।০

জের—				১১৮।০
শ্রীযুক্ত	বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায়	শিবপুর	...	১৲
,,	বিমলকুমার দত্ত	হাওড়া	...	১৲
,,	বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ		...	১৲
,,	বিষ্ণুপদ দাস		...	১৲
,,	বিষ্ণুপদ দাস	গোবিন্দপুর	...	১৲
,,	বিষ্ণুপদ দে	মুন্সীরহাট	...	১৲
,,	বিষ্ণুধন গঙ্গোপাধ্যায়	বালি	...	১৲
,,	বিষ্ণুপদ বেরা	পাতিহাল স্কুল	...	॥০
,,	বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়	শিবপুর	...	১৲
,,	বিভূতিভূষণ দাস	বাণীবন	...	১৲
,,	বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	পাতিহাল স্কুল	...	॥০
,,	বিনোদবিহারী ঘোষ	কোটালঘাটা	...	১৲
,,	বেণীমাধব পাল	কোটরা	...	১৲
,,	ব্রজদুলাল রায়	আমতা	...	১৲
,,	ভরতনাথ চট্টোপাধ্যায়		...	১৲
,,	ভূপালচন্দ্র কুণ্ডু		...	১৲
,,	মনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	...	১৲
,,	মন্মথনাথ চৌধুরী	শিবপুর	...	১৲
,,	মন্মথনাথ মজুমদার	কসবা	...	১৲
,,	মতিলাল বিশ্বাস	নলদা	...	১৲
,,	মণিলাল কর	পাতিহাল স্কুল	...	॥০
,,	মহাদেব চক্রবর্ত্তী	গোবিন্দপুর	...	১৲
,,	মণিলাল বেরা	পাতিহাল স্কুল	...	॥০
,,	মধুসূদন ভট্টাচার্য্য	দৌলতপুর	...	১৲
,,	মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	ভবানীপুর	...	১৲
,,	মানিকলাল কোলে	মুন্সীরহাট	...	১৲

১৪২।০

			১৪২৷০
জের—			
শ্রীযুক্ত মানিকলাল সামন্ত	ফুটিকগাছি	...	১৲
,, মুকুলরঞ্জন ঘোষাল	ঝিখিরা	...	১৲
,, মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	কলিকাতা	...	১৲
,, মৃগেন্দ্রনাথ ভট্ট	মুন্সীরহাট	...	১৲
,, যতীন্দ্রনাথ আশ	মুন্সীরহাট	...	১৲
,, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ	হাওড়া কোর্ট	...	১৲
,, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ	সাঁতরাগাছি	...	১৲
,, যতীন্দ্রনাথ পাল	কলিকাতা	...	১৲
,, যতীন্দ্রনাথ বসু	কৃষ্ণানন্দপুর	...	১৲
,, যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল	মুন্সীরহাট	...	১৲
,, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ব্যাঁটরা	...	১৲
,, যতীন্দ্রনাথ ভৌমিক	বীরশিবপুর	...	১৲
,, যতীন্দ্রনাথ সরকার		...	১৲
,, যুধিষ্ঠির গোলুই	পাতিহাল স্কুল	...	৷৷০
,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	মাজুক্ষেত্র	...	১৲
,, যোগেন্দ্রকুমার বসু		...	১৲
মৌলভী রমজান খাঁ		...	১৲
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মিত্র		...	১৲
,, রমণীমোহন ঘোষাল	পাতিহাল	...	১৲
,, রসময় ভট্টাচার্য্য	মজিলপুর	...	১৲
,, রাখালচন্দ্র রায়	খাড়োর	...	১৲
,, রাখাল চন্দ্র সামন্ত	সিদ্ধেশ্বর	...	১৲
,, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	শিবপুর	...	১৲
,, রামবিহারী মুখোপাধ্যায়	শিবপুর	...	১৲
,, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	মাকালহাটি	...	১৲
,, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	দেউলপুর	...	১৲
			১৬৭৷৴০

জের—			১৬৭৸৹
শ্রীযুক্ত শশধর কুণ্ডু		...	১৲
,, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ	কলিকাতা	...	১৲
,, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	...	১৲
,, শিবদাস মুখোপাধ্যায়	হাওড়া	...	১৲
,, শিবরাম রায়		...	১৲
,, শিশিরকুমার সেন	শিবপুর	...	১৲
,, শ্রীনাথ বেরা	যমুনাবেলিয়া	...	২৸৹
,, শেখরচন্দ্র মণ্ডল	গোবিন্দপুর	...	১৲
,, শৈলেন্দ্রনাথ দেব	মজিলপুর	...	১৲
,, শৈলেন্দ্রনাথ পালিত	পাতিহাল স্কুল	...	॥৹
শৈলেশ্বর লাইব্রেরী—সম্পাদক		...	১৲
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কোলে	শিয়ালডিঙ্গি	...	১৲
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ	জনাই	...	১৲
,, সতীশ চন্দ্র বসু	হাওড়া	..	১৲
,, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রূপপুর	...	১৲
,, সতীশচন্দ্র মণ্ডল	গোবিন্দপুর	...	১৲
,, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	আমতা	...	১৲
,, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বাগনান	...	১৲
,, সমীরকুমার পাল	রাজগঞ্জ	...	১৲
,, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত		...	১৲
,, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র		...	১৲
,, সহদেব মাল	সোমেশ্বর	...	১৲
,, সুদর্শন মান্না	মাড়ঘুরালি	...	১৲
,, সুরেন্দ্রনাথ পাচাল	নলদা	...	১৲
,, সুরেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার	মুন্সীরহাট	...	১৲
,, সুরেন্দ্রনাথ হাজরা	গোবিন্দপুর	...	১৲
			১৯৫৲

জের—			১৯৫৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবপুর	...	১৲
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	...	৪৲
,, সুবোধচন্দ্র ঘোষ	পাতিহাল	...	১৲
,, হরিধন মুখোপাধ্যায়	ভাটপাড়া	...	১৲
,, হরিপদ ঘোষ		...	৩৲
,, ডাঃ হরিপদ কুশারী	মন্দীরহাট	...	১৲
,, হরিপ্রসাদ মজুমদার		...	১৲
,, হরিদাস চক্রবর্ত্তী	গোবিন্দপুর	...	১৲
,, হরিগোপাল সেন	কলিকাতা	...	১৲
,, হরিসাধন বসু	রামকৃষ্ণপুর	...	১৲
,, ডাঃ হরেন্দ্রনাথ সামন্ত	হাওড়া	...	১৲
,, হরেন্দ্রলাল সরকার	বর্দ্ধমান	...	১৲
,, হৃষিকেশ চক্রবর্ত্তী	হাওড়া	...	১৲
,, হেমচন্দ্র জানা	শশাটি	...	১৲
,, হেমেন্দ্রকুমার ঘোষ	কলিকাতা	...	১৲
,, ক্ষিতীশচন্দ্র আঢ্য	হাওড়া	...	১৲
,, ক্ষিতীশচন্দ্র সানাপতি	কলিকাতা	...	১৲
,, ক্ষেত্রমোহন চৌধুরী		...	১৲
			২১৮৲

স্মি . লনের আয়-ব্যয় বিবরণ

জমা—

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের নিকট প্রাপ্ত	...	২৩০৮৷৶১০
প্রতিনিধিগণের নিকট প্রাপ্ত	...	২১৪৲
সাহায্যকারিগণের নিকট প্রাপ্ত	...	২১৮৲
দর্শকগণের নিকট প্রাপ্ত	...	৭৬৷০
স্মিলনের উদ্বৃত্ত সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত	...	৮০/১০
		২,৮৯৭৷০

খরচ—

ডাকটিকিট, টেলিগ্রাম, মণিঅর্ডার ফিঃ ইত্যাদি বাবদ			৬৬৷৴১০
ট্রেণ, ট্রাম, গাড়ী, বাস, ট্যাক্সি ও পাল্কিভাড়া ইত্যাদি			২৯৮৵১০
মণ্ডপ নির্ম্মাণ ইত্যাদি	...	...	৩৬০৲
মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী ইঃ	...	...	৩৩৪৴০
কর্ম্মচারিগণের বেতন	...	...	১৬৲
প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের আহার্য্য ইত্যাদি		...	১,১১৭৷৵৫
আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি	...	...	৬৮৷০
সম্মিলনের অন্যান্য খরচ	...	...	৩২৮৷৶৫
বাজে খরচ	...	...	১৷৴০
			২,৫৯১৷১০
উদ্বৃত্ত	...	...	৩০৫৷৴১০
			২,৮৯৭৷০

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মজুমদার
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীমোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য—সম্পাদক।
শ্রীহরলাল মজুমদার—সহযোগী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—মাজু

শ্রীহরলাল মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক

পরিশিষ্ট

বাণী-বন্দনা।

খুলেছে আজিকে মন্দির দ্বার,
জ্বলেছে দীপ্ত জ্ঞানের বাতি ;
কে আছ ভকত, বাণীর সেবক,
পূজা উপচার আন শীঘ্রগতি ।
পূর্ণ কর গো মঙ্গল ঘট,
আম্র-মুকুলে সাজাও তোরণ ;
বাজাও শঙ্খ কাংস ঘণ্টা,
অর্ঘ্য রচিয়া কর গো বরণ।
শ্বেত শতদল অঞ্জলি পূরি
দাও গো মাতার রাতুল চরণে ;
আকাশ প্লাবিয়া ছুটুক মহিমা,
ভরি দশ দিশি ছন্দে-গানে।

শ্রীদেবশঙ্কর দত্ত

মাজু-সাহিত্যসম্মিলনস্য

মঙ্গলাচরণম্।

ভো ভো মহাত্মানঃ—

মাজুগ্রামে সমিতিসদনং সঙ্গতাঃ সভ্যসঙ্ঘাঃ
বাণীবাণীরসিকবিবুধা ধূতপাপা বরেণ্যাঃ।
সান্দ্রানন্দস্ফুরিতনয়নাঃ স্মেরবক্ত্রা উদারাঃ
পাদন্যাসৈর্ভবতু ভবতাং শুদ্ধমন্তর্বহির্নঃ॥

অত্রৈব সন্তঃ সুখশান্তিসঙ্কুলং
কুলং সমাগত্য নিরাকুলাত্মনঃ
গৃহ্ণন্তু পূজাং বহুকষ্টসঞ্চিতাং
সুখাসনং সাধু সুখং সমাসতাম্

আসীদস্মিন্ বঙ্গকুলমণির্যস্য বিদ্যালয়োঽসৌ
সৌধং ধাম প্রথিতমধুনা ভাতি ভাস্বৎ বিশালং ।
প্রাচ্যাং কাণাসরিদুপগতা ক্ষীণতোয়া ত্বিদানীম্
নীরং তস্যা ভবতু ভবতাং পাদ্যভূতং পবিত্রম্ ॥

গীর্ব্বাণবাণীরচিতানি কানিচিৎ
পদানি বো গৌরব-কীর্ত্তিনেষলম্ ।
অস্মাকমেকীকৃতচিত্তমাদরাৎ
উপায়নীভূতমতো বিভূতয়ে ॥

পোগণ্ডানাং পঠিতুমনসামস্তি বিদ্যালয়োঽন্যঃ
তৎপার্শ্বে বৈ বিলসতিতরাং বালিকাপাঠশালা ।
গ্রন্থাগারো বহুগুণবতাং জ্ঞানরাশির্ব্বিভাতি
পত্রাগারো জনগণহিতং সংদধন্নিষ্টমাস্তে ॥

সরোজসন্না শরদিন্দুশোভনা
তন্ত্রীস্বনোদ্ভাসিতদিগ্‌দিগন্তরা ।
রাজীবহস্তাশ্রিতপুস্তলেখনী
সরস্বতী শর্ম্ম দদাতু বঃ সদা ॥

অত্রৈবাসীৎ জনগণহিতা সঙ্ঘবদ্ধা সভা চ
কংগ্রেসাখ্যা যুবজনহিতা ক্রীড়িতুং মল্লভূমিঃ ।
রম্যা রথ্যা বিপণি-রুচিরা পল্লিভূমির্বিশালা
যৎ যৎ কাম্যং জগতি হি নৃণাং তত্তদত্রৈব ভাতি ॥

সাহিত্যসম্মেলনমস্তু সার্থকং
ঋতং ভবত্বার্য্যমনীষিতঞ্চ যৎ ।
ঋতম্ভরা ধীর্জয়িনী ভবত্বসৌ
শশ্বৎসুখং সং বিদধাতু ভূমিপঃ ।

অতঃপরমত্রভবতাম্

তারল্যং সলিলে যথা সুনিয়তং তদ্বৎ সুখং বর্ত্ততাং
রাকানাথশরীরসঙ্গমধুরা কান্তিশ্চিরং তিষ্ঠতু ।
পদ্মাপাদবিভূষণোত্থমধুরা শিঞ্জা গৃহে নিত্যশঃ
দদ্যাদ্দীনদয়ালুরর্থমতুলং ত্রৈলোক্যনাথো বিভুঃ ॥

শ্রীতারাপদকাব্যতীর্থকবিভূষণস্য

(খ)

স্বাগতশ্লোকাঃ ।

ললিতরসবিশেষাস্বাদসংপৃক্তচিত্তা
ললিতপদকলাপগ্রন্থনাখিন্নধৈর্য্যাঃ ।
ললিতবচনভঙ্গীসঙ্গসম্ফুল্লবক্ত্রা
ললিতসমিতিমেতামেত ভো ধীরবর্য্যাঃ ১ ॥

বিষমবিষয় চিন্তাজীর্ণ-চিত্তঃ সমন্তাদ্
ভবতিবিকলধৈর্য্যঃ কার্য্যপর্য্যাকুলত্বাৎ।
বহুজনগণসঙ্গাদেতি সার্থক্যমাত্মা
সমিতিরচনযত্নস্তেন লোকানুকূলঃ ২ ॥

বিবিধনৃগণসঙ্গী জার্জ্জায়তে যো বিশেষো
ন খলু ননু স লভ্যো লক্ষকৃত্বোঽর্থদানৈঃ।
ইতি ভবতি সভায়াং লাভবান্ সর্ব্ব এব
কইহ ননু বিরক্তঃ স্বেষ্টলাভে মনুষ্যঃ ৩ ॥

মুনিজনসুসমৃদ্ধে পূর্ব্বতোঽপ্যত্র দেশে
বিরচিতবহুগোষ্ঠীবাসবৈশিষ্ট্যবস্তুঃ।
নিখিলজনসমেতা রাজবর্য্যাশ্চ ধৈর্য্যং
যমনিয়মসহায়া লেভিরে লভ্যসারং ৪ ॥

সুরসরিদিব শম্ভুং পদ্মরাজীব সূর্য্যং
তড়িদিব জলবাহং কৌমুদীব ক্ষপেশম্।
পরিষদনিশমেষা সর্ব্বসন্তোষবাসা
বুধগণমনুজীব্যার্জ্জাতরাগা চিরায় ৫ ॥

শ্রীরতিকান্ত ভট্টাচার্য্যস্য

(গ)

আনন্দ-লহরী-ত্রয়ী।

১। পঞ্চবর্ষ অতীত হইল, যে কল্পনা মানস-আকাশে অদৃশ্য বাষ্পাকারে ভে'সে ভে'সে বেড়াইতেছিল, তাহা আজি এই মধুর বসন্তে পূর্ণিমার জ্যোছনারাশির মধ্যে কোন্ দেবতার আশীর্ব্বাদে মূর্ত্ত আনন্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছে?

২। যাহা স্বপ্ন ছিল, তাহা বাস্তবে পরিণত হইল, আরাধ্য দেবতা আজি যেন তপস্থায় তুষ্ট হইয়া ভক্তের সম্মুখে সহসা সহাস্যবদনে প্রকাশিত হইলেন।

৩। আজি যে জগতে উপস্থিত হইলাম, তাহা ধূলার ধরণী নহে, ইহা সোনার কল্পনায় রচিত। এ জগতে মৃত্যু নাই, জীবনের নৃত্য আছে: শোক নাই, আনন্দের ধারা বহিতেছে; ভয় নাই, সর্ব্বত্র অভয় বিরাজিত; বন্ধন নাই, মুক্তির হিল্লোল বহিতেছে; জাতিভেদ নাই, প্রেমের প্রবাহে জাতির বন্ধন, ধর্ম্মের বন্ধন—সমাজের বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। মায়াবাদী শঙ্কর, নির্ব্বাণবাদী বুদ্ধ ও প্রেমভক্তিবাদী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জয় হইল। সাহিত্যের আকাশে নরেশ, দর্শনের গগনে সুরেন্দ্র, বিজ্ঞানে একেন্দ্র ও ইতিহাসে রমেশ—মধ্যস্থলে সুবোধ মহাসূর্য্য—দীনেশ মহাচন্দ্রমাকে আকর্ষণ করিতেছেন। মোহিনীর মোহন মন্ত্রে সমুদয় জগৎ মুগ্ধ! আশ্চর্য্য—সুরেন্দ্র আজি কুবেরের পদে অধিষ্ঠিত! হর আজি সংহার মূর্ত্তি পরিহার করিয়া নূতন জগৎ সৃজন করিলেন, তাহা দেখিয়া রতিকান্ত আজ হর-বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া প্রেমের নিবিড় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন! ধন্য মাজু-গ্রাম—যেখানে প্রেমের জয় হইল!

শ্রীঅমৃতলাল বিদ্যারত্ন।

(ঘ)

উদ্বোধন সঙ্গীত।

জননি বঙ্গভারতি, তোমার কি দিয়ে বল’ মা আরতি করি,
ঘটা সমারোহ জুটেনি মোদের, নহবৎ নেই মঞ্চ’ পরি।
এ দীন দেউলে চারু কারুকলা
সুরভি করেনা রস-ধূপ-শলা,
নাহি বিজ্ঞান হবি-দীপ-মালা, কি দিয়ে এখন তমসা হরি॥

করতাল করে ধরিতে পারি না কণ্ঠে বহে না শঙ্খতান,
ছন্দে বাজেনা কাঁসর ঝাঁঝর, চীর্ণ জীর্ণ তাহার প্রাণ।
মিটি মিটি জ্বলে মাটির প্রদীপ,
ক্ষীণ প্রাণে তা যে করে টিপ টিপ,
দৈন্য বাতাসে করে নিবু-নিবু, বাঁচাই আঁচল আড়ালে ধরি॥

তবু গো জননি, চরণে তোমার এনেছি মোদের যা কিছু পুঁজি,
দ্রোণপুষ্পের অঞ্জলি লও হেম চাঁপা তো পাইনি খুঁজি।
ভৃঙ্গের মত কল গুঞ্জনে,
আরতি তোমার করিব চরণে,
ও পদ কমলে মধুর পরাগে নিছনি লইব পরাণ ভরি॥

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর।

(৬)

সম্বোধন

আজ অতি শুভদিন। আজ দ্বিতীয়বারই হউক, তৃতীয়বারই হউক, বাঙ্গালার একজন প্রধান লেখকের স্মৃতি জাগরিত করিবার জন্য বাঙ্গালার সুদূর পল্লীগ্রামে আপনারা সম্মিলিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার যত নামী লেখক আছেন, সকলেই এখানে আসিয়াছেন, আপনার-আপনার লেখা পড়িয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিবেন বলিয়া আসিয়াছেন—অনেকে শুধু মুগ্ধ হইবার জন্য আসিয়াছেন। সকলেরই মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইতেছে। আশীর্ব্বাদ করি, আপনাদের এই মিলনে আনন্দ ও আহ্লাদ বৃদ্ধি হউক—জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার হউক—আপনাদের আগমন সার্থক হউক।

এইবার আপনাদের আঠার বারের সম্মিলন। বারে আঠার বটে, কিন্তু বছরে অনেক হইয়া গিয়াছে। কেন না, মাঝে সম্মিলন পাঁচ বছর বন্ধ

ছিল। ভবিষ্যতে সম্মিলন যাতে বন্ধ না থাকে, সেজন্য আপনাদের চেষ্টা করিতে হইবে। সম্মিলন একজনেরও কাজ নহে, দু'জনেরও কাজ নহে—সবারই কাজ। সুতরাং কেন বন্ধ থাকিবে? ব্যোমকেশ বাবু যতদিন ছিলেন, বন্ধ হইতে দিতেন না। যেরূপে হউক, লোক জন সংগ্রহ করিয়া এক জায়গায় না এক জায়গায় উপস্থিত হইতেন। ব্যোমকেশ বাবুর উত্তরাধিকারী কি মিলিবে না? পরিচালন-সমিতি খুঁজিয়া একজন উত্তরাধিকারী কি পাইবেন না?

সম্মিলনে নানা দেশ হইতে নানা সাহিত্য-সেবী আসিয়া উপস্থিত হন। সেইটেই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন যেরূপে সম্মিলন হইতেছে, তাতে প্রবন্ধ পড়া ছাড়া মেলামেশাটা বড় হয় না। অনেকে বলিবেন, মেলামেশাটা ভাল নয়, কারণ মেলামেশাটা হইলেই ভ্রাতৃভাব হয়, আর ভ্রাতৃভাব হইলেই ভ্রাতৃবিরোধ হয়। কথাটা সত্য, কিন্তু ভ্রাতৃবিরোধ হইলেও ভ্রাতৃভাবটার একটা উপকার আছে। সেই উপকারটা এত বেশী যে, তার আর পার নাই। এখানে সমাজের বন্ধন নাই, জাতিভেদেরও ততটা টানাটানি নাই—বিবাহাদি যে সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম আছে, তাহাতে যতটা আঁটাআটি আছে, তাহাও নাই। রাজনীতির চর্চ্চা নাই—সুতরাং পুলিশও নাই। ইচ্ছামত খাও, দাও, আমোদ কর, বেড়াও। পল্লীগ্রামের অতিথি-প্রিয় লোক, আতিথ্য করিবার সব সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; মাজু গ্রামের আতিথ্য প্রসিদ্ধ, সে আতিথ্যে আপনারা নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন।

যিনি আপনাদের মূল সভাপতি হইয়াছেন, তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া প্রাচীন বাঙ্গালার চর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনি একজন একনিষ্ঠ সেবক। তাঁহার সম্মিলনে আপনারা অনেক নূতন জিনিষ পাইবেন—যাহাতে আপনাদের কানের ও মনের তৃপ্তি হইবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তাঁহার পরিচালনায় সম্মিলন সকলের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হউক।

একটা কেবল দুঃখের কথা আছে, এমন সম্মিলনে আমি উপস্থিত হইতে পারিলাম না। নয় মাস হইল, আমি এক ঘরে আবদ্ধ আছি, বাহিরে যাওয়া খুবই কঠিন—পা চলে না। তাই আপনাদের সম্মিলনে যাইতে পারিলাম না, কিন্তু মন আমার আপনাদের কাছেই পড়িয়া রহিল। ইতি—

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

(চ)

শুভেচ্ছা

সসম্মান সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৮শ অধিবেশনের আমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্মভূমির নিকট নিভৃত পল্লিগ্রামে আপনারা সম্মিলনের যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গভাষানুরাগী সাহিত্যিক মাত্রেরই যোগদান বাঞ্ছনীয়। প্রায় দ্বাদশ বর্ষ আমি হৃদ্রোগ, স্নায়বিক-দুর্ব্বলতা, শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগে কাতর, গৃহের বাহির হইবার শক্তি নাই। এ কারণ আমার নিতান্ত ইচ্ছা থাকিলেও এই ১৮শ সম্মিলনে যোগদান করিতে না পারিয়া এই পত্রদ্বারা আমার শুভেচ্ছা, সম্মিলনের সাফল্য ও পল্লিবাসী কর্ত্তৃক এই সদনুষ্ঠানের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বা বিভিন্ন জেলার বড় বড় সহর মধ্যে বহু সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সহরের জনকোলাহল মধ্যে আলোচনা বা উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী হইয়াছে। পল্লিগ্রামের পূর্ব্বশ্রী ও পূর্ব্বগৌরব অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পল্লিসমূহে বঙ্গের সামাজিক জীবন আজও স্পন্দিত হইতেছে। সামাজিকতা, জাতীয়তা বা মানবতার উন্মেষ আজও পল্লিগ্রামে লক্ষিত হয়। এ কারণ পল্লিগ্রামের একনিষ্ঠ সাধকগণের উদ্যমে যে সাহিত্য-সম্মিলনের আয়ো-

জন হইয়াছে, তাহা হইতে যে ভাবী সুফল প্রসব করিবে, তাহা কতকটা আশা করিতে পারি।

এই সম্মিলন উপলক্ষে অনেকেই রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের স্মৃতি দর্শনে গমন করিবেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার 'সত্যপীরের কথা' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে আত্মপরিচয়প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতিরায়ের বংশ,
সদাভাবে হতকংস, ভূরস্লুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥"

ভারতচন্দ্রের কথায় বলিতে পারি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ভূরস্লুটের রাজা ছিলেন। এই সম্মিলন স্থান প্রাচীন ভূরস্লুট পরগণার অন্তর্গত। ভূরস্লুট গ্রাম ইহার প্রাচীন কেন্দ্র। এই ভূরস্লুট সম্বন্ধে আমি কিছু জানাইতে ইচ্ছা করি। ভূরস্লুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠীনগরী বাঙ্গালার অতীত গৌরবের একটি উজ্জ্বল কেন্দ্রস্থান। যে সময়ে মিথিলা বা নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার আদৌ সন্ধান পাওয়া যায় না, সেই দূর অতীত যুগে খৃষ্টীয় ১০ম শতকে এখানে ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা প্রচলিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য শ্রীধর ভট্ট তাঁহার 'ন্যায়কন্দলী' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ত্র্যধিকদশোত্তরনবশকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা।
রাজশ্রীপাণ্ডুদাসকায়স্থ যাচিত-ভট্ট শ্রীধরেণেয়ং
সমাপ্তেয়ং পদার্থপ্রবেশন্যায়কন্দলীটীকা।"

ভট্ট শ্রীধরের উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, ভূরিশ্রেষ্ঠীপতি কায়স্থ রাজশ্রী পাণ্ডুদাসের প্রার্থনায় ভট্ট শ্রীধর ৯১৩ শকে (৯৯১ খৃষ্টাব্দে) ন্যায়কন্দলী রচনা করেন। এখন হইতে ৯৩৮ বর্ষ পূর্ব্বে ভূরস্লুটে যে ন্যায়শাস্ত্রানুরাগী কায়স্থ নৃপতি রাজত্ব করিতেন এবং অদ্বিতীয় ন্যায়শাস্ত্রবিদ্ ভট্ট শ্রীধর তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা ন্যায়কন্দলীতে প্রকাশ।

উক্ত সময়ের প্রায় ৫০ বর্ষ পরে চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার সভাসদ অদ্বিতীয় দার্শনিক কবি কৃষ্ণ মিশ্র তাঁহার প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিয়াছেন—

"গৌড়ে রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্টিকনামধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।"

খৃষ্টীয় ১১শ শতকের প্রারম্ভে গৌড়দেশে রাঢ়ের মধ্যে ভূরিশ্রেষ্ঠী একটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। এখানে বহু সংখ্যক ধনকুবের শ্রেষ্ঠীগণের বাস থাকায় এই স্থান 'ভূরিশ্রেষ্ঠীনগরী' নামে খ্যাত হইয়াছিল। এখানকার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

পল্লিবাসী সাহিত্যসেবী ও পুরাতত্ত্বানুরাগীর প্রতি আমার সানুনয় নিবেদন যে, ভূরসুটের গৌরব সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। যেখানে ভট্ট শ্রীধরের অনুরাগী রাজা পাণ্ডুদাস আধিপত্য করিয়া কায়স্থজাতির গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, যেখানে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, সেই স্থানের অতীত কীর্ত্তি উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হউন। উপযুক্ত অনুসন্ধানের ফলে ভূগর্ভ হইতেই হউক বা স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের গৃহে অনাদৃত অবস্থায় রক্ষিত কাগজ হইতে বা প্রবাদমুখে হয়ত সেই সুপ্রাচীন কায়স্থ রাজবংশের এবং তৎপরবর্ত্তী ভরদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণরাজ-বংশের কাহিনী মিলিতে পারিবে এবং আশা করি, তাহা হইতে বাঙ্গালার অতীত গৌরবের লুপ্ত ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় লিখিত হইবে।

অবশেষে নিবেদন, যদিও আমি অধিবেশনে সশরীরে যোগদান করিতে পারিলাম না, কিন্তু আপনারা স্থির জানিবেন, আমার অন্তরাত্মা আপনাদের নিকট উপস্থিত। আপনাদের সুনির্ব্বাচিত সভাপতিগণের সভাপতিত্বে সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত হউক, ইহাই মাতা বীণাপানির নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইতি—

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়,
৯, বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা।
১৩ই চৈত্র, ১৩৩৫।

বিনয়াবনত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

(ছ)

ভারতচন্দ্র

শুধু নহ তুমি ভারত-চন্দ্র, নিখিল-চন্দ্র তুমি,
তোমার কবিত্ব-কনক-কিরণে আলোকিত সব ভূমি।
যেই দিন তুমি ওহে কবিবর ছাড়ি' স্বদেশের মায়া,
ছাড়ি স্নেহময়ী জননী-জনক আর প্রিয়তমা জায়া—
এসে উপজিলে নদীয়ার বুকে, সে অতি শুভক্ষণ,
সাহিত্য-জগতে সে যে খোশ্‌রোজ হিয়া-মন-হরষণ।
হৃদয় তোমার রস-সুন্দর বিধির কৃপায় পাওয়া,
লভি রাজাদর সেবি নদীয়ার সরস সুখদ হাওয়া—
অচিরে তাহাতে উঠিল ফুটিয়া পারিজাত থরে থরে,
চয়নি' সে ফুল সাজাইলে ডালা মনের মতন ক'রে।
মুগ্ধ রাজন পাইয়া সে ভেট, মুগ্ধ সদস্য যত,
বিস্ময়ে সবে স্তব্ধ অবাক্ পাষাণ-প্রতিমা মত।
কতক্ষণ পরে কহিলেন ভূপ,—"অপরূপ—বলিহারি,
কোন্ পুণ্য-ফলে পেলে কবি তুমি মরতে অমিয়া-বারি ?
রসাল মধুর গাথায় তোমার মানসে প্রতিক্ষণে,
কত ভাবে কত বাসনার ঢেউ জেগে উঠে আনমনে !
ক্ষুধা-তৃষা-বোধ হ'য়ে যায় রোধ, ভুলি যে আপন পর,
ধন্য তোমার লেখনী-ধারণ ওহে কবি গুণাকর !!"

শান্তিপুর। মোজাম্মেল হক্

(জ)

ভারতচন্দ্র

তুমি বঙ্গ-কবি কুঞ্জ-রঞ্জন হে।
কত মধুর তোমার গুঞ্জন হে॥

সে-ও-সে বাঙ্গালী হিংসা বিষে দহে
গৃহ-ছিদ্র কথা অরি-পুরে কহে॥

রচিলে মালঞ্চ ফুটাইলে ফুল।
সুষমা সৌরভ ভুবনে অতুল॥
মন্দ মন্দ গন্ধ বহে তব ছন্দে।
শীতল শিশির ঝরে চিরানন্দে॥
শব্দের ঝঙ্কারে মোহে মন মুগ্ধ।
কল্পনা আল্পনা দিতে নহে ক্ষুব্ধ॥
রসের তরঙ্গে মন্দিরা মৃদঙ্গ।
বঙ্গ-কাহিনী হর-মোহিনী রঙ্গ॥
অন্নগত-প্রাণ অন্নের কাঙালী।
অন্নদে বলিয়া ডাকে মা বাঙ্গালী॥
অন্নদা মঙ্গলে বাঙ্গালার গান।
প্রতাপ-আদিত্যে বীরত্ব সম্মান॥
যশোহর সাজে বাজে ভেরী ডঙ্কা।
রণে আগুয়ান প্রাণে নাহি শঙ্কা॥
নাদিল বাঙালী বাধিল লড়াই।
কোমর কষিয়া রুষিয়া চড়াই॥

বঙ্গের বিদুষী বিদ্যালাভ সঙ্গে।
ভাসে বিদ্যাবতী প্রেমের তরঙ্গে॥
আপনি সাজিলে রঙিলা মালিনী।
হীরে ঝলে হীরে সুরস শালিনী॥
বিদ্যারে জিনিতে পেতে বিদ্যাবল।
কবি জানে চাই সিঁধ কাটা কল॥
তব বারমাসে বিকশিত বঙ্গ।
ফুল-লাজে সাজে রজনী উলঙ্গ॥
বঙ্গ-রুচিকর রেঁধেছে ব্যঞ্জন।
গড়েছ গহনা বাঙ্গালী-রঞ্জন॥
বঙ্গের ভারত তুমি বঙ্গ-চন্দ্র।
রঙ্গ-রসে ভরা বাঁশরীর রন্ধ্র॥
বাঙালীর কবি বাঙালীটি খাঁটি।
রায় গুণাকর মাজুগাঁয় বাটী॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু

(ঝ

ভারতচন্দ্র

(অন্নদামঙ্গলের "শিবনামাবলীর" অনুকরণে)

জয় কবীশ ভাস্বর
গুণী অনশ্বর
চিত্রকরেশ্বর
শিল্পীবর।
জয় বিচিত্রছন্দক
বিচিত্রবাদক

সুকীর্ত্তিভালক
গুণাকর ॥

জয় শিবানুবর্ত্তক
কুলীশ-ভাষক
প্রফুল্ল-হাসক
নৃত্যপর।

জয় পীযুষ-ভাষণ
কাঠিন্ত-নাশন
উজ্জ্বল-ভূষণ
শুভঙ্কর ॥

জয় জড়ত্ব-শায়ক
ছন্দ-বিধায়ক
নব্য-নিয়ামক
শক্তিধর।

জয় পিনাকটঙ্কৃত
মৃদঙ্গঝঙ্কৃত
বীণাবিনিন্দিত
কাব্যকর ॥

জয় প্রতিভা-আলয়
দিবাকরোদয়
শশীসুধাময়
দৈন্তহর।

জয় গউড়-গৌরব
অশেষ-সৌরভ,
যুগে যুগে সব
মুগ্ধ কর ॥

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

(ঐ)

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

শ্যামল বঙ্গের চির শোভন ললাটে,
শারদ-চন্দ্রমা তুমি হে অমর কবি!
বিরাট্ রাজত্ব তব কাব্যরাজ-পাটে
কি সৌন্দর্য্যে একাধারে প্রেম-মর্ম্ম-ছবি!
মধুর ললিত গীতি নির্ঝর অতুল!
ঝরে স্নিগ্ধ কবিতার ধারা নিরমল!
ভাবের বিকাশে ফোটে নানা জাতি ফুল,
পিকের ঝঙ্কারে মুগ্ধ সারা ধরাতল!
কি মোহ-মদিরা-মাখা কবিতা তোমার
ত্রিদিব তন্দ্রায় মুদি'—আসে এ নয়ন,
মন্দার-সৌরভ, গীতি, নৃত্য অমরার
ভূতলে সৃজেছে যেন অলকা-ভুবন!
ভারত! ভারত-রত্ন! ভারতী-আদরে!
ধন্য তব কবি-কীর্ত্তি—পুণ্য জন্মান্তরে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসের প্রাতঃকালে কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয়-প্রমুখ প্রায় চব্বিশ জন সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী মহাশয়গণ মাজু গ্রাম হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে প্রায় সাত মাইল দূরে পেঁড়ো গ্রামে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মভূমি দর্শন করিতে গমন করেন। মহাকবি ভারতচন্দ্রের বংশধর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায় প্রভৃতি মহাশয়েরা সমাগত সাহিত্যিকগণের যথাযোগ্য সমাদর করিয়া তাঁহাদিগকে জলযোগে পরিতৃপ্ত করেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের জন্মস্থানে এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন স্মৃতি-স্তম্ভ সংস্থাপিত হয় নাই। আশা করি, অচিরে মহাকবির ভক্তগণ তাঁহার ভিটায় আর কিছু না হউক,

ভারতচন্দ্রের উদ্দেশ্যে মহাকবি মধুসূদনের লিখিত কবিতার নিম্নোদ্ধৃত তিনটি পংক্তি প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া একটি স্তম্ভগাত্রে সংযুক্ত করিয়া স্থানটির শোভা বর্দ্ধন করিবেন।

"হে ভারত !
তব বংশ-যশ-ঝাঁপি—অন্নদা-মঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে" ॥

(ট)

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র।

কতদিন পরে জেগেছে আবার
মায়ের পূজার নূতন গান,
জুটেছে ভক্ত লইয়া অর্ঘ্য
যে যা'র হিয়ার শ্রেষ্ঠদান।
জীর্ণ আমারো কুটীর দুয়ারে
আহ্বান লিপি এসেছে আজ,
দূর হ'তে তাই এসেছি ছুটিয়া
ভুলিয়া সকল দৈন্য লাজ।
মিলন তীর্থ নহে শুধু ইহা
মধুময় শুধু প্রীতির ফুলে,
ভারতের এ যে মহান তীর্থ
কাণা দামোদর তটিনী কূলে।
শ্রেষ্ঠ পূজার কত ইতিহাস
সুপ্ত ইহারি বুকের তলে,
পুণ্য স্মৃতির তর্পণ আজি
করিতে যে চাই নয়ন জলে।

কণ্ঠে আমার নাহি কোন সুর
　　গাহিব কবির কীর্ত্তি গাথা,
শুধু বার বার উদ্দেশ্যে তাঁর
　　সম্ভ্রমে আজি নোয়াই মাথা।
*　　*　　*　　*
দু'শ বছরের আগেকার কথা—
　　এরি পাশে ওই পল্লী বুকে,
রাজা নরেন্দ্র বক্ষ আলোকি
　　লভিলে জন্ম কত না সুখে।
স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি সে দিন
　　রাজার পুত্র ভিখারী হবে,
সরল চিত্ত জয় করি শেষে
　　অতুল কীর্ত্তি রাখিবে ভবে।
শৈশব হ'তে গৃহহীন তুমি
　　আসিলে পলায়ে মাতুল বুকে,
সংস্কৃতের কঠিন বিদ্যা
　　করিলে শিক্ষা কত না সুখে।
কত আশা করি সংসার বুকে
　　নূতন রাজ্য গড়িবে বলি,
সারদার চারু পল্লী রাণীরে
　　চির সাথী করি লইলে চলি।
ভায়ের বুকেতে কই স্নেহ সুধা
　　পেলে না একটু করুণা ধারা,
অকূলে আবার ভাসালে তরণী
　　লক্ষ্য তবুও হওনি হারা।
মুন্সী ভবনে পারসী পড়িয়া
　　লুকায়ে গাঁথিয়া কবিতা মালা,
পরায়ে ভারতী কণ্ঠে, জুড়াতে
　　তৃষিত বুকের সকল জ্বালা।

কতদিন তব জোটেনি খাদ্য
কাতর করিতে পারে নি তবু
দগ্ধ উদর পুরায়েছ হেসে
দগ্ধ বেগুণে অন্নে কভু।
সত্যনারায়ণ দেখালেন তোমা
সত্যের পথ জীবন রণে,
আদেশ আসিল জয় গাঁথা তার
শুনাতে হইবে ভক্ত জনে।
একদিন তুমি রচিলে মধুর
পুণ্য সত্য-পীরের গান,
শুনিয়া ধন্য করিল সকলে
জুড়াল তাপিত ব্যথিত প্রাণ।
বিজয়ী যুবক ঘরে ফিরে পুন
বন্দিলে পিতা জননী ভায়ে,
বর্দ্ধমানেতে সেবক হইয়া
রহিলে তাঁদের স্নেহের ছায়ে
আবার ভায়েরা দিল না রাজার
নিয়মিত রূপে প্রাপ্য কর.
খাস করি নিল ইজারার ভূমি
রুখিয়া দাঁড়ালে না কবি ডর।
চক্রীজনের মন্ত্রণা ফলে
বরণ করিলে অন্ধ কারা,
ক্ষুদ্র প্রহরী করুণার বলে
তথা হ'তে শেষ পাইলে ছাড়া।
বিষের জ্বালায় বিবাগী হইয়া
ব্রহ্মের পদে লইলে ঠাঁই,
জগন্নাথের চরণে লুটিয়া
প্রসাদ ভিক্ষা করিলে তাই।

শঙ্কর মঠে ভাগবত পড়ি
বৈষ্ণব গীতি অমিয় পানে,
গৈরিক বাসে আবরি অঙ্গ
রহিলে সবারে প্রণয় দানে।
জাগিল নয়নে বৃন্দাবনের
গোপীনাথজীর মাধুরী ছবি,
চলিলে অমনি, নেহারি সে রূপ
মুগ্ধ হইলে প্রেমিক কবি।
পাছু হ'তে তবু টানিতে ছাড়ে না
প্রিয়জন যারা রয়েছে পড়ে,
শালীপতি তব স্নেহের নিগড়ে
বাঁধি লয়ে গেল আপন ঘরে।
মিলা'ল আনিয়া চির বিরহিণী
প্রাণপ্রিয়া সাথে যুগের পর,
শপথ করিলে অর্থ না হ'লে
ফিরিবে না আর আপন ঘর।
বাহির হইলে আবার কুটীল
বন্ধুর এই সরণি বেয়ে,
পালধি তিলক ইন্দ্র নারাণ
করুণা ধারায় দিলেন ছেয়ে।
তাঁহারি বরেতে পাইলে কৃষ্ণ
কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া পতি,
লভিলে বিত্ত স্নেহ ছায়া তাঁর
অগতির তব হইল গতি।
শান্ত প্রাণেতে জাগিল আবার
ভুলে যাওয়া কত রাগিণী সুর,
সন্ধ্যা সকালে শুনায়ে রাজারে
করিলে তাঁহার শ্রান্তি দূর।

গুণের আকরে চিনিলেন রাজা
"গুণাকর" পদ দিলেন বর,
পিপাসা তাঁহার বাড়িল নিত্য
শুনিতে তোমার মধুর স্বর।
প্রতিভা তোমার স্নেহের নিষেকে
বিকশি উঠিল সুরভি ফুলে,
অতুল অর্ঘ্য সাজালে হর্ষে
"অন্নদা" চারু বরণ মূলে।
অন্নদা পূত মঙ্গল গান
নবীন ছন্দে গাহিলে মরি
প্রাসাদ হইতে দীনের কুটীরে
আজিও সে গান রয়েছে ভরি।
মূর্চ্ছনা তারি ধ্বনিয়া উঠিছে
কুলুতানে ঐ নদীর বুকে,
কালের বক্ষ ভেদিয়া উঠিবে
চিরদিন বুঝি এমনি সুখে।
লালসার নব লীলায়িত রূপ
টলাতে পারেনি চিত্ত ধীর,
বারবনিতার কৌশল জাল
ছিন্ন করেছ নিমেষে বীর।
দেখায়েছ তবু জগৎ জনারে
অফুরান তব রসের ধারা,
নির্ঝর সম নিত্য ছন্দে
ঝরিছে ভেদিয়া পাষাণ কারা।
সুন্দর রূপে বিদ্যার যত
সকল বিদ্যা করিয়া হারা,
রচিলে বিদ্যা-সুন্দর কথা
অমর কাব্য রসের ধারা।

যক্ষের মত বিরহী বক্ষ
এতদিনে বুঝি উঠিল কাঁদি,
মনে হ'ল বুঝি কার তরে এই
নবীন ছন্দে কবিতা বাঁধি।
কহিলে রাজারে ভিক্ষা দেহ গো
এইবার কিছু বাস্তু ভূমি,
ঘরনীরে মোর আনিব ঘরেতে
কবিতা উঠিবে চরণ চুমি।
মূলাজোড়ে আসি রচিলে কুটীর
পড়িল লক্ষ্মী-চরণ ছায়া,
রসমঞ্জরী—মুঞ্জরী উঠি
লভিল মোহন নবীন কায়া।
পুণ্য সলিলা ভাগিরথী তোমা
দিল সুশীতল আশীষ ধার,
ক্ষত বুক তব শান্তি প্রলেপ
লভিল কুঞ্জে পল্লী মা'র।
গঙ্গার বরে আসিল জনক
চরণে তাঁহার পাইলে ঠাঁই,
তারি কোলে তিনি পড়িলেন ঢলে
যার বাড়া আর স্বর্গ নাই।
ভেবেছিলে বুঝি মায়ের কীর্ত্তি
চণ্ডী নাটকে রাখিবে ধরি,
শ্রান্ত বুঝিয়া জননী তোমারে
তারি আগে বুঝি লইল হরি।
সন্ধ্যার ছায়া ঘনাবার আগে
সহসা খেলার হইল শেষ,
ফিরিয়া আসিবে বলে যে আজিও
পথ পানে চেয়ে রয়েছে দেশ।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

(৮)

অভিনন্দিত করি জয় হে ভাষা-তীর্থ-যাত্রী !
চরণ-ধ্বনিতে জাগিল পল্লী শ্যামল শস্য-দাত্রী !—
আমরা প্রসাদ প্রার্থী... !
তোমরা বাজালে বিজয় শঙ্খ
বিজয়ী পথ বাহি !
আমরা দানিব অর্ঘ্য শুধু
তোমাদের জয় গাহি'—
তোমরা পূজারী শব্দশিল্পী
ভাষা মায়ের দ্বারে
নৈবেদ্য ছন্দ গীত-গন্ধ
আনিলে ভারে ভারে ;
আমরা যোগাব সমিধ্ খুঁজি তোমরা অগ্নিহোত্রী !
আমরা প্রসাদ-প্রার্থী... !
শ্মশানে গড়িলে কনক-সৌধ
সার্থক বাণী-পুত্র।
উঠিল মৃত—সঞ্জীবিত—
মিলন-যজ্ঞ-সূত্র—
বাঁধিলে হৃদয়ে হৃদয়-জয়ী
পতিতে তুলিলে বুকে ;
আঁধার হইতে খুঁজিয়ে ধরিলে
অরুণের অভিমুখে ;
আলোক পরশ দিকে দিকে ছুটে ধন্য পল্লী-ধাত্রী।
আমরা প্রসাদ-প্রার্থী... !

শ্রীব্রজমোহন দাশ।

(ড)

সঙ্গীত

(আজি)—জয় তব জয়, এ ভুবনময় দীন দুখীদের, জননী,
যুগে যুগে যুগে, তব পদ যুগে, প্রণত নিখিল অবনী।
অনশনে ম্লান তোমার আনন, জীর্ণ তোমার ভূষণ ভবন
তবু শতমণি মুকুটে শোভন তব ধুলিমাখা চরণই॥

(চারি)—বেদ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র, আপন অঙ্কে বহিয়া
পিয়ায়েছে, ওমা সোমরস তোমা জ্ঞানত্রিদিবে অমিয়া
মহাভারতের বারিধি অতল চিন্তামণিতে ভরেছে আঁচল
ঋদ্ধ করেছে রামায়ণী ধারা পতিত পাতকি-পাবনী॥

(শিরে)—করিছে আশীষ, তোমায় গিরীশ, চির বরাভয় প্রদানে,
তুমি মা মেধ্যা মেনকা রাণীর অশ্রু সলিল সিনানে।
দ্বৈত কাম্য দণ্ডক বন রচেছে তোমার দর্ভ আসন,
বৃন্দাবনের সুরভিরা তব যোগায় ভোগের নবনী॥

(তব)—বিজয় তূর্য্য বাজে যুরূপার চূড়া গম্বুজ মিনারে,
নিশীথ সূর্য্য রমার শ্রীকরে প্রেরিল অর্ঘ্য তোমারে।
দূর কানাডায় জাগে বিস্ময় মরুতে মেরুতে জয় জয় জয়,
ইরান তুরান বসরাই গুলে সাজায়ে তোমার তরণী।

(কল)—কণ্ঠে তোমার অভয় মন্ত্র,—দৃষ্টিতে তোমার অমৃত,
পরশে তোমার, লভে অপসার, পাপ তাপ শাপ অনৃত।
চিত্তে মা তব অমেয় ভক্তি সঙ্গীতে তব অজেয় শক্তি
তব পদ সেবা অপবর্গদা—স্বর্গের অধিরোহণী॥

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর।

(ঢ)

সঙ্গীত

নূতন তোমায় নেব'
আমি বরণ ক'রে
আমার আঁধার ঘরে
ঘিয়ের প্রদীপ ধ'রে !
নূতন তোমার আগমনে
বেজেছে শাঁক গহন বনে
আরতির আঘ্রাণে
চিত্ত আমার নি'ল হ'রে !
নূতন তোমায় চিনেছে গো
কোথায় যেন দেখেছি গো
চির দিনই চেয়েছি গো—
তুমি কেবল গেছ' স'রে !—
[আমার বাহুর
বাঁধন ছিন্ন ক'রে !]
আজ এলে যে রাজার বেশে
ভিখারীর এই শ্রীহীন দেশে
নূতন তুমি ধর হেসে
যা প'ড়েছে আপনি ঝ'রে !—
[মানের মালা
মাথার প'রে !]

শ্রীব্রজমোহন দাস

(ণ)

বিদায় সঙ্গীত

বিদায় দানিতে কণ্ঠ যে রোধে, বন্ধু, ঘনায়ে সন্ধ্যা আসে।
বাণী-পদমূলে মিলন কমল মুদে আসে ঐ দীর্ঘ শ্বাসে।

প্রেমানন্দের আদানে প্রদানে যে মাধুরী আজি লভিলাম প্রাণে
গুঞ্জনে যেন বিলাই সবারে তদ্গত রই রস বিলাসে ॥
রক্তের টান, প্রণয়ের টান, স্বার্থের টান মিষ্ট জানি,
জননীর ডাকে ভায়ের মিলন আজিকে সবার শ্রেষ্ঠ মানি।
কত জনমের সঙ্গতি-স্মৃতি জেগে উঠে কত প্রাক্তনী প্রীতি,
যুগে যুগে যেন বাণীর চরণে এমনি মিলেছি মৈত্রী-পাশে ॥
কত কাল পরে চিত্তের ক্ষুধা তিরপিত দুই দিনের তরে,
পিছু পানে চায় আজি হৃদি হায় পুন ফিরে যেতে আঁধার ঘরে।
বিদায়ের ক্ষণে বুকে এস ভাই বাষ্পের ভারে বাক্য হারাই,
সুখের স্বপন টুটায়ে যে অই বিরহ রজনী অট্ট-হাসে ॥

শ্রীকালীদাস রায়, কবিশেখর।

(ত)

বিদায় সঙ্গীত

কি পেলে আজ ব'লে যেয়ো
যাবার আগে—
ধুয়েছি চরণ তোমার
অন্তরের অনুরাগে!
বরণ-মালা ফেলে দিয়ো,
ভুলে যেয়ো যেয়ো প্রিয়ো—
পাঁকের তিলক মুছে ফেলো
যদি তোমার বুকে লাগে!
আপন হাতে তোমার রেখা,
পরাজয়ে জয়লেখা—
ক্ষণিকেরে ব'য়ে যাবো
জীবনভ'রের পুরোভাগে!

আমার পূজার নিবেদনে
চেয়ে দেখো আন-মনে—
মুখের কথা ব'লে যেয়ো
'ভালো লাগে' 'ভালো লাগে'
হে অতিথি! সবার শেষে
বিদায় নিয়ো হেসে হেসে ;—
দূর অদূরের পথিক আমার—
কেন আবার আশা জাগে।

শ্রীব্রজমোহন দাশ